বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৪, শকাব্দ। বৈশাখ, ১৮৭৯ শকাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ—কার্ত্তিক, ১৩৬৪
তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬ চালতাবাগান লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—দীননাথ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম অধ্যায়

এক

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিলেন দুর্গাশঙ্কর। গান্ধার-রীতিতে আঁকা সরস্বতীর মূর্তি। বাক্শ্রী ইরা বসে আছেন সন্ন্যাসিনীর পদ্মাসনে—এক হাতে উদ্যত বরাভয়। ঘরের হালকা নীলিম আলোতে দুটি আয়ত চোখ প্রসন্ন করুণায় টলমল করছে।

সামনে ফরাসে বসে একটি মেয়ে মুদিত চোখে বেহাগের বিস্তার করে চলেছিল। অস্পষ্ট নীলচে আলোয়, চন্দনধূপের মৃদু কুয়াশায়, তানপুরার উপরে রাখা আঙুলের শিথিল সঞ্চালনে আর পরনের ফিকে গোলাপী শাড়িতে তাকেও ওই সরস্বতীর মূর্তির মতোই মনে হচ্ছিল। দুর্গাশঙ্কর তার দিকে একবার তাকালেন, পরক্ষণেই চোখ আবার ছবিটির উপরে গিয়ে পড়ল।

"শ্যাম-অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা—
সুনীল বসনে তনু ঢাকিয়াছে আধা—"

বেহাগের সুরবিকীর্ণ এক স্বপ্নের পথ বেয়ে শ্রীমতী চলেছেন অভিসারে। রাত্রির কালিন্দী নিকষ কালো, তমালবন তিমিরস্তব্ধ। কষ্টিপাথরে সোনার রেখার মতো পায়ের নূপুরের দীপ্তি। কঙ্কণের ভীরু গুঞ্জন। মহাজন-পদাবলীর তালে তালে রাধার বুকের স্পন্দন।

এই ঘর এখন দূরের বৃন্দাবন। কান পেতে থাকলে শোনা যায় যমুনার কলধ্বনি, তমাল-বীথির নিশীথ-মর্মর। সব কিছু এখন স্বপ্নবিলীন। কিন্তু কতক্ষণ? সুর থেমে যাবে, গান থেমে যাবে। তারপর জীবন।

সেই জীবন মনে পড়িয়ে দেবে, কত সহজে সুর কেটে যায়। যখন কাটে, আর জোড়া লাগে না।

"শ্যাম-অভিসারে চলে বিনোদিনী রাধা—"

চন্দন-ধূপের গন্ধ মিলিয়ে যাবে, ওই নীল আলোটাও এক সময়ে একটা ফুলের মতো ভেসে চলে যাবে অন্ধকারের স্রোত বেয়ে। তানপুরাটা পড়ে থাকবে ফরাশের এক কোনায়। যে মেয়েটি গান গেয়ে চলেছে, সে উঠে যাবে অনেকক্ষণ আগেই। তখন মনে পড়বে। মনে পড়বে তাকেই—গান্ধার আর্টে সরস্বতীর মূর্তিখানা এঁকে যে তাঁকে উপহার দিয়েছিল।

দুর্গাশঙ্কর নড়ে-চড়ে বসলেন। আজ, চল্লিশ বছর পরে সব কেমন এলোমেলো লাগে। ছেলেবেলার একটা দিন—সোনালী রোদ-ঝলকানো একটি দুপুর। বয়েস তখন বার থেকে তের। যখন ওই রোদ এসে রক্তে মিশে যায়, যখন বুকের ভিতর শিরীষের পাতা কাঁপে, যখন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় একটু দূরে আতা গাছে চুপ করে বসে থাকা পাখিটার গলার রঙ। সেই বয়েসে, সেই দুপুরে, সেই রোদ আর ছায়া-কাঁপা মন নিয়ে, সেই পাখির রঙ-দেখা চোখ নিয়ে একটা সবুজ পাতার উপরে খানিকটা দুধবরন ভেরেণ্ডার আঠা কুড়িয়ে নেওয়া; তারপর চোর-কাঁটার একটা ডাঁটা, আর তারও পরে কয়েকটা ছোট বুদ্বুদ। তাতে নিজের মুখের ছায়া, সূর্যের সাতটা রঙ, ভবিষ্যৎ!

রঙিন বুদ্বুদ। সূর্যের সাতটা রঙ, নিজের মুখের একটুখানি ছায়া। হাওয়ায় উড়তে উড়তে কোথায় মিলিয়ে যায়। চল্লিশ বছর তো পার হয়ে গেল সেই দিনগুলোর পরে। এখনও খুঁজছেন দুর্গাশঙ্কর। কোথায় মিলিয়ে যায় তারা? একটিকেও তো আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না। ওই গান্ধার-রীতিতে ছবিটি যে এঁকেছিল, তাকেও না।

"ওস্তাদজী!"

চোখদুটো বুজে এসেছিল—ঘুমিয়ে পড়ছিলেন নাকি? দুর্গাশঙ্কর তাকালেন।

"আমি উঠি আজ।"

সেই মেয়েটি। সুপ্রিয়া। বেহাগের সুর থেমে গেছে। তানপুরা নামিয়ে রেখেছে পাশে। বৃন্দাবন, শাল-তমাল, কালিন্দী, শ্রীমতীর অভিসার। আর একটা বুদ্বুদ মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়।

"এসো।"

একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, "আজ থাকো তুমি এখানে। সারা রাত গান শোনাও আমাকে।" কিন্তু কিছুতেই সে-কথা বলা চলে না। মেয়েটির দু চোখে আশ্চর্য সরলতা, গভীর বিশ্বাসের শ্যামল ছায়া। যেখানে বিশ্বাস বেশি, সেখানে অবিশ্বাস আসে আরো সহজে। শ্রদ্ধাটা রঙিন কাঁচের পুতুল, চকমক ঝকঝক করে, যখন ভাঙে তখন একেবারেই ভাঙে শুধু কতগুলো ধারালো খণ্ডাংশ ছড়িয়ে থাকে রক্তাক্ত করবার জন্যে।

দুর্গাশঙ্কর আবার বললেন, "এসো।"

পাশ থেকে শ্রীনিকেতনের কাজ করা ব্যাগটা কুড়িয়ে নিলে সুপ্রিয়া। কোথায় যেন একটা অর্থহীন খোঁচা লাগল দুর্গাশঙ্করের। ব্যাগটার ভিতরে হয়তো কিছু পয়সা, এক টুকরো ছোট রুমাল, একটা চাবির রিং, হয়তো দু-একটা চিঠিপত্র। জীবন। ট্রামগাড়ি। কলকাতা। কোথাও একটা লীলাকমল ছিল কোনোদিন। এখনই তার ছেঁড়া পাপড়িগুলো হাওয়ায় উড়ে গেল—উড়ে গেল বেহাগের শেষ মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর সিঁড়িতে। সিঁড়ির কার্পেটে ওর চটির শব্দ শোনা গেল না। শুধু শাড়ির একটু খসখস আর কয়েকটা চুড়ির গুঞ্জন। তারও পরে কাঁকরের উপর কয়েকটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ—গেট খোলবার একটা আর্তনাদ—

আর শুনতে পেল না দুর্গাশঙ্কর। মাথার উপর দিয়ে একখানা এরোপ্লেন গেল।

পথে পা দিয়ে একবার থেমে দাঁড়াল সুপ্রিয়া। মাথার উপর দিয়ে

একখানা এরোপ্লেন যাচ্ছে। কয়েকটা লাল-নীল আলো। জোনাকির মতো জ্বলছে নিভছে।

সুপ্রিয়া কখনো প্লেনে চাপেনি। ভারী কৌতূহল হয় মধ্যে মধ্যে। শুধু ভয় হয় ক্র্যাশকে। তা-ও কোনো রোম্যান্টিক ঘুমন্ত মৃতদেহ নয়। আগুনে পোড়া কদাকার পিণ্ড একটা। উঃ—ভাবাই যায় না!

উত্তর-পূবের আকাশ বেয়ে মিলিয়ে গেল প্লেনটা। দমদম এয়ারপোর্ট বোধ হয় ওদিকেই। সুপ্রিয়া চোখ নামিয়ে সামনের দিকে তাকাল। শাদা শার্টের কলার তুলে দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে রাস্তা পেরিয়ে।

আর কে? নিঃসন্দেহে অতীশ।

মনের খুশিটাকে একটুখানি ভ্রুকুটিতে বদলে নিলে সুপ্রিয়া। একটা মোটর এসে পড়লে রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গেল অতীশ, তারপর গাড়িটা বেরিয়ে যেতে ছুঁড়ে দিলে হাতের সিগারেটটা। গাড়ির হাওয়ায় ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে সিগারেটটা এগিয়ে গেল অনেকখানি।

অতীশ সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তার আলোটা ঝিকমিক করতে লাগল চশমার রোল্‌ড গোল্‌ডের ফ্রেমের উপর। বিনা ভূমিকাতেই অতীশ বললে, "চলো—এগিয়ে দিই।"

"এই জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলে?" ভ্রূতে শাসনের রেখা ফুটল সুপ্রিয়ার।

"কখনো না।"

"নিশ্চয়। আমার জন্যে আধ ঘণ্টা ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। এই বকুল-গাছটার তলাতে।"

দুজনে চলতে শুরু করেছে ট্রাম-লাইনের দিকে। হাওয়ায় হেমন্তের শিশিরের গন্ধ। কোথা থেকে নব-জাতকের কান্না। রাত এখন নটার কাছাকাছি।

অতীশ বললে, "আমি কারো জন্যে বকুল-গাছতলায় দাঁড়াইনি। টিউশন সেরে ফিরছিলাম। দেখা হওয়াটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট।"

"আশ্চর্য অ্যাক্‌সিডেণ্ট বাস্তবিক।" সুপ্রিয়া হেসে উঠল, "সপ্তাহে তিনদিন।"

"তিনদিনই টিউশন থাকতে পারে।"

"আমি কোনোদিন আটটায় বেরুই, কখনো সাড়ে আটটায়, কখনো নটায়। তোমার পড়ানোরও কি কোনো নিয়ম নেই ?"

"অনিয়ম জিনিসটা তোমারই একচেটে নয় সুপ্রিয়া।"

চলতে চলতে সুপ্রিয়া একবার তাকিয়ে দেখল অতীশের দিকে। চশমার ফ্রেম, কাচ আর পথের আলো অপরূপ জ্যোতির্ময় করে তুলেছে অতীশের চোখ।

"বরাবর শুনে আসছি অতীশ আমাদের মুখচোরা ভালো ছেলে—পড়ার বই ছাড়া আর কিছুই জানে না। এখন দেখছি তারও মুখে কথা ফুটেছে।"

"কৃতিত্বটা আমার নয়—" সেই জ্যোতির্ময় চোখ মেলে অতীশ বললে, "কথা যে ফুটিয়েছে, তারই।"

"কে সে ?"

"সামনে বলব না। অহঙ্কার হবে।"

"খুব হয়েছে। সায়েন্স কলেজে এই ধরনের রিসার্চই বুঝি চলছে আজকাল ?"

"সাবধান—ওটা আচার্য রায়ের কলেজ।" অতীশ হেসে উঠল, "ওখানে এসব চাপল্য মুখে আনতে নেই—মনেও না। আর এটুকু ট্রেনিঙের জন্যে হরিশ মুখুজ্যে রোডই যথেষ্ট। কষ্ট করে অত দূরে যাবার দরকার হয় না।"

পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা ডবল-ডেকার মোড় ঘুরল। দৈত্যের মতো অদ্ভুত কালো গাড়িটা, জানলার কাচগুলো কেমন হিংস্রতায় ঝকঝক করছে। খানিকটা তপ্ত গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারদিকে। আলোচনার খেই হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

সামনে ঘাসের কালো মখমলের ভিতর দিয়ে রূপোলী ট্রাম-লাইন। জমাট হয়ে থাকা গাছের সারি। তীব্র নীল আলোর ঝলক ছড়িয়ে টালিগঞ্জের ট্রাম চলে গেল। মোড় ঘুরল আর-একটা ডবল-ডেকার। উলটো দিকে।

ট্রাম-স্টপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রিয়া।

"এখান থেকেই উঠবে?" ক্ষুণ্ন হয়ে অতীশ জানতে চাইল।

"এইখানেই গাড়ি থামে।" ঠোঁট টিপে সুপ্রিয়া হাসল, "ট্রাম কোম্পানির তাই নিয়ম। মাথার উপর তাকালেই দেখতে পাবে। লেখা আছে: এখানে সকল ডাউন গাড়ি—"

"ধন্যবাদ—উপকৃত হলাম।" অতীশ আর-একটা সিগারেট ধরাল, "কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল, আর-একটু হেঁটে গেলে হয় না?"

"সেই হরিশ মুখার্জি পর্যন্ত?"

"না—না, তা কেন? এই আর একটুখানি—মানে সামনের রাসবিহারীর মোড়—"

"সেখান থেকে আর-একটু গেলে কালীঘাট ডিপো, আরো দু পা এগোলে হাজরার মোড়—"

"সত্যি বলছি। আজ আর সে-সব করব না। চল—আর-একটু হাঁটি।"

সুপ্রিয়া হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল, "কিন্তু বাড়িতে আমাকে যে কৈফিয়ত দিতে হয়—তা জানো?"

"আমি সঙ্গে থাকলে দিতে হবে না। ভালো ছেলে হিসেবে আমার খ্যাতি আছে।"

"এ-ভাবে বকুলতলায় দাঁড়াতে থাকলে সে খ্যাতি বেশিদিন টিঁকবে না।" সুপ্রিয়া হাঁটতে আরম্ভ করল, "পাড়ার ছেলেদেরও চোখ আছে। তারা সায়েন্স কলেজের রিসার্চ স্কলারকে খাতির করবে না।"

"বকুলতলা কর্পোরেশনের সম্পত্তি। যে-কেউ দাঁড়াতে পারে।"

সুপ্রিয়া হাসতে চেষ্টা করল, পারল না। একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল বুকের ভিতরে।

"তোমাকে নিয়ে আমি কী করব বলো তো অতীশ? আমার কী কাজে তুমি লাগবে?"

"রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জবাব দিতে পারি। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।"

"ঠাট্টা নয়।" সুপ্রিয়ার বুকের ভিতর ব্যথার রেশটা টনটন করে বাজতে লাগল, "তবলা ধরতে জানো না যে আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে। গান জানো না যে তোমার কাছ থেকে কিছু শিখে নেব। কবিতা লিখতে পারো না যে তোমার গানে আমি সুর দেব। সত্যি, তোমাকে নিয়ে আমি কী করব অতীশ?"

অতীশ যেন এতক্ষণ পরে হোঁচট খেল একটা। দু বছর ধরে এই একটা কথাই অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে সুপ্রিয়া। কী কাজে লাগবে অতীশ? সুপ্রিয়ার জীবনে তার ভূমিকা কতটুকু?

অথচ আশ্চর্য, এক সুপ্রিয়া ছাড়া আর কোনো মেয়েই কি এমন একটা প্রশ্ন তুলতে পারত? কী কাজে লাগবে অতীশ? এম-এস্‌সির নামজাদা ছাত্র, দুদিন পরে ডি-এস্‌সি, হয়তো একটা ফরেন স্কলারশিপ, তারপরে বড চাকরি। এর পরে আর কী চাই? এর বেশী কোন মেয়ে আর কামনা করতে পারে?

কিন্তু সুপ্রিয়া পারে। গানের চাইতে বড তার সামনে আর কিছু নেই। কেউ নেই সেখানে। তার গানের জগতে ডি-এস্‌সি'র ডিগ্রির জায়গা বাজে কাগজের ঝুড়িতে। কনভোকেশনের মধ্যমণি সেখানে কেউ নয়। বিরাট গানের জলসায় হয়তো একেবারে পিছনের সারির টিকিট কিনবে অতীশ, স্টেজের উপর বসে-থাকা সুপ্রিয়াকে সেখান থেকে ভালো করে দেখতেও পাওয়া যায় না। সেখানে সুপ্রিয়ার পাশে বসে যে সঙ্গত করবে সে হয়তো নিজের নামটা কোনোমতে সই করতে পারে, যে সারেঙ্গি বাজিয়ে চলবে তাকে হয়তো এখনো টিপসই করতে হয়। কিন্তু তাদের কপালে গুণীর জয়তিলক জলজল করছে—তার কাছে ইউনিভার্সিটির সোনার মেডেল কানাকড়ির বেশি নয়।

পায়ের তলায় ঘাসের কালো মখমল শিশিরে ভিজে উঠছে। অতীশ সিগারেটটা ফেলে দিলে। সম্পূর্ণ খেতে পারল না।

সুপ্রিয়া জোর করে হাসতে চেষ্টা করল : "অমনি গম্ভীর হয়ে গেলে ?"

"গম্ভীর কেন ?" আরো জোর করে হাসতে চেষ্টা করল অতীশ, "আমি হাল ছাড়ব না। কালকেই নাড়া বাঁধব কোনো বড় ওস্তাদের কাছে।"

কথাটার জের টানা চলত, আরো খানিকটা হালকা কৌতুকের জলতরঙ্গ বাজানো যেত। কিন্তু বাজল না। হাওয়াটা থমথম করতে লাগল। দুজনের ভিতর দিয়ে একটা নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলল ট্রাম-বাস-মোটর আর মানুষের শব্দ। বয়ে চলল সেই পরিচিত ব্যবধানের প্রবাহ।

"তোমার গুরুদেব কী বলেন তোমার সম্পর্কে ? দুর্গাশঙ্করবাবু ?"

"কী আর বলবেন ?"

"তোমার গান শেখা শেষ হতে আর কত দেরি ?"

"গুরুদেব নিজেই বলেন, তাঁরও এখনো পর্যন্ত কিছুই শেখা হয়নি।"

"উঃ—কী বিদ্যাই বেছে নিযেছ। সারাজীবন ক্রমাগত হাহাকার করতে হবে।"

আর একটা পুরোনো পরিচিত ঠাট্টা। হাহাকার। গলাসাধার নামান্তর।

কিন্তু কোনো ঠাট্টাই জমল না। পায়ের নীচে হেমন্তের ভিজে ঘাস। সুপ্রিয়ার চটিটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে।

রাসবিহারীর মোড়টাকে কে যেন দয়া করে সামনে এগিয়ে দিলে খানিকটা। নইলে এর পরে হয়তো কথা বলাই শক্ত হয়ে উঠত। একটা অনুতাপের লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সুপ্রিয়া। অতীশকে সে আঘাত দিতে চায় না ; আর চায় না বলেই তীক্ষ্ণধার সত্যটা থেকে-থেকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বেরিয়ে আসে।

সুপ্রিয়া বললে, "ট্রাম আসছে।"

ট্রাম এল। অনেক দূরের স্টেজের মতো অনেকগুলো আলো তুলে নিলে সুপ্রিয়াকে। তারপর অতীশকে ছাড়িয়ে—রাসবিহারীর মোড়কে ছাড়িয়ে অনেকখানি সামনে এগিয়ে চলে গেল ভবিষ্যৎ।

অতীশ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সামনে গোটা কয়েক সিনেমার পোস্টার। কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া রঙ।

ট্রামের জানলা দিয়ে একবার গলা বাড়িয়ে দেখল সুপ্রিয়া। অতীশকে দেখতে পেল না। একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, কালকেও অতীশ আসবে, ঠিক অমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে বকুল-গাছটার তলায়। সুপ্রিয়ার খারাপ লাগবে। কিন্তু অতীশ না এলে আরো খারাপ লাগবে।

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চমকে উঠল অতীশ। তার সামনে নিঃশব্দে কে যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পকেট থেকে পয়সা বের করতে গিয়েও অতীশ চমকে তিন পা সরে গেল। হাতটা কুষ্ঠরোগীর—খানিক বীভৎস বিকৃত ঘা দগদগ করছে সেখানে।

দুই

"নিরাপদদীর্ঘজীবেষু,

বাবা হরিপদ, আমার আশীর্বাদ জানিবে। বিশেষ সমাচার এই যে, আগামী ১২ই আষাঢ় সোমবার আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দুমতীর সহিত—"

চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতে চাইল কান্তি, পারল না। ছাব্বিশ বছরের পুরোনো পঞ্জিকার মধ্যে দাদুর এই চিঠিখানা আজও বেঁচে আছে। কাগজটা হলদে হয়ে গেছে, জোলো হয়ে গেছে কষ-কালির রঙ, তবু শেষ পর্যন্ত পড়া যায়, প্রত্যেকটা অক্ষর পড়তে পারা যায় নির্ভুলভাবে। মুক্তোর মতো হাতের লেখা ছিল দাদুর।

হরিপদ কে, কান্তি জানে না। কেন এই চিঠিটা তাকে পাঠানো হয়নি, তা-ও জানে না কান্তি। কিন্তু ১২ই আষাঢ় ইন্দুমতীর বিয়েটায় কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। ইন্দুমতী তার মা।

কান্তি দাঁত দিয়ে একবার নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরল। পুরোনো হলদে কাগজ, কষ-কালির লেখাটা ফিকে হয়ে গেছে। তবু আনন্দে আর আশ্বাসে দাদুর সইটা যেন এখনো জলজ্বল করছে: "শ্রীতারাকুমার দেবশর্মণঃ—"

দাদুর হাত-বাক্সে প্রসাদী-পদাবলীর একখানা পুরোনো বই খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেছে এই পঞ্জিকা, তার মধ্যে এই চিঠিখানা। একটা মড়ার হাড় যেন উঠে এসেছে হাতে। কিন্তু এই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেই কি সব মুছে যাবে? মুছে যাবে ছাব্বিশ বছর আগেকার সেই ১২ই আষাঢ়, সেই বিয়েটা, আর কান্তির নিজের অস্তিত্ব?

আঠারো বছর বয়েসে একবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিল কান্তি। এই বয়সে আত্মহত্যা করবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, আর থাকে আশ্চর্য তীক্ষ্ণ অসংযত আবেগ। কান্তি সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত চুপ করে বসে ছিল গঙ্গাযাত্রীদের কেউটের ফোকরভরা ভাঙা কুঠরিটার পাশে, পুরোনো ঝাঁকড়া

বটগাছটার কালিগোলা ছায়ার তলায়। কালপুরুষের খড়্গ কাঁপছিল গঙ্গার কালীদহ জলে, ওপারের একটা জলন্ত চিতা থেকে এপারেও মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল মড়াপোড়ার গন্ধ, পায়ের কাছে হাওয়ায় দুলছিল ছেঁড়া সিল্কের টুকরোর মতো একটা সাপের খোলস, আর কান্তি ভেবেছিল আত্মহত্যার কথা।

ফিরে এসেছিল অনেক রাতে, একটু দূরেই বিশ্রী গলায় একটা কুকুর কেঁদে ওঠবার পরে। সহজেই সেদিন মরে যেতে পারত কান্তি। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে। হয়তো ওই সাপের ফোকরগুলোতে আঙুল গলিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু কুকুরটার কান্না শুনে কেন যেন মনে হয়েছিল, আজ থাক। আর একদিন হবে।

আরো সাত বছর কেটেছে তার পরে। গানের সুরে ডুব দিয়েছে কান্তি—গঙ্গার জলে আর ডোবা হল না। কিন্তু সত্যিই সাপের বিষ আছে তার রক্তে। কেউটের নয়, চন্দ্রবোড়ার বিষ। একবারে ফুরিয়ে যায় না, তিলে তিলে পচিয়ে মারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, সত্যি সত্যিই মরে গেছে কান্তি। ওই গানের স্রোতে যে এখনো ভেসে চলেছে, সে রক্তমাংসের জীবিত দেহ নয়, লখিন্দরের গলিত শব।

বারে বারে যেমন হয়, আজও তেমনি দাদুর চিঠিখানাকে পুরোনো পঞ্জিকার মধ্যে আবার ভাঁজ করে রেখে দিলে কান্তি। উঠে এসে চুপ করে বসল খাটের কোনায়, জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে। মা কীর্তন শুনতে গেছেন, ফিরতে রাত বারটার আগে নয়। এখন সে একেবারে একা। নিজের কাছে সে নিজে ছাড়া আর কেউ নেই।

রাত্রির আকাশ থেকে যেন একটা সুর ভেসে এল। দরবারী কানাড়া। দাদুর চিঠিটাকে মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা কোষে কোষে অনুভব করতে করতে, সূচিকাভরণের মতো কতগুলো তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার বিন্দুকে আস্বাদন করতে করতে তবুও কান্তি একবার হাত বাড়াল তানপুরার দিকে। কেমন ঠাণ্ডা আর কঠিন মনে হল যন্ত্রটাকে, কান্তির হাত ফিরে এল। বেহালাটার কথা মনে হল। না—ওটাও থাক।

জানলার গরাদের নীচে কাঠটার উপরে আস্তে মাথাটা নামিয়ে রাখল। বাইরে থেকে খানিক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে চুলের মধ্যে খেলে যেতে লাগল। কপালে ব্যথা লাগছিল, তবুও মাথা সে তুলতে পারল না। অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে মাথাটা—কয়েক মন লোহা জমাট বেঁধেছে সেখানে।

জেগে জেগে কান্তি স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন দেখল সাতাশ বছর আগেকার।

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি ভালো করে। ইস্কুলের হেডপণ্ডিত তারাকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়রত্ন গঙ্গাস্নান করে মন্ত্র পড়তে পড়তে বাড়ি ফিরছিলেন। অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছিল তাঁর খড়মের শব্দ—তাঁর মন্ত্রপাঠের স্বর।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তারাকুমার। তাঁরই রোয়াকের উপরে চুপ করে বসে আছে একজন বিদেশী মানুষ। বয়েস বাইশ-তেইশ হবে। সুঠাম, সুন্দর চেহারা, দেখলে মনে হয় বিশিষ্ট ভদ্রঘরের ছেলে। কিন্তু জামাকাপড় তার ছেঁড়া, মুখে-চোখে অসুস্থ ক্লান্তির ছাপ। স্পষ্টই বোঝা যায়, কিছুদিন ধরে সে পেট ভরে খেতে পায়নি, রাত্রে ঘুমোতে পায়নি।

"কে তুমি ?"

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে তারাকুমারের পায়ে।

"আমার নাম শান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। আমি বিদেশী।"

তারাকুমার বললেন, "বিদেশী সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বাড়ি কোথায় ?"

"বর্ধমান জেলায়। শক্তিপুরে।"

"এখানে কেন ?"

"মা-বাপ নেই—আত্মীয়েরা সম্পত্তির লোভে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিল। তাই চলে আসতে হল দেশ ছেড়ে। ভাগ্যের সন্ধানে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গিয়েছিল, তাই একটুখানি বসেছিলাম আপনার দাওয়ায়। অপরাধ নেবেন না—আমি এখুনি চলে যাব। একটু জিরিয়েই।"

তারাকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন শান্তিভূষণের মুখের দিকে।

অনুমানে ভুল হয়নি তাঁর। অন্তত দুদিন এর খাওয়া হয়নি ; চোখের লালচে রঙ বলে দিচ্ছে, অন্তত তিন রাত চোখের পাতা বন্ধ হয়নি মানুষটার।

বললেন, "খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। সকালবেলাতেই ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি এসেছ—দুটি খেয়ে যেয়ো।"

শান্তিভূষণের লাল চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। বললে, "পকেটে পয়সা ছিল না—রাস্তার ধারের ক্ষেত থেকে কয়েকটা আক ভেঙে খাওযা ছাড়া পরশু থেকে কিছু আমার জোটেনি। আপনি আমায় বাঁচালেন।"

আদর করে অতিথিকে অন্দরে নিয়ে গেলেন তারাকুমার। মা-মরা একমাত্র মেয়ে কিশোরী ইন্দুমতী অতিথির জন্যে হাতমুখ ধোবার জল আর গামছা এগিয়ে দিলে।

খেতে বসে সব শুনলেন তারাকুমার। শান্তিভূষণ একেবারে মূর্খ নয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে—উপাধি আছে কাব্যতীর্থ। চেহারাটি সুন্দর। কথাবার্তা চাল-চলন বড ঘরের মতো।

খেয়ে উঠে তামাক ধরিয়ে তারাকুমার বললেন, "চলেছ কোথায়? কলকাতায়?"

"তাই তো ভাবছি।"

"হেঁটেই যাবে?"

"পঁয়ত্রিশ মাইল হেঁটে এসেছি, এ পনেরো মাইলও পারব।"

"তা পারবে।" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানলেন তারাকুমার, তারপর বললেন, "কলকাতায় গেলেই কি চাকরি পাবে?"

"জানি না। চেষ্টা করে দেখব।"

"জানাশুনো কেউ আছে?"

"দেশের দু-চারজন নানা অফিসে কাজ করে। তাদের ধরব।"

"হুঁ।"—তারাকুমার কলকেটা উবুড করে রাখলেন। "কলকাতায় চাকরি করবার একটা আলাদা লোভ আছে বটে। তবে এখানেও একটা

ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের স্কুলে টাকা চল্লিশেকের একটা চাকরি খালি আছে।"

"এখানে?"

"থাকতে পারো আমার বাড়িতে। আমার ছেলে নেই। তোমারও শুনলাম কেউ নেই। যদি ইচ্ছে করো আমার ছেলের মতোই থাকতে পারো এখানে।"

এর পরে আর কথা জোগায়নি শান্তিভূষণের। একেবারে তারাকুমারের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল সে।

চাকরি হয়ে গেল সেই দিনই। আর কাজ বাড়ল ইন্দুমতীর। একজনের জায়গায় দুজনকে ভাত বেড়ে দিতে হয়। দুজনের চাদর ভাঁজ করে দিতে হয়, কাচতে হয় জামা-কাপড়।

ভদ্র, নম্র মানুষ শান্তিভূষণ। ইন্দুমতীর দিকে চোখ তুলেও তাকায় না কোনোদিন।

দিন কয়েক বাদেই হেডমাস্টার তারাকুমারকে ডাকলেন। বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা আছে পণ্ডিতমশাই। শান্তিভূষণ সম্পর্কে।"

শান্তিভূষণ সম্পর্কে? কেমন ঘাবড়ে গেলেন তারাকুমার। সেকালের ইংরেজী-জানা কড়া-মেজাজী হেডমাস্টার। এমনিতে মাটির মানুষ—কিন্তু অন্যায় দেখলে দুর্বাসা। তখন তাঁর হাতে কারো নিস্তার নেই। ছাত্রের নয়—মাস্টারেরও না।

শুকনো গলায় তারাকুমার বললেন, "কী হয়েছে শান্তিভূষণের? পড়াতে পারছে না?"

"পারছে না মানে?" হেডমাস্টার বললেন, "চমৎকার পড়ায়। আরো আশ্চর্য কী জানেন পণ্ডিতমশাই—ওকে শুধু ম্যাট্রিক পাশ বলে মনেই হয় না। বি-এ পাশের চাইতেও ভালো ইংরেজী লেখে। বিদ্যে ভাঁড়ায়নি তো পণ্ডিতমশাই?"

গর্বে ফুলে উঠে তারাকুমার বললেন, "বিদ্যে কেউ কখনো ভাঁড়ায় না স্যার। কমং বাড়িয়ে বলে।"

"তা বটে।" হেডমাস্টার মাথা নাড়লেন: "রাইট ইউ আর। কিন্তু ছেলেটি মশাই হীরের টুকরো। ভারী খুশী হয়েছি ওর কাজ দেখে। ম্যাট্রিক পাশ, কিন্তু আমি ভাবছি ওকে ওপরের ক্লাসে ইংরেজী পড়াতে দেব।"

হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরলেন তারাকুমার। ডেকে বললেন, "শুনেছিস ইন্দু, হেডমাস্টার আজ আমাদের শান্তির কত প্রশংসা করলেন। বললেন, এমন টীচার তাঁর স্কুলে আর দুটি নেই।"

মাথা নিচু করে, অল্প একটু হেসে ইন্দুমতী রান্নাঘরে চলে গেল।

সেই থেকে তারাকুমার ভাবতে শুরু করলেন। ছ মাস ধরে ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত কথাটা খুলে বললেন শান্তিভূষণকে।

একবারের জন্মে চমকে উঠল শান্তিভূষণ—একবারের জন্মে মুখের রঙ বদলে গেল তার।

"কিন্তু আমি তো—"

তারাকুমার বাধা দিলেন, "তোমায় কিছু বলতে হবে না। ছেলের মতো কাছে রয়েছ—ছেলের দায়িত্বও তোমায় দিয়ে যেতে চাই। শুধু বলো আমার ইন্দুকে তোমার পছন্দ হয় কিনা।"

কী একটা কাজে সেই মুহূর্তে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল ইন্দুমতী। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। একবারের জন্মে চোখ তুলে শান্তিভূষণ দেখল ডুরে শাড়ির উপর ভ্রমরকালো একরাশ এলোচুল, স্থলপদ্মের মতো দুখানি পা।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শান্তিভূষণ বললে, "পছন্দের কথা কী বলছেন, ইন্দুকে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।"

উল্লসিত হয়ে তারাকুমার বললেন, "আমি জানতাম। আমার মেয়েকে কিছুতেই তুমি অপছন্দ করতে পারবে না।"

"কিন্তু—" আর একবার কী বলতে গিয়েও বলতে পারল না শান্তিভূষণ।

"কিন্তুর আর কিছু নেই।" উৎসাহিত হয়ে তারাকুমার বললেন, "তা হলে তো কথা হয়েই গেল। অবশ্য তোমার একটা ঠিকুজী পেলে ভাল হত। কিন্তু

না পেলেও ক্ষতি নেই, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি সমস্ত সুলক্ষণ আছে তোমার ভেতরে। দেখি হাতখানা—"

ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে দিলে শান্তিভূষণ।

"বাঃ—সুন্দর হাত। উজ্জ্বল বৃহস্পতি। দীর্ঘায়ু যোগ—অর্থভাগ্য আছে। আঙুল দেখে বোঝা যাচ্ছে দেবগণ। রাজযোটক হবে।"

আর একবার শান্তিভূষণের মুখ থেকে সব রক্ত সরে গিয়েছিল—কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে। তারপর শান্তিভূষণ বলেছিল, "বেশ তাই হবে। আপনি যা আদেশ করবেন তাই আমি করব।"

ঠিক হতে লাগল আরো মাসখানেক। তারপরেই তারাকুমার কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলেন।

"নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

বাবা হরিপদ, আমার আশীর্বাদ জানিবে। বিশেষ সমাচার এই যে, আগামী ১২ই আষাঢ় আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দুমতীর সহিত বর্ধমান জিলার শক্তিপুর নিবাসী স্বর্গীয় প্রতাপভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান শান্তিভূষণের শুভ-বিবাহ—"

চিঠি হয়তো শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি হরিপদর কাছে। কিন্তু বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভব ওই ১২ই আষাঢ়েই।

আরো এক বছর কাটল তারপরে। রাজযোটকই বটে। মাটিতে নয়—যেন আকাশে পা ফেলে চলতে লাগলেন তারাকুমার। ইন্দুমতীর মুখ দেখে বুঝতে পারতেন যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন।

স্বপ্ন ভাঙল একদিন ভোরবেলায়। ইন্দুমতীই এনে দিল সে চিঠি। তারাকুমারের সামনে সেটা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা। সারা দিন সে-দরজা আর খোলেনি।

চিঠিতে লেখা ছিল :

"আমার আর থাকবার উপায় নেই। কেমন সন্দেহ হচ্ছে পুলিশে আমার খবর পেয়েছে। আমার হাত দেখে আপনি বুঝতে পারেননি। আমি খুনী—

পলাতক আসামী। আপনার কাছে আশ্রয় পেয়ে ভেবেছিলাম যে, এখানেই জীবনটা কাটিয়ে যাব। কিন্তু সে আর হল না। আপনাদের সামনে দিয়ে আমার কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে, সে-অপমান আমার সইবে না। বিশেষ করে ইন্দুকে অত বড় আঘাত আমি দিতে পারব না।

বুঝতেই পারছেন, আমি মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার নাম ধাম কী তা জানিয়ে কোনো লাভ নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার কন্যা আপনি ব্রাহ্মণের হাতেই সম্প্রদান করেছিলেন।

জানি না, আমার শেষ পরিণাম কী। হয়তো ফাঁসিকাঠে, নইলে দ্বীপান্তরে। কারণ, ধরা আমি একদিন পড়বই। তবু আশা আছে—আবার আমি ফিরব। আপনি আমায় সন্তান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই দাবিতেই ক্ষমা চাইতে ফিরে আসব আপনার কাছে।"

পুলিশ অবশ্য এল না, শান্তিভূষণও ফিরে আসেনি আর। কিন্তু তার চলে যাওয়ার চার মাস পরে কান্তিভূষণের জন্ম হল। কান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। মিলিয়েই নাম রেখেছিলেন তারাকুমার। অজ্ঞাত-পরিচয়ের লজ্জা দিয়ে কান্তিকে তিনি পৃথিবীর সামনে ছোট করতে চাননি।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকেনি। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছে। যতদিন তারাকুমার বেঁচে ছিলেন, প্রাণপণে আড়াল দিয়ে রেখেছিলেন কান্তিকে। তাঁর আড়াল সরে গেলে কান্তি জানতে পারল। তার আগেই কুশ-পুত্তলী পুড়িয়ে মা বৈধব্য নিয়েছিলেন।

কান্তি জানতে পেরেছে সাত বছর আগে, তার আঠারো বছর বয়সের সময়। তারপরে সেই গঙ্গাযাত্রীদের সেই গোখরো সাপের ফোকরভরা ঘর, সেই পুরনো বটের ডাকিনী ছায়া, সেই কালি-ঢালা কালপুরুষের খড়্গ-কাঁপা গঙ্গার স্রোত, ওপারে চিতার আলো, আত্মহত্যার রোমন্থন, তারপরে মনে হওয়া : আজ থাক।

আজ থাক। সাত বছর থেকে মনে হচ্ছে, আজ থাক। তা ছাড়া কান্তি কেমন করে ভুলবে তার কথা—সেই মেয়েটির কথা, সুপ্রিয়া যার নাম?

চমকে কান্তি জানালার কাঠ থেকে মাথা তুলল। কয়েকটা নারকেল গাছের ওপারে মজুমদারদের সাদা বাড়িটা দেখা যায়। আলো জলছে তার তেতলার ঘরে। সুপ্রিয়ার ঘরে। সুপ্রিয়া এসেছে নাকি কলকাতা থেকে?

না—সুপ্রিয়া নয়। তার পাশের ঘর। সুপ্রিয়ার বিধবা পিসিমা থাকেন ও-ঘরে।

কান্তি উঠে বসল। সুপ্রিয়া। তার চাইতে বছর চারেকের ছোট—ছেলেবেলার খেলার সাথী।

আঠারো বছর বয়েসে গঙ্গার ধার থেকে উঠে কান্তি বাড়ি ফেরেনি। গিয়েছিল সুপ্রিয়ার কাছে। সুপ্রিয়া পরীক্ষার পড়া পড়ছিল—কান্তি সোজা গিয়ে ঢুকল তার ঘরে।

পাড়াগাঁয়ের পরিচয়—কেউ বাধা দেয়নি। শুধু সুপ্রিয়ার মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কান্তি যে! এত রাতে?"

যা হোক একটা জবাব দিয়ে কান্তি উঠে গিয়েছিল উপরে।

কিশোরী বছরের সুপ্রিয়া কী বুঝেছিল সে-ই জানে। বড় বড় চোখ মেলে শুনেছিল সব কথা। এগিয়ে এসে হাত রেখেছিল কান্তির চুলের উপর। বলেছিল, "তোমার কেউ না থাক, আমি আছি।"

"চিরদিন থাকবে?"

"চিরদিন।"

কান্তি বুঝতে পারে কেন সে আত্মহত্যা করেনি এতদিন। তার পরিচয় নেই—সে খুনীর সন্তান—হত্যাকারীর রক্তে তার জন্ম, তবু সে বেঁচে থেকেছে ওই একটি কথায়—একটি শক্তিতে।

"চিরদিন। চিরদিন আমি তোমার জন্যে থাকব।"

কলকাতায় কলেজে পড়তে গেল সুপ্রিয়া। যাওয়ার সময় কান্তির চোখ জলে টলটল করে উঠেছিল।

"আমি ম্যাট্রিক ফেল। তুমি কলেজে পড়তে যাচ্ছ। তোমার কাছে আমি কত ছোট হয়ে গেলাম।"

সুপ্রিয়া সস্নেহে কান্তির কপালে একটা টোকা দিয়ে বলেছিল, "আর তুমি যে গানে এম-এ পাশ করে বসে আছ। বিশেষ করে, তবলায় পি-এইচ-ডি। সেখানে তো তোমাকে আমি কোনোদিন ছুঁতে পারব না।"

সান্ত্বনা দিয়ে গেল—না মনের কথা? তবু সেই থেকে গানের জোর নিয়েই দাঁড়াতে চেয়েছে কান্তি। ভোরের অন্ধকারে হয়তো তবলা নিয়ে বসেছে, বাজনা শেষ করেছে সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে। বিদ্যার ঐশ্বর্য নিয়ে যতই এগিয়ে যাক সুপ্রিয়া, গুণের জোরে তার কাছে পৌঁছতে হবে কান্তিকে। সেই তার স্বীকৃতি—সেইখানেই তার মর্যাদা।

তারপর আরো এগিয়ে গেছে সুপ্রিয়া। বি-এ পাশ করে একটা স্কুলে মাস্টারি নিয়েছে—আর তার গান শেখা চলছে ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছে। আজকাল তো দেশে আসবার সময়ই পায় না। কলকাতায় গিয়ে দু-একবার দেখা করেছিল কান্তি, কিন্তু লোকের ভিড়ে ভারী দূরের মনে হয় সুপ্রিয়াকে। মনে হয়, নিজের পরিচয়হীন জীবন নিয়ে তার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারবে না। সেখানে অনেক মানুষ, যারা দেশের সেরা জ্ঞানী গুণীর দল, যাদের গলা উঁচু করে বলবার মতো বংশপরিচয় আছে, সংসারে গ্লানি নিয়ে যাদের অন্ধকারের আড়াল খুঁজে বেড়াতে হয় না।

তবু সুপ্রিয়া যখন আসে—যখন এই গ্রামের একান্ত গণ্ডিটুকুর মধ্যে ফিরে আসে, তখন কান্তির মনে হয় এখনো তার আশা আছে। আজও কাছে গিয়ে বসলে কখনো কখনো সুপ্রিয়া তার হাত নিজের হাতের ভিতরে টেনে নেয়। বলে, "এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন কান্তিদা?"

"তপস্যা করছি তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে।" একটু চুপ করে থেকে সুপ্রিয়া জবাব দেয়, "আমি এমন কিছু দুর্মূল্য নই কান্তিদা যে, তার জন্যে তুমি এমনভাবে শরীর নষ্ট করবে। তুমি বড় ওস্তাদ হও, গুণী হয়ে ওঠ, সারা দেশের মানুষ চিনে নিক তোমাকে। কিন্তু আমার জন্যে কোনো দাম তুমি দিচ্ছ, এ-কথা শুনলে আমার লজ্জাই বেড়ে যেতে থাকে।"

"নইলে তোমার যোগ্য হব কী করে?"

"আমার যোগ্য! আমি কতটুকু? কত বড় পৃথিবী রয়েছে তোমার জন্যে। সেই পৃথিবীতেই তোমার প্রতিষ্ঠা হোক কান্তিদা।"

কান্তি খুশী হবে কিনা বুঝতে পারে না। এড়িয়ে যেতে চায়? জীবনে জায়গা দিতে পারবে না জেনেই কি ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় পৃথিবীর ভিতরে? নিজের ঘরের দরজা খুলে বরণ করে নিতে পারবে না সেই জন্যেই কি সভায় বসিয়ে দিতে চায় সকলের মাঝখানে?

কান্তি উঠে বসল। বাইরে রাত বাড়ছে। সুপ্রিয়ার ঘরের জানালাটা অন্ধকার। কলকাতা থেকে ফেরেনি সুপ্রিয়া।

একটা রিকশা এসে থামল দোরগোড়ায়। মা ফিরেছেন। কড়াটা নড়ে ওঠবার আগেই দরজা খুলে দেবার জন্যে কান্তি বাইরের দিকে পা বাড়াল।

আজ সমস্ত রাত ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে বার বার মনে হবে, সুপ্রিয়া আসেনি।

তিন

হরিশ মুখার্জি রোডে সুপ্রিয়ার কাকা অমিয় মজুমদারের বাড়ি।

অবশ্য ভাড়াটে বাড়ি। মাঝারি ধরনের অ্যাডভোকেট অমিয় মজুমদার এখন পর্যন্ত নিজের বাড়ি করে উঠতে পারেননি, কেবল গল্‌ফ ক্লাব রোডে কাঠা পাঁচেক জমি সংগ্রহ করে রেখেছেন। একবার বাড়ির জন্যে অনেকখানি তোড়জোড় আরম্ভও করে দিয়েছিলেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, জমির দর বাড়ছে। তখন অমিয় মজুমদারের মনে হল, পাঁচ গুণ বেশী দামে জমিটাকে বিক্রি করে দেওয়া যেতে পারে। অতএব জমি বেচে সেই পাঁচগুণ লাভ করবেন না বাড়ি করবেন, এখনো এই দো-টানার মধ্যে তাঁর দিন কাটছে।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটিও মন্দ নয়। তেতলা, ভাড়া একশোর কিছু বেশি। প্রায় ত্রিশ বছর আছেন—যুদ্ধের বাজারে ভাড়া গোটাকুড়িক টাকা বাড়িয়েছে বাড়িওলা। অমিয় মজুমদার আপত্তি করেননি। বারোখানা ঘর, পুব-দক্ষিণে খোলা, সামনে পার্ক, তিনি ছেড়ে দিলে কম করেও সাড়ে তিনশো টাকা রোজগার হবে বাড়িওলার।

সুপ্রিয়া কাকার কাছেই থাকে।

অমিয় মজুমদার এই ভাইঝিটিকে বিশেষ ভালোবাসেন। তাঁরও এককালে গান-বাজনার শখ ছিল, ওকালতির চাপে সেটা দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। তাঁর ছেলেমেয়েরাও গাইয়ে-বাজিয়ে হয়ে উঠুক, এ ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। কিন্তু বড ছেলে হল হকি খেলোয়াড। মেজোটি হল এমন অসাধারণ ভালো ছেলে যে গান-বাজনা দূরে থাক, থিয়েটায় সিনেমায় পর্যন্ত তার রুচি নেই, এখনো বি-এ পাশ করেনি, এর মধ্যে মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটেছে আর কেওড়াতলায় কোন এক বাবা কালিকানন্দের আশ্রমে যোগ দিয়ে কোরাসে কালীর মাল্‌সী গাইছে। অমিয় মজুমদার সেটাকে কিছুতেই গান বলে স্বীকার করতে রাজী নন। ছোট ছেলেটি স্কুলে পড়ে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখছে। অমিয়বাবুর ঠিক ক্ল্যাসিকাল নইলে মনটা খুঁতখুঁত করে।

একমাত্র মেয়ে রেবার গানের গলা নেই, তাকে সেতার শেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিনে এনেছেন দুশো টাকা দামের এক তরফদার সেতার। আজ তিন বছর ধরে রেবা সেতার শিখছে। কেমন শিখছে শোনবার জন্যে কৌতূহল হয়েছিল একবার। কিন্তু মিনিট দুই শুনেই বুঝতে পারলেন দুশো টাকার সেতারটা না কিনলেই চলত। রেবা লোককে শোনাবার মতো একটা যন্ত্রই বাজাতে পারে—সে হল গ্রামোফোন।

অমিয় মজুমদার সেদিন হিংস্রভাবে সারা রাত মোটা মোটা আইনের বই পড়েছেন, পড়েছেন অসংখ্য জটিল চীটিং কেসের বিবরণ। এত জিনিস সংসারে থাকতে বেছে বেছে ওগুলো যে কেন পড়তে গেলেন, তার উত্তর একমাত্র তিনিই জানেন। সারা পৃথিবীটাই অসঙ্গতভাবে তাঁকে ঠকিয়েছে, হয়তো এমনি কিছু একটাই তাঁর মনে হয়ে থাকবে। স্ত্রী শোবার কথা বলতে এসেছিলেন, গোটা দুই ধমক দিয়েছেন তাঁকে, মাঝ রাত্রে একটুকরো দাম্পত্য কলহ হয়ে গেছে।

"গান কোত্থেকে হবে? মামাবাড়ির দিকটাও তো দেখতে হয়।"

"আমার বাপের বাড়ির বদনাম কোরো না।" স্ত্রী চটে উঠেছেন, "আমার দাদা—"

"জানি, জানি, আই-এ-এস। তোমার বাবা এম-আর-সি-পি। তোমার ছোট ভাই মুন্সেফ। ইচ্ছে করলে আরো অনেক বলতে পারো। কিন্তু গানের দিক থেকে সব একেবারে গন্ধর্ববংশাবতংস! গলার আওয়াজ শুনলেই মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সুরকে ধ্বংস করবার জন্যে এদের আসুরিক আবির্ভাব। তোমার ছেলেমেয়েরা সেদিক থেকে মামাবাড়ির রাস্তাই ধরেছে।"

স্ত্রী রাগ করে চলে এসেছেন। রাত দুটো পর্যন্ত কল চালিয়ে খামোখা ডজন দুই বালিশের ওয়াড় সেলাই করেছেন—কোনো দরকার ছিল না।

তাই সুপ্রিয়া কলকাতায় পড়তে এলে ভারী খুশী হয়েছেন অমিয় মজুমদার।

"অসুরের দেশে সুরের লক্ষ্মীর আবির্ভাব হল।"

ব্যাপারটায় সব চাইতে বেশী হিংসা হবার কথা ছিল সুপ্রিয়ার সমবয়সী রেবার। কিন্তু অমিয়বাবুর চাইতেও রেবা নিজে অনেক ভালো করে জানত যে সেতার-টেতার তাকে দিয়ে হবে না। একবার কলেজের সোশ্যালে বাজাতে গিয়েই সেটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল।

তাই সুপ্রিয়া আসবার কয়েকদিন পরেই রেবা বলেছিল, "কিছু যদি মনে না করিস, তোকে একটা প্রেজেণ্ট করতে চাই সুপ্রিয়া।"

"প্রেজেণ্ট করবি—তাতে মনে করতে যাব কেন? এ তো খুশী হওয়ার খবর।"

"নিবি তা হলে?"

"নির্ঘাত।"

"তবে নিয়ে নে। ভোম্বল হালদারকে।"

"ভোম্বল হালদার?" সুপ্রিয়া হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, "সে আবার কে? তা ছাড়া পৃথিবীতে এত ভালো ভালো জিনিস নেবার থাকতে ও-রকম বিশ্রী নামওলা একটা লোককে নিতেই বা গেলাম কেন?"

"নামটা বিশ্রী বটে—" রেবা গম্ভীর হয়ে বললে, "লোকটা নিদারুণ গুণী। পঁয়ত্রিশটা মেডেল আছে। নামজাদা সেতারী। আমাকে সেতার শেখান। আঙুল টনটন করে, প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জো হয়, তবু ছাড়তে চান না। তুই ওঁকে নে। মনের মতো শিষ্যা পেলে উনিও খুশী হবেন, আমারও হাড়ে বাতাস লাগবে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ ভাই। একেবারে মনের কথা বলছি তোকে। সেই সঙ্গে আমার সেতারটাও দিয়ে দেব তোকে। ফাউ।"

রেবার আন্তরিকতায় সন্দেহ ছিল না, কিন্তু উপহারটা নেওয়া সম্ভব হল না সুপ্রিয়ার। তবে নিদারুণ ভাব হয়ে গেছে দুজনের। সুপ্রিয়া যেবার বি-এ পাশ করল ডিস্‌টিংশনে, সেবারে চমৎকারভাবে ফেল করল রেবা। অমিয় মজুমদার একটা কথাও বললেন না, ঘরে গিয়ে আবার চীটিং কেসের বিবরণ

দিয়ে বললেন। আর ভাবতে লাগলেন, আইনের এখনো অনেক অ্যামেন্ডমেন্ট দরকার, সব রকম চীটিং চল্‌তি পেনাল কোডের আওতায় পড়ে না।

শুধু স্ত্রীকে একবার গম্ভীর গলায় বললেন, "আই-এ-এস্, এম-আর-সি-পি, মুন্‌সেফ মামাবাড়ি কী বলে?"

স্ত্রী বললেন, "সব কৃতিত্বটুকু মামাবাড়িকেই দিচ্ছ কেন? বাপের বাড়িও কিছু পেতে পারে।"

"বাপের বাড়ি!" উত্তেজিত হয়ে অমিয়বাবু বললেন, "বাপের বাড়িতে কেউ কখনো ফেল করেনি। তারা আই-এ-এস হয়নি বটে, কিন্তু পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছে। তারা—"

রেবা এই পর্যন্ত শুনেই চলে এসেছিল। সোজা সুপ্রিয়ার ঘরে।

আশ্চর্য মেয়েটা। রেবার জন্যে সমবেদনায় সুপ্রিয়া যখন ম্রিয়মাণ হয়ে বসে আছে, তখন হাসির ঝঙ্কারে সমস্ত ঘরখানা রেবা ভরে তুলল।

"সত্যি—বাবা-মার ঝগড়া দারুণ ইনটারেস্‌টিং। ফাইন—আর্টিষ্টিক ব্যাপার।"

"ফেল করে তোর দুঃখ হচ্ছে না রেবা?"

"বিন্দুমাত্র নয়। পাশ করলেই দুঃখিত হতাম ইউনিভার্সিটির দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে।" রেবা সুপ্রিয়ার পাশ ঘেঁসে বসে পড়ল, "আসল কথা কী, জানিস? বাবার উচিত এবারে আমার বিয়ে দেওয়া।"

"ছিঃ ছিঃ।" সুপ্রিয়া লাল হয়ে উঠল, "তোর লজ্জা করছে না এসব বলতে?"

"তার চাইতেও লজ্জা হচ্ছে বাবার টাকা আর ভোম্বলদার পরিশ্রম নষ্ট হচ্ছে বলে। তোকে সত্যি কথা বলি, ভাই। আমি খুব ভালো গিন্নী হতে পারব।"

"বটে?"

"তুই দেখিস। এমন ভালো বাজারের হিসেব রাখব যে, চাকরে একটা পয়সা সরাতে পারবে না। কোর্টে যাওয়ার সময় কর্তা দেখবেন তাঁর কোট-ট্রাউজারের

একটা বোতামেও গোলমাল নেই। গয়লা জোলো দুধ দিয়ে পার পাবে না। ধোপা যদি একটা জিনিসও খুইয়েছে, তা হলে আমার হাতে তার নিস্তার নেই। ছেঁড়া মোজা সেলাই করার ব্যাপারে আমার অ্যাচিভমেণ্ট দেখে পাড়ার ঝানু গিন্নীদেরও তাক লেগে যাবে।"

সুপ্রিয়া হেসে উঠল।

"হাসির কথা নয়, খুব সিরিয়াসলি বলছি। পৃথিবীতে সব কাজ করবার জন্যে সবাই আসে না। একদল মেয়ে জন্মায় গিন্নী হবার জন্যে, আর একদল জন্মায় না-হওয়ার জন্যে। আমি প্রথম দলের। বাবা সেটা বোঝেন না—তাই এখনো আমার বিয়ে দিচ্ছেন না।"

"বলিস তো আমি কাকাকে জানাতে পারি।"

"আমার আপত্তি নেই। তবে জানিস তো, বাবা উকিল মানুষ। সোজা জিনিসটাকে ঠিক উলটো দিক থেকে দেখবেন। নির্ঘাত মনে করবেন আসলে বিয়ের ইচ্ছাটা তোরই, নিজে বলতে পারিসনে, তাই আমার ওপরে চাপাচ্ছিস। আর বিকেলেই দেখবি প্রসপেক্‌টিভ্‌ বর আর তাদের বাবা-দাদাদের পায়ের ধুলো পডতে শুরু হয়েছে।"

সুপ্রিযা হেসে বললে, "ভালোই তো। আমিও বিয়ে করে ফেলব।"

"উঁহু—সে হবে না।" রেবা মাথা নাডল।

"কেন হবে না? আমিও তো গিন্নী হতে পারি।"

"না। যারা গিন্নী না হওয়ার জন্যেই জন্মায়—তুই সেই দলের।"

"বলিস কী। আমার কোনো আশা নেই?"

রেবা হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাসতে পারল না। কী মনে করে কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, "আমার কী মনে হয়, জানিস? তোকে সবাই খুঁজবে, কিন্তু তুই কাউকে চাইতে পারবি না। তোর কাছে অনেকে আসবে, কিন্তু তোর মনে হবে, তারা সবাই যেন এক-একটা টুকরো। সকলকে মিলিয়ে একজন মানুষকে তুই পেতে চাইবি, কিন্তু সেই মানুষটি তোর জীবনে কোনোদিন ধরা দেবে না।"

কী মনে করে একসঙ্গে এতগুলো কথা রেবা এমন করে সাজিয়ে বলে গেল সে-ই জানে। হয়তো বলার জন্যেই বলা, হয়তো এমনি ভারী ভারী কথা বললে নিজের কানেই শুনতে ভালো লাগে—তাই বলা। কিন্তু এই মুহূর্তে একবারের জন্যে সুপ্রিয়ার মুখের সমস্ত রক্ত সরে গেল, একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। এক মুহূর্ত। ঘরের বাতাসটা হঠাৎ থমথম করতে লাগল।

সুপ্রিয়া জোর করে হাসতে চেষ্টা করল, "অভিশাপ দিচ্ছিস ?"

"না—দুশ্চিন্তা হচ্ছে।" রেবার মুখে ছায়া নেমে এল, "সত্যি বলছি, তোর সম্বন্ধে প্রায়ই এমনি একটা ভয় আমার মনে ভেসে ওঠে। ভাবি তোর নামের সঙ্গে জীবনেরও কোথাও একটা মিল আছে। তুই প্রিয়াই বটে—কিন্তু কোনো জীবনেই বুঝি তুই স্থির হয়ে থাকতে পারবি না—ঘর বাঁধতে পারবি না কোথাও।"

আবার সেই থমথমে আবহাওয়া। জানলার বাইরে পার্কের পাশে পাম গাছের পাতা কাঁপছে। যেন একটা কঙ্কালের আঙুল হাতছানি দিচ্ছে বাইরে থেকে।

একটু চুপ করে থেকে রেবা বললে, "একটা কথার জবাব দিবি ?"

"বল।"

"জীবনে কজন মানুষকে আজ পর্যন্ত তোর ভালো লেগেছে ?"

সুপ্রিয়ার শঙ্খের মতো শাদা মুখখানা পাথরের মূর্তির কয়েকটা কঠিন রেখায় স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সুপ্রিয়া বলল, "আজ এ-সব কথা থাক—বড মাথা ধরেছে।"

দুর্গাশঙ্করের ওখান থেকে ফিরে নিজের ঘরে কাপড় বদলাচ্ছিল সুপ্রিয়া। উত্তেজিতভাবে রেবা এসে উপস্থিত হল।

"জানিস—আজ কে এসেছিল তোর খোঁজে ?"

"কে ?"

"লখ্‌নউয়ের দীপেন বোস।"

"দীপেন বোস!"

"বা—চিনতে পারিসনি? তোর বাবা যখন লখ্‌নউয়ে থাকতেন তখন ওঁরা নাকি তোদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। খুব পরিচয় ছিল নাকি তোদের সঙ্গে। চিনতে পারিসনি?"

সুপ্রিয়া ক্লান্ত হাসি হাসল, "চিনব না কেন? অত বড় গাইয়ে, ওঁর 'আয়ি রে গগনমে কারী বদরিয়া' তো সারা ভারতবর্ষের লোকে গুনগুন করে। তা দীপেনদা কলকাতায় কেন?"

"কী একটা কনফারেন্সে এসেছেন। নর্থ ক্যাল্‌কাটায়।"

"বুঝেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলাম বটে। কিন্তু দীপেনদার নাম তো চোখে পড়েনি। উঠেছেন কোথায়?"

"পার্ক সার্কাসে। ঠিকানা রেখে গেছেন। তবে কাল সকালে নিজেই আসবেন আবার।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। দীপেন বোস। জীবনে আর-এক গ্রন্থি।

"একদিন আমাদের এখানে গান গাইতে বলিস না। অত বড় গাইয়ে। বাবা ওঁদের অ্যাসোসিয়েশনের কী একটা মীটিঙে গেছেন, দীপেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনলে তো লাফিয়ে উঠবেন। তোর সঙ্গে এত পরিচয়, বললে গাইবেন না এখানে?"

"বলে দেখব।"

রেবা চলে গেল। আয়নার সামনে সুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আর-এক গ্রন্থি। আশ্চর্য, দীপেন বোসের এখনো তাকে মনে আছে।

ম্যাট্রিকের পর। বাবা লখ্‌নউয়ে পোস্টেড। ওঁর চাকরিটা বড় গোলমেলে—ছ মাস এখানে ছ মাস ওখানে। তাই বাবা বাইরে বাসা করেন না, ওরা দেশেই থাকে। কিন্তু সুপ্রিয়া যেবার পরীক্ষা দিল, সেবার হঠাৎ শক্ত অসুখে পড়লেন বাবা। টেলিগ্রামে খবর পেয়ে মা'র সঙ্গে লখ্‌নউয়ে গেল সুপ্রিয়া।

দুখানা ঘর ভাড়া করা হয়েছিল। পাশের বাড়িতেই দীপেন বোসেরা থাকত।

থাকত বলেই সে-যাত্রা রক্ষা। তারাই দেখাশোনা সেবাযত্ন করেছিল। নইলে ওরা গিয়ে বাবাকে হয়তো দেখতেই পেত না। আর সব চাইতে বেশী সেবা করত দীপেন বোস। রাত জেগে হাওয়া করত, ওষুধ খাওয়াত ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মাঝরাতে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনত।

বাবার অসুখ সারল এক মাসেই। এর মধ্যেই দুই পরিবারের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে।

একদিন দীপেন বললে, "শুনলাম, তুমি গান গাইতে পারো সুপ্রিয়া। শোনাও আমাকে।"

"আপনাকে ? আপনি এত বড গাইয়ে—"

"বড গাইয়ে হলেই ছোট গাইয়ের গান শুনতে নেই এমন কথা শাস্ত্রে লেখে না। তানপুরো চলবে ?"

"চলবে।"

"নাও তবে—"

গাইতেই হল অগত্যা। মীবার ভজন। গ্রামের ওস্তাদ সারদা দাসের সবচেয়ে প্রিয় গানটি।

দীপেন সঙ্গত করছিল। গান শেষ হলে কিছুক্ষণ দুটো উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়ার দিকে। পনেরো বছরের কিশোরী। শঙ্খের মতো শাদা রঙ। মাথার কোঁকডা চুলগুলো একটু লালচে। কিন্তু তাই বলে চোখদুটো পিঙ্গল নয়—গভীর কালো। পরনে সাদা জরিপাডের শাড়ি। ঠিক সরস্বতীর মূর্তির মতো মনে হচ্ছিল।

দীপেন বললে, "গলায় গান নিয়েই জন্মেছ তুমি। কোনো ভাবনা নেই তোমার।"

সেই শুরু। শেষ পর্যন্ত :

"যদি বলি, তোমাকেই আমার সবচেয়ে বেশী দরকার ?"

দু পা সরে গেল সুপ্রিয়া। দীপেনের ঘর। বাইরে মাঝরাতের মতো দুপুর। ঘরে আর কেউ ছিল না। দীপেনের চোখে মাতলামির রঙ মাখানো।

"কী বলছেন আপনি ?"

"তুমি চলে এস আমার কাছে।"

"কেমন করে আসব ?"

"গানের ভেতর দিযে। আমার যা আছে সব দেব তোমাকে। আরো যা পাব—তা-ও এনে দেব।"

"এসব কী কথা দীপেনদা ?"

"আমাকে বিয়ে করো তুমি। আমার গানে তুমি প্রেরণা হও। তোমার ছোঁয়ায আমার সুর আরো সুন্দর হযে উঠুক। সুপ্রিয়া—তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না।"

সুপ্রিয়া কাঁপতে লাগল। দীপেনের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন বুকের রক্ত শুকিযে এল তার।

"কিন্তু তা কী করে হয় দীপেনদা ? আপনার যে স্ত্রী আছে।"

"স্ত্রী আছে, কিন্তু সঙ্গিনী নেই। গান আছে, কিন্তু গানের লক্ষ্মী নেই। সেই জায়গা তুমি নাও।"

"বাবা রাজী হবেন না। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি—"

"বেশ তো, আমি অপেক্ষা করব। তুমি সাবালিকা হযে ওঠো। তখন আর কোথাও কোনো বাধা থাকবে না। আমাকে কথা দাও সুপ্রিয়া—"

ঠিক এই সময় বাড়ির চাকর কয়েকটা চিঠিপত্র নিয়ে এসেছিল। যেন চকিতের ভিতরে একটা কঠিন জাল ছিঁড়ে গিয়েছিল সুপ্রিয়ার, মুক্তি পেয়েছিল ভয়াবহ একটা সম্মোহনের গ্রাস থেকে।

"আচ্ছা—ভেবে বলব—"

সুপ্রিয়া ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল একরকম। চাকরটা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে, যেন কী একটা বুঝতে চাইছিল। আর

চলে যেতে যেতেও সুপ্রিয়া অনুভব করছিল, দুটো উত্তপ্ত জ্বলন্ত চোখ পিছন থেকে সমানে তাকে অনুসরণ করে আসছে।

দু-দিন পরেই তারা ফিরে এসেছিল দেশে।

দীপেনের খান তিনেক চিঠি এসেছিল তারপরে। মা'র নামে। ওদের কুশল জানতে চেয়েছিল। অবশ্য তার ভিতরে গোটা কয়েক লাইন ছিল সুপ্রিয়ার জন্যেও।

"কেমন আছ? গান শেখা চলছে তো ভালো? আমাকে চিঠি লেখ না কেন?"

মা সেগুলো তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়া কোনো জবাব দেয়নি। জবাব দেবার সাহস ছিল না তার।

পাঁচ বছর পরে দীপেন বোস এসেছে কলকাতায়। তার খবর জানতে চায়। কী খবর চায় দীপেন বোস—কী বলবে তাকে? সেই মাতলামি-ভরা দুপুরটার কথা কি এখনো সে ভুলে যায়নি? এখনো কি সেদিনের সেই নেশাটা তার মাথার ভিতরে জমাট বেঁধে আছে? আজও কি দীপেন বোস তাকে আবার বলবে, "আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি? এখন তো তুমি বড় হয়ে গেছ—আর কোথাও তো কোনো বাধা নেই?"

সুপ্রিয়া পথে আসতে আসতে ভেবেছিল, আজ একটা চিঠি লিখবে কান্তিকে। আর মনে মনে অনেকগুলো কথা সাজিয়ে রাখবে অতীশের জন্যে। কাল যখন বকুলতলায় এসে অতীশ অপেক্ষা করবে তার জন্যে, তখন সেই সব কথা দিয়ে সান্ত্বনা দেবে তাকে।

কিন্তু আজ আর কিছু হবে না, কিছুই না। সারা রাত চোখের সামনে একটা ছায়া দুলবে আজ। দীপেন বোসের ছায়া। লখ্‌নউ থেকে কলকাতা পর্যন্ত সেই বিরাট ছায়াটা বিশাল কালো রাত্রির মতো জমাট বাঁধতে থাকবে—তার ভিতরে কান্তি আর অতীশের মুখ কোথায় যেন হারিয়ে যাবে।

চার

অতীশ মেসে ফিরে এল।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের মোড় থেকে কাঁকুলিয়া পর্যন্ত হেঁটে এসেছে—অনেকখানি রাস্তা। ট্রামে বাসে চড়েনি, নিজেকে নিয়ে একা থাকতেই চাইছিল কিছুক্ষণ।

সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় কলেজের বার্ষিক উৎসবে। ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিল অতীশ।

"আপনি এত ভালো গান গাইতে পারেন। নিজেকে কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন?"

সুপ্রিয়ার হয়ে জবাব দিয়েছিল সেকেণ্ড ইয়ারের কেকা রায়।

"খোঁজার কাজ তো আপনার। সেই জন্যেই তো আমরা আপনাকে ভোট দিয়ে ইউনিয়নের সেক্রেটারি করেছি।"

"ঠিক কথা। আমি লজ্জিত।" কলেজের রত্ন, বি এস-সি অনার্সের সেরা ছাত্র সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আত্মপ্রকাশ যখন একবার করেছেন, তখন আর আত্মগোপন করতে পারবেন না। সরস্বতী পূজার ফাংশনেও কিন্তু আপনাকে গাইতে হবে—বায়না দিয়ে রাখলাম।"

জীবনের সবচেয়ে পুরনো গল্পটা আবার নতুন করে শুরু হল।

আরো তিন বছর কেটে গেল এর মধ্যে। অতীশ এম-এসসি পাশ করে রিসার্চ করছে, সুপ্রিয়া বি-এ পাশ করে নিয়েছে স্কুল-মাস্টারি আর গান শেখার কাজ।

অতীশ বলেছিল, "এম-এ পড়লে না কেন?"

"কী হবে পড়ে?"

"সেকি কথা! তা হলে বি-এ পাশ করলে কেন?"

"ওটুকু প্রসাধন বলতে পারো। ভদ্রসমাজে বেরুতে গেলে নিজের ওপর যেটুকু কারুকাজ করে নিতে হয়, ঠিক তাই। ও ছাড়া ও ডিগ্রিটার আর কোনো অর্থ নেই আমার কাছে।"

"কিন্তু স্কুল-মাস্টারি তো নিয়েছ। চাকরিই যদি করতে হয়, তা হলে এম-এটা কি আরো বেশী দরকার নয় ?"

"সর্বনাশ! এর পরে তুমি হয়তো আমায় বি-টিও পাশ করতে বলবে। অর্থাৎ একেবারে আপাদ-মস্তক মাস্টারির ছাপ—নিজের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না!"

"তা হলে কী চাও তুমি ?"

"গান শিখতে। চাকরি করছি কেবল হাত-খরচার জন্যে, ও নিয়ে আর বাবার ওপরে চাপ দিতে ইচ্ছে করে না। যেদিন শেখা হয়ে যাবে, সেদিন আর এত সহজে আমায় দেখতে পাবে না।"

"কোথায় যাবে ?"

"সারে হিন্দুস্তানে। তামাম গুণী-জ্ঞানীর দরবারে।"

"সেখানে আমি যেতে পারব না ?"

"সাধ্য কী! তোমার সোনার মেডেলগুলো সেখানে অচল। প্রকাণ্ড আসরে আমি গাইব, সেরা ওস্তাদেরা সঙ্গত করবে, সমজদারদের মাথা দুলবে, থেকে থেকে উঠবে: আহা হা—সাবাস-সাবাস। সামনে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলবে ঘন ঘন। কুড়ি টাকার টিকেটও হয়তো তুমি কিনতে পারবে না।"

"কুড়ি টাকার টিকেটও না ?"

"না। যাদের মস্ত ব্যবসা, অনেক টাকা, অনেক বড় বড় মোটরগাড়ি, তারা আগে থেকেই সব সীট বুক করে রাখবে। তুমি বরং রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাইকে আমার গান শুনতে পাবে। দেখতে পাবে না আমার পায়ের কাছে এসে পড়ছে বড় বড় ফুলের তোড়া, আর হাতে পাঁচ-সাতটা হীরের আংটিপরা বড়লোকের দল কী ভাবে আমাকে স্তুতি করে বলছে: আপনার গান শুনে দিল্ ভারী খোশ হল। অ্যায়সা মিঠা গানা কোথোনো হামি শুনেনি।"

অতীশ হাসবার চেষ্টা করেছিল, "ততদিনে ব্যবসা করে আমিও তো বড়লোক হতে পারি। আমিও তো গিয়ে তাদের দলে ভিড়ে বলতে পারি: বড় খাসা গেয়েছেন—শুনে আমি বড় খুশ্ হলাম!"

"হবে না—সে আশা নেই। ল্যাবরেটরিই তোমার মাথা খেয়েছে। তুমি বড জোর একটা প্রফেসর হবে। আর এ-কথা তুমি নিজেও নিশ্চয় জানো যে, মিউজিক কন্‌ফারেন্সের টিকেট প্রোফেসারের মাইনের সীমানা থেকে অনেক দূরে থাকে।"

কথাগুলো সেদিন হালকাই ছিল। কিন্তু আজ আর নয়। একরাশ মেঘের মতো ঘনিয়ে আসছে মনের উপর। এই মাঝে মাঝে দেখাশুনো, বকুল-তলা থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি এগিয়ে দেওয়া, এক-আধদিন সিনেমায় যাওয়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের পাশে এক-আধটা ছেঁড়া ছেঁড়া সন্ধ্যা, এর বেশী আর কী পাবে অতীশ? কতখানিই বা পাবে?

মেসের ঘরে বসে অতীশ ভাবতে লাগল। পাশের সীটের ছেলেটি এবারে এম-এসসি পরীক্ষার্থী, ঘাড গুঁজে বসে আছে বইয়ের ভিতরে। ওর চশমার পাওয়ার মাইনাস সেভেন। পাশ করবার আগেই চোখ দুটো যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঠিক কথাই বলেছে সুপ্রিয়া। কী হবে পড়ে? এ-পথ ওর জন্যে নয়।

"চাকরি করার কথা ভাবতেই আমার বিশ্রী লাগে।" সুপ্রিয়া বলেছিল।

"এমন কথা বলছ এ-যুগের মেয়ে হয়ে?"

"এ-যুগের মেয়ে বলেই তো বলছি। জীবনে এত ঐশ্বর্য আছে, এত রূপ আছে, এত গান আছে। সেগুলো সব ফেলে দিয়ে কত দুঃখে মেয়েরা চাকরি করতে আসে, সে কি তুমি জানো? আজ তোমরা আর তাদের ভালোবাসার আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখতে পারো না, আশ্রয় দিতে পারো না সেই দুঃখেই তো তারা এমন করে বাইরে বেরিয়ে আসে।"

তর্ক করা চলত। সে-তর্কে সুপ্রিয়া জিততে পারত না। কিন্তু অতীশ কথা বাড়াল না। কী হবে বাড়িয়ে? সুপ্রিয়া নিজের কথা বলছে। ওর আশার কথা, ওর বিশ্বাসের কথা।

অতীশ জানে না কী হবে। সুপ্রিয়া সত্যিই চলে যাবে কাছ থেকে। বলেছে, আর দু-বছর পরেই বেরিয়ে পড়বে। যাবে পুনা—যাবে বোম্বাই—তারপর দক্ষিণভারত। কত শেখবার আছে। সারা ভারতবর্ষে গানের তীর্থ—গীতশ্রীর দেবালয়। সেই তীর্থে তীর্থে প্রদক্ষিণ করতে হবে তাকে, প্রণাম করতে হবে কত বিশ্বনাথের দেউলে, কত মহাকাল-মন্দিরে, কত কাঞ্জীভরমের জ্ঞানবাপী—গোপুরমে। কত গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে তার।

তার পথ সেই সারা ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে আছে। তার গান ছড়িয়ে আছে রাজপুতানার বিশাল মরুভূমিতে, আরব-সমুদ্রের কলগর্জনে, সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের ত্রি-সমুদ্রের সঙ্গম-রাগিণীতে। সেখানে কোথায় অতীশ, কতটুকু অতীশ!

শুধু একদিন সুপ্রিয়া বলছিল, "যেখানে যাই, যতদূরেই যাই, তোমাকে আমি কখনো ভুলব না। যদি আর কাউকে নিয়ে কখনো ঘর বাঁধি—আমার বুকের ভেতরে তুমিই জুড়ে থাকবে।"

"সে তো আর-একজনকে ঠকানো হবে সুপ্রিয়া।"

"সংসারে মানুষ তো সব সময়েই এ-ওকে ঠকিয়ে চলেছে অতীশ। কেউ কম, কেউ বেশী। সবাই যা করে, তার জন্যে আমার লজ্জা নেই। যে পকেট মারে আর যে ব্যাঙ্ক লুঠ করায়, পাপের দিক থেকে তারা দুজনেই সমান।

"এ-যুক্তি ভালো নয় সুপ্রিয়া। লোকে একে ইম্‌মর্যাল বলবে।"

"বলুক। পৃথিবীতে অনেক ভালো কথা আছে অতীশ, তার সবগুলো কেউ কোনোদিন নিতে পারেনি। আমার দিক থেকেও নয় খানিকটা ফাঁক থেকেই গেল। যতদিন বাঁচব, আমি তোমাকেই ভালোবাসব অতীশ। আর-একটা কথা বলি। যদি কখনো আমার সব চাইতে বড় দুর্দিন আসে, যদি তোমার কাছে আমি আশ্রয়ের জন্যে এসে দাঁড়াই, সেদিন তুমি তো আমায় ফিরিয়ে দেবে না?"

"তোমাকে ফিরিয়ে দেব সুপ্রিয়া? এ-কথা ভাবতে পারলে?"

"অতীশ, তুমিও তো মানুষ। ধরো, তখন তুমি বিয়ে করেছ, তোমার সংসার হয়েছে। সে সময় আমি যদি তোমার কাছে এসে বলি, আজ থেকে আমি তোমার কাছেই থাকব, তখন—"

"তোমার জন্যে আমি সব পারব সুপ্রিয়া। সকলকে ছেড়ে তোমাকেই বুকে তুলে নিয়ে চলে যাব।"

"কথাটা নাটকীয় অতীশ। তবু শুনতে ভালো লাগছে। তা ছাড়া জীবনের সব মিষ্টি কথাই তো মিথ্যে কথা। সত্যের নিষ্ঠুরতার ওপরে ওইটুকু রঙের আবরণ। কিন্তু আমি মনে রাখব।"

অতীশ একটা নিশ্বাস ফেলল। পাশের সীটে ছেলেটি ঘাড় গুঁজে সমানে পড়ে চলেছে। চোখে মাইনাস সেভেন পাওয়ারের চশমা। পিঠটা উটের কুঁজের মত বেঁকে রয়েছে।

কী হবে পড়ে?

বাইরে হাওয়া উঠল। একটু দূরের শিরীষ গাছটার পাতায় মর্মর। রাজপুতানার মরুভূমি, বোম্বাইয়ের সমুদ্রতট, দক্ষিণাপথের গ্র্যানিট পাথরে সমুদ্রের গান।

পাঁচ

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে নিজের ঘরে মদের বোতল নিয়ে বসে ছিল দীপেন বোস।

গীতা কাউর এসে ঢুকল। দীর্ঘচ্ছন্দা পাঞ্জাবী মেয়ে। সিল্কের সালোয়ার-পাঞ্জাবিতে গাঢ় লাল রঙের কয়েকটা ফুল। গলা জড়িয়ে নীল ওড়না।

"কী পাগলামি করছ দীপেন? প্লীজ—নো মোর।"

"হোয়াই? কেন আর না?" লাল টকটকে চোখ দীপেনের। বললে, "ইট্‌স নট্‌ ইয়োর বম্বে। নো প্রহিবিশন। আই হ্যাভ্‌ এভ্রি রাইট্‌ টু—"

"প্লীজ দীপেন—তোমার লিভার ভালো নয়।"

"মরে যাব বলছ? মরতেই তো চাই।"

দু-পা এগিয়ে গীতা কাউর বোতলটা কেড়ে নিলে। মাতালের কুৎসিত হাসি হেসে উঠল দীপেন।

"বাঁচতে দেবে না—আবার মরবার সুখটুকুও কেড়ে নিতে চাও?"

বোতলটা নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল দীপেন, পারল না। হুড়মুড় করে টলে পড়ে গেল মেঝের উপর। গীতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে, তারপর আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এক

সকালে উঠেই একরাশ নোট নিয়ে বসে ছিল অতীশ। একটা জটিল ক্যালকুলেশনের জট খুলছে না কিছুতেই। অথচ এর রেজাল্টের উপর কাজের অনেকখানি নির্ভর করছে।

সামনে চা ছিল এবং সেটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। সেটাতে চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখল দেশলাইয়ে কাঠি নেই।

সব দিক থেকেই বিরক্তির মাত্রাটা যেন চরম। পাশের সীটের মনোযোগী ছাত্রটির দিকে অতীশ একবার তাকাল। যদিও ও আদর্শ ভালো ছেলে—সিগারেট কেন, সুপুরির কুচিও চিবোয় না—তবু ওর বালিসের নীচে ঘোড়ার-মুখ-আঁকা একটা দেশলাই আছে, অতীশ জানে। কখনো কখনো অনেক রাতে ও মোমবাতি জেলে পড়াশোনা করে।

সিগারেট ধরাবার জন্যে ওর কাছে দেশলাই চাইবে কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার আগেই দরজার গোড়ায় দেখা দিল মন্দিরা।

"আসতে পারি ?"

"কী আশ্চর্য—আপনি!"—তটস্থ হয়ে চেয়াব ছেড়ে দাঁড়াতে গেল অতীশ। হাতের ধাক্কা লেগে খানিকটা ঠাণ্ডা চা ছলকে গেল অঙ্কটার উপর। ওপাশের সীট থেকে পড়ুয়া ছাত্র শ্যামলাল তার কড়া পাওয়ারের চশমার মধ্য দিয়ে ভ্রূকুটি হানল।

মন্দিরা ঘরে পা দিয়ে বলল, "বিরক্ত করলাম ?"

"কিছুমাত্র নয়। আসুন।"

মন্দিরা এসে অতীশের বিছানার উপরে বসল। অতীশের একবার মনে হল, খবরের কাগজ দিয়ে বালিশ দুটোকে ঢেকে দিতে পারলে মন্দ হত না। ভারী নোংরা হয়ে গেছে ওয়াড়গুলো।

"কাজ করছিলেন ?"

"করতে বাধ্য হচ্ছিলাম।" অতীশ হাসল।

"ভারী অন্যায় হল তা হলে !"

"একেবারেই না। আমাকে বাঁচালেন। ভাবছিলাম, সব ফেলে নিজেই উঠে পড়ব। কিন্তু এখন অন্তত একটা কৈফিয়তের সুযোগ রইল বিবেকের কাছে। আপনার অনাবে অঙ্কটাকে ছুটি দিয়েছি।"

"তার মানে আমাকেই অপরাধী করলেন শেষ পর্যন্ত।"

"ওই দেখুন !" হাতের সিগারেটটা ঠোঁটের কোনায় ছুঁইয়ে, তারপরে দেশলাই নেই সে-কথা মনে করে, অতীশ সেটাকে নামিয়ে রাখল। বললে, "আপনাদের কাছে সিন্‌সিয়ার হওয়ারও জো নেই। আপনারা কেবল মিথ্যে-কথা শুনতেই ভালোবাসেন।"

শ্যামলাল ছটফট করে উঠল। পুরু চশমার মধ্য থেকে একটা বিস্বাদ দৃষ্টি ফেলল অতীশের দিকে। তারপর দুখানা মোটা মোটা বই তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেবিয়ে গেল।

মন্দিরা কিছু একটা অনুমান করল। সংকুচিত হয়ে বললে, "উনি বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েছেন।"

"বিরক্ত নয়—ব্যথিত হয়েছেন।" বলেই অতীশ শ্যামলালের বালিসের তলা থেকে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়ার-মুখ-আঁকা দেশলাইটা সংগ্রহ করল।

"ব্যথিত কেন ? পড়ার বাধা হল বলে ?"

"শুধু তাই নয়। পড়াটাকে ও তপস্যা বলে মনে করে। সেই তপস্যার ক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব ঘটলে ওর ব্রতভঙ্গ হয়।"

"ছিঃ—ছিঃ—আপনি আমাকে আগে বললেন না কেন ?"

"কিচ্ছু ভাববেন না।" সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা আবার শ্যামলালের বালিসের তলায় চালান করে দিয়ে অতীশ বললে, "ওর চিত্তশুদ্ধির জায়গা আছে। সেখানেই গেছে।"

"সে আবার কোথায় ?"

"তেতলার ওপরে—চিলেকোঠায়। সেখানে ঘুঁটের স্তূপ আছে। তারই ওপরে গিয়ে বসবে শ্যামলাল। শরীর পবিত্র হয়ে যাবে। তারপর শান্ত চিত্তে কেমিস্ট্রির আধ্যাত্মিক রসে ডুব মারবে।"

মন্দিরা শব্দ করে হেসে উঠল।

"আপনি ওঁকে প্রায়ই বিব্রত করেন বলে মনে হয।"

"আমি ?" অতীশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, "নিজের চারদিকে ওর এমন শক্ত খোলা আছে যে, পৃথিবীতে কেউ ওকে বিব্রত করতে পারবে না। তেমন অসুবিধে বুঝলে ও নিজেকেই গুটিয়ে নেবে তার মধ্যে। আমার সম্পর্কে ও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। ওর ধারণা আমি ফাঁকি দিয়ে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছি—রিসার্চ করি না, ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াই।"

"নিদারুণ ভালো ছেলে।" মন্দিরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "দিন না আলাপ করিয়ে। আমি কেমিস্ট্রিতে বড্ড কাঁচা। একটু দেখে-টেখে নেব ওঁর কাছ থেকে। যদি আমাকে প্রাইভেট দয়া করে পড়ান তবে সে তো আরো ভালো।"

"তার মানে ওই ঘুঁটের ঘরেই ওকে পাকাপাকি নির্বাসিত করতে চান ? ও কি আর ওখান থেকে নামবে তাহলে ? লাভের মধ্যে বিছেটিছের কামড খেয়ে একটা কেলেঙ্কারি করে বসবে।"

মন্দিরা আবার হেসে উঠল : "আপনি সাংঘাতিক। কিন্তু একটা কথার জবাব দিন তো ? আমাদের বাড়িতে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন কেন ?"

"এতদিন সময় পাই নি।"

"থীসিসের জন্যে ?"

"খানিকটা। প্রায়ই ল্যাবরেটরি থেকে বেরুতে দেরি হয়ে যায়।"

"রবিবার ?"

"ঘুমুতে চেষ্টা করি।"

"সারাদিন ?"

"ইচ্ছেটা তাই থাকে বটে, তবে পেরে ওঠা যায় না।" অতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "অবিমিশ্র সুখ বলে সংসারে কিছু নেই জানেন তো ? প্রায় রবিবারেই শ্যামলালের আর-একটি সীরিয়াস বন্ধু এসে জোটে—দুজনে মিলে কেমিস্ট্রি নিয়ে নিদারুণ চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়।"

"তখন বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয়—এই তো ? তা সে-সময় আমাদের ওখানে চলে এলেই পারেন।"

"ঘুমুবার জন্যে ?"

মন্দিরা বললে, "নাঃ—আপনি হোপলেস। ও-সব থাক। যা বলতে এসেছিলাম। আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাদের বাড়িতে আসছেন।"

"কেন আসছি ?"

"ছোড়দা কেম্‌ব্রিজ থেকে ট্রাইপস নিয়ে ফিরেছে—শুনেছেন আশা করি। আজকে রিসেপ্‌শন আছে তার।"

একটু চুপ করে রইল অতীশ। বললে, আচ্ছা, চেষ্টা করব।"

"কোনো কাজ আছে ?"

"একটুখানি।"

মন্দিরার মুখে অল্প একটু ছায়া পড়ল : "কাজটা জরুরী ?"

"খানিকটা।"

"ও।" মন্দিরা হাতের ব্যাগটার কারুকার্যের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। চামড়ায় খোদাই-করা নটরাজের মূর্তি। আঙুলের ঘামে ফিকে হয়ে এসেছে।

"তা হলে আসছেন না ?"

"বললাম তো চেষ্টা করব।"

এতক্ষণের লঘু আবহাওয়াটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। একটা শিথিল ক্লান্তিতে অতীশ কেমন পীড়িত বোধ করল, এতক্ষণের প্রগল্‌ভতাগুলোকে অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হল তার। আর মন্দিরার মনে হল, সকালবেলাতেই তার এভাবে এখানে চলে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না—একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেই চলত।

"বেশ, চেষ্টা করবেন।" মন্দিরা উঠে দাঁড়াল, "তা হলে আসি আজ।"

"এক্ষুনি চললেন ?"

"হ্যাঁ,—আমাকে আরো কয়েক জায়গায় বলে যেতে হবে।"

মন্দিরা বেরিয়ে গেল। ওকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলে হত—অতীশ একবার ভাবল। কিন্তু কী লাভ হত তাতে ? অপরাধের মাত্রা এতটুকুও কমত না।

দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তার সূত্র। কিন্তু ব্যাপারটা সেইখানেই দাঁড়িয়ে নেই। এক বছর আগেই মন্দিরার চোখ দেখে অতীশ তা বুঝতে পেরেছে। আর সেই থেকেই যাতায়াতের মাত্রা সে কমিয়ে দিয়েছে ও-বাড়িতে।

অবশ্য সুপ্রিয়া না থাকলে অন্য কথা ছিল।

মন্দিরাকে ঠিক খারাপ লাগে তা নয়। অন্তত দুটি ঘণ্টা চমৎকার কাটতে পারে ওর সঙ্গে। অজস্র কথা বলা যায়, উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প করা চলে। কখনো একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার মুহূর্ত এলে, কিংবা একটা গভীরতা এসে মনকে জড়িয়ে ধরলে, চুপ করে বসে থাকা যায় ওর পাশে। যে এক-একটা আশ্চর্য একান্ত দুঃখ কাউকে বলা চলে না, কাউকে বোঝানো যায় না, হয়তো সে-কথাও বলা যায় ওকে। এমন কি, মন্দিরার একখানা হাত নিজের হাতেও টেনে নেওয়া যায়, তার মধ্যে বিশ্বাস থাকে, বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি থাকে।

অতীশ থামতে পারে ওখানেই। মন্দিরার বিয়ের দিনে সে খুশী হয়ে পরিবেষণের কাজে নেমে পড়তে পারে, শুভদৃষ্টির সময় মন্দিরার মুখের ঘোমটা সরিয়ে সে বলতে পারে, "চোখ মেলে তাকাও, ছাখো তোমার

পছন্দ হয় কিনা।" বর-কনেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বলে আসতে পারে, "মাঝে মাঝে আমাদের খোঁজখবর নিয়ো, একেবারে ভুলে যেয়ো না।"

কিন্তু অতীশ জানে, মন্দিরা তা পারে না। মেয়েদের মনের সমুদ্রে যে-ঢেউ ওঠে, তাকে তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না রেখার সীমান্তে। পুরুষ বরং নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে: কিছু স্নেহে, কিছু প্রেমে, কিছু বন্ধুত্বে। কিন্তু মেয়েরা বয়ে চলে একটি ধারায়, একমাত্র খাতে। নিজেকে তারা টুকরো টুকরো করে দিতে জানে না। যা দেয়, তা একসঙ্গে, একেবারেই।

"মেয়েটি আমার বান্ধবী।"

এ-ধরনের কথা অনেক শুনেছে অতীশ। হাসি পায়। ইয়োরোপের মেয়েদের কথা ঠিক জানে না। হয়তো একটার পর একটা যুদ্ধে, চারদিকের ঘূর্ণির আঘাতে আঘাতে, তারা প্রেম আর বন্ধুত্বকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পেরেছে। কিন্তু এই দেশে, যেখানে একটুখানি কৌতুকের ছোঁয়ায় মেয়েদের গালে রঙ ধরে, ভারী হয়ে নেমে আসে চোখের পাতা, একটু পরিচয় আর একটু নিঃসঙ্গতার অবকাশ ঘটলে যেখানে গলার স্বর জড়িয়ে আসে, সেখানে—

"মেয়েটি আমার বান্ধবী।"

সেই বন্ধুত্বের পরিণামে বিয়ের সানাই, নইলে রেজিস্ট্রেশন অফিসের এগ্রিমেণ্ট ফর্ম। আর নইলে পরীক্ষায় ফেল করা, মাসখানেক উদাস হয়ে বসে থাকা, নিতান্তই গদ্যসর্বস্বের হাতে কাব্যচর্চার ভয়ঙ্কর প্রয়াস, দিনকয়েক দাড়ি রাখা। একজনকে চটেমটে নোলোক-পরা একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে দেখেছিল, আর একজন বেসুরো বেহালা-বাজিয়ে পাড়ার লোককে ঝালাপালা করে তুলেছিল।

অতীশ হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। একটা ছোট কাঁটা এসে বিঁধছে কোথা থেকে। মন্দিরার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে বেশ হত। ওর কাছে মন খুলে বলা যেত সুপ্রিয়ার কথা। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউকে রেখার ওপারে থামিয়ে রাখা চলে না। অন্তত সে বিশ্বাস অতীশের নেই। হয়তো অন্যে পারে।

কিন্তু সত্যিই কি থামিয়ে রাখা চলে না?

সুপ্রিয়া বলেছিল, "একটা সত্যি কথা বলব ?"

"বলো ?"

"কষ্ট পাবে না ?"

"সেটা তুমিই জানো। কিন্তু কষ্ট যদি সত্যিই পাই, তা হলে বরং না-ই বা বললে। দু-একটা মিথ্যে কথাই না হয় বানিয়ে বলো, শুনে খুশী হতে চেষ্টা করব।"

"ঠাট্টা নয়।" গড়ের মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার বটগাছের দিকে চোখ মেলে দিযে সুপ্রিযা বলেছিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, তা তুমি জানো।"

"এইটেই তোমার সত্যি কথা ? তা হলে আরো অনেকবার করে বলো। আমার যত কষ্টই হোক, আমি প্রত্যেকবারই রীতিমত মন দিযে শুনব।"

"না—তা নয়।" সুপ্রিয়াব চোখ অন্ধকারে ডুবে গিগেছিল, "আমি আর-একজনকেও ভালোবাসি।"

চমক লাগল। তবু হার মানল না অতীশ। বেদনার উপর দিয়ে বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। "রানীর ভাণ্ডারে অনেক আছে, অনেককেই সে দু-হাতে দান করতে পারে।"

"তোমার হিংসে হচ্ছে না ?"

"অত বড মিথ্যে কথা বলি কী করে ? তবু যথাসাধ্য সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করব। আমি যা পেয়েছি তার মধ্যে ফাঁক না থাকলেই হল।"

"ফাঁক তো থেকেই গেল। সম্পূর্ণ তোমায় দিতে পারছি না—অর্ধেক। রাগ করলে তো ?"

অতীশ একটা ঝকঝকে চকচকে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারল না। সুপ্রিযার মনের আধখানা আর-একজন অধিকার করে আছে, সেজন্যে অতীশ একটুও আঘাত পাবে না, মনের এত বড শক্তি তার নেই।

"রাগ করছি না। কিন্তু আমার এই অংশীদারটি কে, তাকে চিনতে পারছি না।"

"চিনতে পারবে না। সে কলকাতায় থাকে না। দুঃখ পেয়ো না অতীশ, তোমাকে সত্যি কথা বলি। আমার কী মনে হয় জানো? আমি আরো—আরো অনেককেই ভালোবাসতে পারি। কাউকে রূপের জন্যে, কাউকে গানের জন্যে, কাউকে বিদ্যার জন্যে। সব ঐশ্বর্য একজনের মধ্যে নেই। আমি সকলের কাছ থেকেই নিতে পারি। পারি না অতীশ?"

অতীশ নিঃশ্বাস ফেলল।

"ঠিক জানি না। তবে ও'নীলের এমনি একটা নাটক পড়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে।"

"যারা বই লেখে তারা তো বানিয়ে লেখে না। একটা সত্যকে জীবন থেকেই আশ্রয় করে।" সুপ্রিয়া বলে চলল, "বড় জোর একটু রঙ বুলিয়ে দেয়, যা ঘটা উচিত তাকে ঘটিয়ে দেয়, যে-সুতোগুলোর জোড় মেলেনি তাদের জুড়ে দেয় একসঙ্গে।"

আজকে যে-কথা ভাবছে, সেই কথাই বলেছিল অতীশ, "কিন্তু ওদের মেয়েরা—"

"হয়তো আলাদা। কিন্তু অতীশ, আমিও বোধ হয় একটু আলাদা। আমার চেনাশোনা কারো সঙ্গে যা আমার মেলে না। তুমি তো জানো, কলেজে পড়বার সময় অনেকের সঙ্গে আমি মিশেছি। তাদের কেউ-কেউ অসভ্যতার চেষ্টা করেছে, কেউ-কেউ করুণ চিঠি লিখেছে, কেউ বলেছে, আমাকে না হলে তার সব কিছু মিথ্যে হয়ে যাবে। যারা নোংরা তাদের কথা বলছি না, কিন্তু বাকী সকলের কথাই আমি ভেবে দেখেছি। একজন আমাকে এক তাড়া ফুল দিয়েছিল, আমি এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছি। কবিতার বই উপহার পেয়েছি, আমার শেল্‌ফে আছে তারা। আমি কাউকে আঘাত দিইনি অতীশ, শুধু সত্যি কথাই বলেছি। বলেছি: আমার এখনো সময় হয়নি।"

"জানি।"

"না-জানার তো কথা নয়।" সুপ্রিয়া হেসেছিল, "কলেজে আমার সুনাম

ছিল না। বলত স্মার্ট। কিন্তু আমি তো কাউকে ঠকাইনি অতীশ। খুঁজেছি। তারপর তুমি এলে। তখনো আমি কাউকে সরাইনি—আপনি সরে গেল সবাই। অথচ ওদের আমি ভুলিনি।"

"সবাইকে ভালোবেসেছ?"

"না—না।" সুপ্রিয়া বলেছিল, "সে-ভয় নেই। ভালো অবশ্য কাউকে কাউকে লেগেছে কিন্তু ভালোবেসেছি মাত্র আর-একজনকে। ছেলেবেলা থেকেই। তবু সম্পূর্ণ নয়—বাকীটুকু ছিল তোমার জন্যে। এখন ভয় করে অতীশ। হয়তো আবার কেউ আসবে। তোমাদের মাঝখানে সে-ও ভাগ বসাবে।"

অতীশ নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছিল এবার। এতক্ষণে যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে। সেটাকে চেপে রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। অতীশ বলেছিল, "হয়তো সে-ই তোমার সম্পূর্ণ মানুষ। সেদিন আমরা দু-জন আর থাকব না।"

"সে হবে না অতীশ। আর-একজনের কথা থাক, কিন্তু তুমি তুমিই। সেখানে আর কেউ নেই, কেউ আসতে পারবে না। তা ছাড়া জীবনে যদি সবচেয়ে বড় দুঃখ কখনো পাই, তা হলে তোমার কাছেই আমাকে ছুটে আসতে হবে। আমি জানি, তুমি সেদিন আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"

বড় রাস্তায় একটা মোটর বার দুই মিসফায়ার করল। অতীশ সজাগ হয়ে উঠল। একটু আগেই সামনে বসে ছিল মন্দিরা। কিন্তু সুপ্রিয়া যা পারে মন্দিরা তা পারে না। অতীশও নয়।

বারান্দায় চটির ক্রুদ্ধ শব্দ। শ্যামলাল ফিরে এল। ধপ করে বই দুটো ফেলল টেবিলের উপর, চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বসে পড়ল সশব্দে।

ক্যালকুলেশনটা এ-বেলা কিছুতেই মিলবে না। অতীশ ডাকল, "শ্যামবাবু?"

শ্যামলাল গম্ভীর গলায় বললে, "বলুন।"

"একটা ভাল টিউশন করবেন? শ-খানেক টাকা দেবে মাসে?"

কৌতূহলী হয়ে শ্যামলাল ফিরে তাকাল।

"কোথায়? কী পড়ে?"

"বি এস-সি। একটি মেয়ে। একটু আগেই যাকে দেখেছেন।"

শ্যামলাল দপ করে নিবে গেল। অতীশের চোখের উপর একটা কর্কশ দৃষ্টি ফেলে আরো গম্ভীর গলায় বললে, "না, ছাত্রী আমি পড়াই না।"

অতীশ বিষণ্ণ হয়ে রইল। রাজী হলে ভালো করত শ্যামলাল। আরো ভালো করত মন্দিরাকে ভালোবাসলে। তবে মন্দিরা শক্ত ঠাঁই—ওর বাবা মল্লিক সাহেব সহজে বশ মানবার পাত্র নন। তবু প্রেমের মধ্য দিয়ে একটা নতুন জগতের সন্ধান পেত শ্যামলাল। কিন্তু সে কথা শ্যামলাল কিছুতেই বুঝবে না।

দুই

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটাকে ছাড়িয়ে একবার হেঁটে চলে গেল কান্তি। পার্কের কোনায় একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এক খিলি পান কিনল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হলদে বাড়িটার দিকে। জানলাগুলোতে নীল পর্দা হাওয়ায় ফেঁপে উঠছে ; কিন্তু একটা পর্দা সরিয়েও সুপ্রিয়া একবারের জন্যে বাইরে চেয়ে দেখল না।

দেশে থাকতে মজুমদার-বাড়িতে যেতে আসতে কোনো অসুবিধে নেই। অবারিত দরজা। একতলায়, দোতলায় তেতলায়। কিন্তু এখানে তা নয়। প্রথমত এ-বাড়ির কেউ তাকে ভালো করে চেনে না—অথচ তার পরিচয়ের অন্ধকার দিকটা গালগল্পের মতো শোনা আছে তাদের। সে গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাই তীক্ষ্ণ কৌতূহলভরা চোখে তাকে লক্ষ্য করবে, তার মুখের মধ্যে খুঁজবে পঁচিশ বছর আগে সময়ের স্রোতে মিলিয়ে যাওয়া বুদ্বুদ শান্তিভূষণকে। একটা নিঃশব্দ কোলাহল যেন সে শুনতে পাবে চারদিকে : "এই নাকি কান্তি? তারাকুমার তর্করত্নের দৌহিত্র? আরে—মনে নেই আমাদের গাঁয়ের হেডপণ্ডিত মশাইকে? হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই সে—যার জামাই ছিল খুনী আসামী। ঈস—কী কপাল ছেলেটার! ওর বাপ যে কে তা-ই ও জানে না।"

পানের দোকানের আয়নার দিকে একবার নিজের মুখের ছায়া দেখল কান্তি। নিজের চেহারা কেমন কান্তি ঠিক বলতে পারে না, তবে লোকে বলে দেখতে সে ভালোই। কিন্তু বাইরের চেহারা যাই হোক, ভিতরে ভিতরে তার অসংখ্য জীবাণু, তিলে তিলে তারা তাকে কেটে কেটে কুরে কুরে খাচ্ছে। যে বিষাক্ত রক্ত থেকে তার জন্ম, তাই আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আনছে তার মৃত্যুকে।

কিছুই দরকার ছিল না কান্তির। তারাকুমার তর্করত্নের বিষয়সম্পত্তি নয়—রূপ নয়, গান নয়, কিছুই নয়। শুধু পরিচয়—বংশধারা। আর ওই

পরিচয়টুকু নেই বলেই কারো কাছে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারে না, জানাতে পারে না নিজের দাবি, কেবল মুখ লুকিয়ে পালিয়ে থাকবার জন্যে একটা অন্ধকার কোণ খুঁজে বেড়ায়।

শুধু সুপ্রিয়া আশা দিয়েছে। শুধু সুপ্রিয়াই বলেছে, "আর কেউ তোমার না থাক, আমি আছি।"

কান্তি আবার ঘুরে হলদে বাড়িটার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। জানলার নীল পর্দাগুলো হাওয়ায় পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। অথচ পর্দা সরিয়ে কেউ একবার বাইরে তাকিয়ে দেখছে না। কেউ না।

পার্কের ভিতরে কয়েকটা নোংরা ছেলে মার্বেল খেলছে। ওদেরও একটা পরিচয় আছে নিশ্চয়।

"তোর বাপের নাম কী?"

অত্যন্ত সহজে স্পষ্ট গলায় বলতে পারবে, "কালু মেথর।"

আর কান্তি? কান্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়? সেদিন অন্ধকার গঙ্গার ধারে, কেউটের ফোকরভরা গঙ্গাযাত্রীদের সেই ঘরটার কাছে, বটগাছের অন্ধকার ছায়ার তলায় কেউ কোথাও ছিল না। অনায়াসে মুছে যেত। কেউ বাধা দিতে পারত না।

একটা মোটরের হর্ন। কান্তি চমকে ফিরে তাকাল। একখানা কালো রঙের গাড়ি। হলদে বাড়িটার সামনে গিয়েই সেখানা দাঁড়াল। সাদা আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি পরা, নাগরা পায়ে এক ভদ্রলোক বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক এই পার্কেই, কান্তি ভাবল।

রেবা এসে খবর দিলে, দীপেনবাবু এসেছেন।

একবারের জন্যে রক্ত দোল খেয়ে উঠল সুপ্রিয়ায়, মুহূর্তের দ্বিধা জাগল মনে। তারপরে সহজ গলায় বললে, "চল্—যাচ্ছি।"

রেবা হেসে বললে, "ভদ্রলোক বাবার পাল্লায় পড়েছেন। দুজন মক্কেল

ছিল, তাদের বিদায় করে দিয়ে বাবা চেপে ধরেছেন দীপেনবাবুকে। এক্ষুনি সঙ্গীতরত্নাকর নিয়ে পড়বেন। তুই চল্—বিপন্নকে উদ্ধার করবি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রেবা বললে, "তুই কিন্তু ওঁকে আমাদের এখানে গানের কথা বলিস মনে করে।"

"কেন—তুইও তো বলতে পারিস।"

"না ভাই, আমার ভারী লজ্জা করবে।"

রেবা আন্দাজে ভুল করেনি। অমিয়বাবু সত্যিই তুমুলভাবে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন।

"বাংলা দেশ থেকে গান প্রায় উঠে গেল মশাই। সত্যিকারের গাইয়ে আঙুলে গোনা যায়। ছিল বিষ্ণুপুর—তা-ও যাবার দশা। এখন আধুনিক গানের পালা। গান গাইছে না ছড়া কাটছে বোঝাই মুশকিল।"

দীপেন ভদ্রতা করে বললে, "হিন্দীরও ওই দশা। সিনেমার গানের উৎপাতে আর কান পাতা যায় না।"

অমিয়বাবু আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, "আধুনিক গান, সিনেমার গান, সব এক। বাংলা গানের আমি একটা ফর্মুলা আবিষ্কার করে ফেলেছি —জানেন? এক ছড়া মালা নিয়েই যা কিছু গণ্ডগোল। হয় দিয়েছিলে, নইলে দাওনি। হয় আকাশে চাঁদ ছিল, নইলে ছিল না। বালুচরে ঘর বাঁধা হয়েছিল, সেটা ঝড়ে উড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একটা সমাধির ব্যাপার, তাতে খানিক ফুল ছড়িয়ে দিলেই আপদ মিটে গেল।"

দীপেন শব্দ করে হেসে উঠল।

"তা হলে আধুনিক গান আপনি মন দিয়ে শোনেন দেখা যাচ্ছে। অনেকদিন ধরে চর্চা না করলে তো এমন ফর্মুলা আবিষ্কার করা যায় না!"

সুপ্রিয়াকে নিয়ে রেবা ঘরে ঢুকল।

দীপেন চোখের দৃষ্টিটা সম্পূর্ণ বুলিয়ে নিলে সুপ্রিয়ার উপরে।

"এই যে সুপ্রিয়া—অনেক বড় হয়ে গেছ দেখছি।"

সুপ্রিয়া হাসল, "বড় হওয়ার তো কথাই। পাঁচ-ছ বছর পরে দেখছেন যে। কিন্তু আপনি ভালো আছেন তো?

দীপেনের লালচে চোখ দুটো জ্বলে উঠল একবারের জন্যে।

"হ্যাঁ—ভালো আছি বইকি। যতদিন গলায় গান থাকবে, ততদিন খারাপ থাকবার কোনো কারণ নেই।"

"ঠিক বলেছেন।" অমিয়বাবু মাথা নাডলেন, "গানই তো গায়কের অস্তিত্ব।"

দীপেনের প্রায় মুখোমুখি বসে সুপ্রিয়া দেখতে লাগল। এই ক বছরে সত্যিই বয়েস বেড়েছে দীপেনের। কপালে কতগুলো রেখা পড়েছে, কালির গাঢ় দাগ ধরেছে চোখের কোনায়, কানের দু পাশে কয়েকটা রুপালী চুল চিকমিক করে উঠছে।

অমিয়বাবু বললেন, "রেবা, একটু চা—"

দীপেন হাত জোড় করল, 'মাপ করবেন। চা আমি বেশী খাই না। সকালে দু পেয়ালা হয়েছে—আর চলবে না।"

"একটু মিষ্টি—"

"না—না—কিছু—না।"

অমিয়বাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "একেবারে শুধু মুখে—"

"শুধু মুখে কেন? একটা পান খাওয়ান—তা হলেই হবে।"

রেবা ছুটে ভিতরে চলে গেল। সুপ্রিয়া দেখতে লাগল দীপেনকে। দীপেনের বয়েস কত হবে এখন—চল্লিশ? কিন্তু তার চাইতেও যেন অনেক বুড়িয়ে গেছে চেহারা। শুধু রগের পাকা চুলেই নয়, সমস্ত মুখে ক্লান্তির ছায়া নেমেছে। তবে চোখদুটো তেমনিভাবে ঝকঝক করছে এখনো। আরো অশান্ত, আরো উগ্র।

দীপেন বললে, "এখনো গানের চর্চা চলছে তো সুপ্রিয়া?"

জবাব অমিয়বাবুই দিলেন, "চলছে বইকি। সঙ্গীত-সরস্বতীকে ওই তো ধরে রেখেছে এ-বাড়িতে। গান শিখছে ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছে।"

"দুর্গাশঙ্কর ?" দীপেন মাথা নাড়ল, "হুঁ—গুণী লোক। তবে কিছু করতে পারলেন না। আজকাল ও-ভাবে ঘরে বসে থাকলে কিছু হয় না। চিনতে চায় না কেউ।"

"কিন্তু সাধনা তো নীরবেই করা ভালো দীপেনদা।"

দীপেন শুকনো হাসি হাসল, "ওটা কপি-বুকের থিয়োরি। আজকালকার সাধুদের দেখতে পাও না ? তপস্যা তাঁরা কোথায় করেন কে জানে, কিন্তু শহরে তাঁদের বড় বড় আশ্রম আছে, আর আছে দলে দলে শিষ্য শিষ্যা। প্রভুর মহিমাকে তারা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তারস্বরে প্রচার করতে থাকে।"

রেবা একটা ছোট রুপোর প্লেটে করে পান নিয়ে এল। তারপর মুখ নামাল সুপ্রিয়ার কানের কাছে।

সুপ্রিয়া হাসল। বললে, "দীপেনদা, আমাদের রেবার একটা অনুরোধ আছে।"

"বেশ তো—বলো।"

"আজ সন্ধ্যেবেলায় আপনার কি কোনো বিশেষ কাজ আছে ?"

"না, তেমন কিছু নেই। কনফারেন্স কাল থেকে শুরু।"

"তাহলে আসুন এখানে। রেবা আপনাকে রান্না করে খাওয়াবে।"

পেছন থেকে রেবা একটা চিমটি কাটল।

দীপেন বললে, "সে তো ভালো প্রস্তাব। চমৎকার কথা।"

অমিয়বাবু অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠলেন। "কথাটা আমিই বলতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ঠিক ভরসা হচ্ছিল না। রেবাই আমার কাজটা করে দিয়েছে। সত্যিই তাহলে আসছেন আপনি ? ভারী খুশী হব।"

সুপ্রিয়া বললে, "কিন্তু একটা শর্ত আছে। গান শোনাতে হবে।"

"আচ্ছা—তা-ও গাইব। তুমি ?"

"আপনার আসরে গান গাইব এমন স্পর্ধা নেই। তবে রেবা সেতার শোনাবে এখন।"

"উনি বুঝি সেতার বাজান ? বাঃ, চমৎকার।"

রেবা পালিয়ে গেল ঘর থেকে। অমিয়বাবু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "না, না,—সে কিছু নয়। এমন কিছু বাজাতে পারে না এখনো, সবে শিখছে।"

"শিখছি আমরা সকলেই—" কথাটাকে দার্শনিকভাবে ঘুরিয়ে নিলে দীপেন, "এ-জিনিস শেখার কোনো শেষ নেই। সারাজীবন চর্চা করেও এর কিছুই পাওয়া যায় না।" পানের সঙ্গে খানিকটা জর্দা তুলে নিয়ে দীপেন বললে, "কিন্তু আমি এখন উঠব অমিয়বাবু। সুপ্রিয়াকেও একটু সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। ঘণ্টা দেড়েক বাদে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

"বেশ তো, বেশ তো।" সহজভাবে কথাটা বলেও অমিয়বাবু দ্বিধাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সুপ্রিয়ার দিকে তাকালেন, "কিন্তু স্কুল নেই তোমার?"

সুপ্রিয়া বলতে যাচ্ছিল 'আছে', কিন্তু সত্যি কথাই বেরিয়ে এল মুখ থেকে, "না, আজকে ফাউনডেশন ডে। ছুটি আছে।"

দীপেনের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল: "ভেরি গুড। একটু চলো আমার সঙ্গে। কয়েকটা কেনাকাটা আছে—সাহায্য করবে।" মনের ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে গেল সুপ্রিয়া। কিন্তু দীপেনের এই সহজ ভঙ্গিটার সামনে কিছুতেই 'না' বলতে পারল না। শুধু বিপন্নভাবে বললে, "আমি কেনাকাটায় কী সাহায্য করব আপনাকে?"

"তুমিই পারবে। মেয়েদের পছন্দ ভালো। চলো।"

যেন একটা অনিবার্য কঠিন আকর্ষণে সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। মনের মধ্যে একরাশ প্রতিবাদ নিয়েও মুখে ফুটিয়ে তুলল হাসির রেখা।

"আচ্ছা—চলুন।"

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো দীপেন।

"এখন দশটা। ঠিক সাড়ে এগারটায় পৌঁছে দেব তোমাকে?"

"আর সন্ধ্যেবেলার ব্যাপারটা?" অমিয়বাবু ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন।

"সাতটায় আসব। আচ্ছা, আপাতত চলি তা হলে, নমস্কার। এসো সুপ্রিয়া।"

কান্তি বসে ছিল পার্কের ভিতরে। এক চোখ ছিল ছেলেদের মার্বেল খেলার উপর, আর এক চোখ ছিল হলদে বাড়িটার দিকে। এমন সময় আবার সেই কালো মোটরটার গর্জন শোনা গেল।

কান্তি দেখল, সেই গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা ভদ্রলোকের ঠিক পাশে বসেছে সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়াই। আরো ভালো করে দেখবার আগেই গাড়িটা দ্রুত বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে।

পিছনের সীটেই বসতে চেয়েছিল সুপ্রিয়া।

দীপেন বললে, "না, না, পাশে। গল্প করতে করতে যাব।"

আশ্চর্য সহজ ভঙ্গি দীপেনের, আর সহজ হওয়াটাই তার শক্তি। সুপ্রিয়া আপত্তি করতে পারল না। মিনিট দেড়েক চুপচাপ। বাঁক নিয়ে গাড়ি আশু মুখুজ্যে রোডে এসে পড়ল।

"কোথায় যাবেন ?"

"নিউ মার্কেট।" দীপেন মুখ ফেরাল, "জানো তো—কলকাতার পথঘাট আমার ভালো করে চেনা নেই। যাঁর গাড়ি তিনি সোফার দিতে চেয়েছিলেন সঙ্গে। কিন্তু আমার আত্মমর্যাদায় বাধল। ভাবলাম, গাইড যদি নিতেই হয়, তোমাকেই সঙ্গে করে নেব।"

খুব সহজ কথাটা। কিন্তু অস্বস্তি লাগল সুপ্রিয়ার। পাঁচ বছর আগেকার সেই দুপুরটাকে আবার মনে পড়ে যাচ্ছে। না বেরুলেই হত দীপেনের সঙ্গে। যে কোনো একটা ছুতো করে এড়িয়ে যাওয়া চলত।

দীপেন বলল, "কলকাতায় আসবার আগে তোমার মাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তাঁর কাছেই পেলাম তোমার ঠিকানা।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"কিন্তু আমার একটা চিঠিরও তুমি জবাব দাওনি।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। বলবার কিছু নেই।

গাড়ি এগিয়ে চলছিল চৌরঙ্গির দিকে। লাল আলোর সংকেতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দীপেন আস্তে আস্তে বললে, "আমি জানি। এড়াতে চেয়েছিলে আমাকে। ভেবেছিলে সেদিনের জের আর টানতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিশ্বাস করো সুপ্রিয়া এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমি তোমাকে ভুলতে পারিনি। একদিনের জন্যেও না।"

সুপ্রিয়া অবিশ্বাস করল না। সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটি আর নেই। এই পাঁচ বছরে জীবনকে অনেকখানি দেখেছে, অনেকখানি চিনেছে সে। বহু মানুষের মুখ থেকে শুনেছে, "তোমাকে ভুলব না—কোনোদিন ভুলব না।" প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত না, কিন্তু ভারী ক্লান্তি বোধ হয় আজকাল, এত অসংখ্য মানুষ তাকে মনে রাখে, মনে রাখবে। কিন্তু সুপ্রিয়া কজনকে মনে রাখতে পারবে?

দীপেন বললে, "জানো তো, আমি গান গেয়ে বেড়াই। আর আমরা হচ্ছি সেই আগুন, যারা খুব সহজেই পতঙ্গের দলকে টেনে আনতে পারে। আমিও অনেক দেখেছি। আমার গান শুনে কতজনের চোখ গভীর হয়ে এসেছে, কতজনকে গান শেখাতে চেয়েছি, কিন্তু তারা গান যতটা শিখেছে তার চাইতেও অনেক বেশী করে তাকিয়ে থেকেছে আমার মুখের দিকে। কেউ কেউ পোড়েনি এমন মিথ্যে কথাও বলতে পারি না। কিন্তু এমন একজন কাউকে পেলাম না, যার কাছে আমি নিজে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারি।"

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। প্রথম শীতের উজ্জ্বল সোনালী রোদ জ্বলছে পথের উপর। গড়ের মাঠের ঘন ঘাস এখনো ভালো করে শুকোয়নি, এখনো তারা শিশিরে কোমল হয়ে আছে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করল, "বৌদি কেমন আছেন দীপেনদা?"

দীপেনের মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল। উইণ্ডস্ক্রীনের উপর থেকে

হঠাৎ যেন খানিকটা রোদ ঠিকরে ওর চোখের উপরে এসে পড়ল। দীপেন বললে, "ভালো।"

"তাঁকে কেন সঙ্গে করে আনলেন না কলকাতায়?"

"এমনি। দরকার বোধ হয়নি।"

"আপনি কিন্তু ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন দীপেনদা!" সুপ্রিয়া মৃদু গলায় বললে। অনেকক্ষণ ধরেই তার মনে হয়েছিল, এমনি কোন একটা আঘাত করা উচিত দীপেনকে, তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত।

সামনের দুখানা গাড়িকে ওভারটেক করে তীরবেগে বেরিয়ে গেল দীপেন। একজন সাইকেলযাত্রী একটুর জন্যে চাপা পড়ল না।

"এ কী করছেন? সাবধান হয়ে চালান।" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুপ্রিয়া।

"সাবধান জীবনে কখনো হইনি। আজও হবার দরকার দেখি না।" দীপেন নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরল।

সুপ্রিয়া ক্লান্ত গলায় বললে, "অ্যাকসিডেণ্ট্ করে রোম্যাণ্টিক হতে হয়তো আপনার ভালো লাগে, কিন্তু আমার ঠিক ওটা ধাতে সয় না। আর একটু চোখ রেখে ড্রাইভ করুন।"

দীপেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করল, "অলরাইট—আই অ্যাম সরি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটা আলোচনাকে বাঁধ ভেঙে খানিকটা এগিয়ে দিয়েছিল দীপেন, কিন্তু সুপ্রিয়া যেন তার উপরে একটা পাথরের বাধা এনে ফেলেছে। গাড়ির চাকার তলায় উজ্জ্বল সোনালী রোদে ভরা পথটা পিছলে পিছলে সরে যেতে লাগল। সুপ্রিয়া দেখতে পেল, শুধু কানের পাশেই নয়, দীপেনের সারা মাথাতেই ধূসরতার ছায়া নেমে এসেছে।

আরো খানিক পরে দীপেন বললে, "ডান দিকেই তো মার্কেট?"

"হাঁ—এইটেই লিণ্ডসে স্ট্রীট।"

কেনাকাটার বিশেষ কিছু ছিল না। একজোড়া মোজা, দুটো গেঞ্জি, খান দুই সাবান। তারপরে কিছু ফুল।

"তোমাকে দিলাম ফুলগুলো।"

"আচ্ছা দিন।"

ঘড়ি দেখে দীপেন বললে, "আরো কিছু সময় আছে হাতে। চলো, চা খাই কোথাও।"

"একটু আগেই যে বললেন চা আর খাবেন না এ-বেলা ?"

"খাওয়ার জন্যে নয়। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করব।"

"বেশ, চলুন।"

একটা নিরালা চায়ের দোকানে ঢুকল দুজন।

"কী খাবে ?"

সুপ্রিয়া বললে, "কিছু না। আপনার ইচ্ছে হলে খান।"

দীপেন ম্লানভাবে হাসল, "আমার খাওয়ার পথে কিছু বাধা আছে। জানো তো, খুব সংযত হয়ে চলিনি এতদিন। লিভারের অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়।"

বয় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। দীপেন বললে, "একটা চা, একটা অরেঞ্জ-স্কোয়াশ।"

বয় চলে গেলে সুপ্রিয়া বললে, "খুব বেশী ড্রিংক করেন নাকি আজকাল ?"

"রোজ নয়। তবে মধ্যে মধ্যে এক-এক দিন। হঠাৎ মনে হয় সংসারে আমি একা, একেবারে নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে কোথাও আমার কেউ নেই, কেউ আমার দুঃখ বুঝবে না। তেমনি এক-একটা দিনে হয়তো মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলি।"

"কিন্তু এ-দুঃখ কেন আপনার ? সবই তো আপনি পেয়েছেন। টাকা, সম্মান, যা-কিছু মানুষে চায় কিছুরই তো অভাব নেই আপনার।"

"শুধু একটা জিনিসই পাইনি সুপ্রিয়া। ভালোবাসা।"

"কেন পাননি ? ভালোবেসেই বৌদিকে আপনি বিয়ে করেছিলেন।"

"ভুল করেছিলাম সুপ্রিয়া। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যাকে আমি চেয়েছিলাম এ সে নয়। যে আমার গানের ইন্‌সপিরেশন, যে আমার সুর, আমার স্বপ্ন যাকে নিয়ে গড়ে উঠবে—তাকে আমি পাইনি।"

"কে সে ?" মৃদু হাসি দেখা দিল স্থপ্রিয়ার ঠোঁটের কোণে: "আমি ?"

"তুমি কি তা বিশ্বাস করো না ?"

বয় চা আর অরেঞ্জ-স্কোয়াশ নিয়ে এল, একটা অপ্রীতিকর উত্তর দেবার দায়িত্ব থেকে অন্তত এই মুহূর্তে মুক্তি পেল স্থপ্রিয়া। বয় চলে যাওয়ার পরে চায়ের পেয়ালাটা সামনে নিয়ে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। এই ধরনের ভাববিলাসীদের দেখতে দেখতে তার বিরক্তি ধরে গেছে। কেউ একটা নতুন কিছু বলুক, আরও গভীর কোনো বেদনা, মানুষের মর্মচারী আরো কোনো একটা আশ্চর্য যন্ত্রণাকে আবিষ্কার করুক কেউ, সেই নিবিড় নিঃশব্দসঞ্চারী ব্যথা স্তরে স্তরে অসংখ্য প্রদীপের দীপান্বিতা জ্বালিয়ে দিক, তার আলো আকাশের তারার সঙ্গে মিশে গিয়ে দূরতম দিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়ে যাক। কিন্তু এ-ও যেন বাঁধা ছকে চলছে। সেই মদের গ্লাসের আগুন ঢেলে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষে দাহন করা, দিনের পর দিন একটু একটু করে আত্মহত্যার বিলাসিতা, স্বপ্ন-সাকীর জন্যে কান্নার আত্মরতি। সব পুরোনো, সব একঘেয়ে হয়ে গেছে।

"চিত দহে বিন্ন সেঁইয়া—"

জীবনের অর্ধেক বেদনাই তো কৃত্রিম। তাদের অস্তিত্ব কোথাও নেই, মানুষ তাদের সৃষ্টি করে নেয়। যে-যন্ত্রণার অনুভূতি নেই তাকে প্রাণপণে অনুভব করবার চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত সত্য করে তোলে। নিউরোসিস। জীবনের আধখানাই নিউরোসিস। গ্লাস থেকে স্ট্রটা তুলে নিয়ে অন্যমনস্ক-ভাবে সেটাকে ভাঁজ করছিল দীপেন। তারপর বললে, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে স্থপ্রিয়া ?"

পাঁচ বছরের অনেক পোড়খাওয়া, অনেক রোদবৃষ্টির মধ্যে পথচলা স্থপ্রিয়া আজকে আর এতটুকুও দোল খেল না। সোজা চোখ মেলে ধরল দীপেনের দিকে। নিঃসঙ্কুচিত স্পষ্টতায়।

"আমাকে বিয়ে করতে চান ?"

দীপেন থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে।

"না, তা বলছি না। এমনি চলো। তুমি সঙ্গে থাকলেই আমি খুশী হব।"

"কোথায় যাব?"

"বম্বে।"

"কি করব গিযে?"

"আমি ভাবছি, বম্বেতে গিযে গানের স্কুল করব-একটা। দু-একটা সিনেমা কোম্পানিও ডাকাডাকি করছে, সেখানেও কাজ করব। তোমার সাহায্য চাই।" একবারের জন্যে থামল দীপেন:

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে সুপ্রিয়া?"

"আমি কী সাহায্য করব? আমি কতটুকু জানি গানের?"

"তুমি শিখবে। আমি শেখাব। তা ছাড়া বড বড ওস্তাদ আছেন ওখানে, গুরু চাও তো তাঁদের পাবে। যদি নিজেকে গড়ে তুলতে চাও, যদি সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে চেনাতে চাও নিজেকে, দেশময ছড়িয়ে দিতে চাও তোমার গানের সুর, তা হলে ওই তো তোমার জাযগা সুপ্রিয়া। কলকাতায বসে দুর্গাশঙ্করের কাছ থেকে হযতো তুমি কিছু পাবে। কিন্তু তোমার গুরুর মতোই তুমি তলিয়ে থাকবে অন্ধকারে। কেউ চিনবে না, কেউ জানবে না।"

সুপ্রিযার বুকে এক ঝলক রক্ত আছড়ে পড়ল। বোম্বাই। তাই বটে—বড বড গুণীর জাযগা সেখানে। যত নিতে চাও—অঞ্জলি ভরে নিযে যাও। ঠিক কথা। নিজেকে চেনাতে হলে কলকাতার এই গণ্ডিটুকুর মধ্যেই তো পড়ে থাকলে চলবে না, আরো বড জগতের মধ্যে পা বাড়াতে হবে, আরো বড জীবনের মুখোমুখি হতে হবে।

গলার স্বরে স্বপ্নের রেশ মিলিয়ে দীপেন বলতে লাগল "বোম্বাই আছে, বরোদা আছে, পুনা আছে। সময করে বেরিয়ে পড়ো—একটু এগিয়ে গেলেই দক্ষিণ ভারত। কর্ণাটকী সঙ্গীতের দেশ। হাজার বছর আগেকার মতো আজও মৃদঙ্গের তালে তালে বিশুদ্ধ রাগরাগিণী মূর্তি ধরে সেখানে। যাবে সুপ্রিয়া—যাবে আমার সঙ্গে?"

আশ্চর্য, সুপ্রিয়ার মনের কথা, তার রাত-জাগা কল্পনার কথা, তার এতদিনের আশা-স্বপ্নের এত খবর কোথা থেকে জানল দীপেন? এ যেন তারই স্বগতোক্তিগুলো দীপেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

"কিন্তু—", চায়ের পেয়ালা ঠোঁটে তুলেছিল সুপ্রিয়া, চুমুক না দিয়েই নামিয়ে রাখল।

"আমাকে ভয় কোরো না।" দীপেনের চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল, "যা আমি কিছুতেই পাব না, তার জন্যে কোন অন্যায় দাবি তুলব না তোমার কাছে। শুধু তুমি বড় হও, সার্থক হয়ে ওঠো। এর বেশী আমি আর কিছুই চাই না।"

"কিন্তু, আমি বড় হলে আপনার কী লাভ?"

"তোমাকে ভালোবাসি, সেইটুকুই লাভ। যাবে সুপ্রিয়া? আমি কিন্তু আসছে মাসেই বেরুচ্ছি। বোম্বাই, বরোদা, পুনা, মহীশূর, তাঞ্জোর—"

উগ্র একটা ভয়ঙ্কর নেশা সাপের মতো জড়িয়ে ধরছে সুপ্রিয়াকে। আরব সমুদ্র ডাক দিচ্ছে, ডাক পাঠাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের নারিকেল-বীথির দূরমর্মর। আর মাত্র পাঁচ মিনিট। আরো পাঁচ মিনিট এমনভাবে লোভানি দিতে থাকলে সুপ্রিয়া আর ধরে রাখতে পারবে না নিজেকে। বলবে, "চলুন—এখুনি চলুন। আমি তৈরি হয়েই আছি।"

কিন্তু সে পাঁচ মিনিট আর সময় দিল না সুপ্রিয়া। খানিকটা গরম চা গিলে ফেলল প্রাণপণে। কপালে একরাশ ঘাম জমে উঠেছিল, শাড়ির আঁচলে সেটা মুছে ফেলে বললে, "এবারে ওঠা যাক দীপেনদা। একটু কাজ আছে আমার, সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম এতক্ষণ।"

তিন

কান্তি একটা ট্রামে চেপে বসল।

কাল রাত্রেও তার কলকাতায় আসবার কোন কল্পনা ছিল না। কিন্তু কী যে হয় এক-একদিন, কিছুতেই ঘুমতে পারল না। খোলা জানলা দিয়ে মজুমদার-বাড়ির তেতলাটা আবছায়া অন্ধকারে চোখে পড়তে লাগল বার বার। খালি মনে হতে লাগল, অনেকদিন সে সুপ্রিয়াকে দেখেনি। অন্তত দূর থেকেও একবার তাকে দেখতে না পেলে কিছুতেই থাকতে পারবে না কান্তি, কোন কাজে মন বসাতে পারবে না।

বিনিদ্র রাতের পরে আরো অসহ্য লাগতে লাগল সকালটা, একটা আগুনের চাকা ঘুরতে লাগল মাথার ভিতরে। একবার কলকাতায় যেতেই হবে তাকে। কিন্তু কী বলা যাবে মা-কে ?

এমন সময় কাগজে মিউজিক্যাল কনফারেন্সের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। উপলক্ষ পাওয়া গেল একটা।

"মা, কাল থেকে মিউজিক কন্‌ফারেন্স আছে কলকাতায়। আমি যাচ্ছি আজ। দিন তিনেক থাকব ওখানে।"

মা তরকারি কুটছিলেন। চোখ তুলে বললেন, "কনফারেন্স তো কাল। আজই যাবি কেন ?"

"নইলে টিকেট পাব না।"

ঘটনা নতুন নয়। গত বছরও গিয়েছিল কান্তি। মা বাধা দিলেন না। ছোট একটি সুটকেশ আর ছোট বিছানা নিয়ে কান্তি হ্যারিসন রোডের একটা বোর্ডিংয়ে এসে উঠল। তারপর সেখান থেকে হরিশ মুখার্জি রোড। আধঘণ্টা ধরে বাড়ির সামনে পায়চারি করে বেড়াল। তবু হলদে বাড়িটার জানালাগুলো থেকে হাওয়ায় কাঁপা একটা নীলপর্দা সরল না একবারের জন্যেও, একবারের জন্যেও বেরিয়ে এল না সুপ্রিয়ার মুখ।

"কান্তিদা—তুমি এখানে? বাইরে ঘুরছ কেন? এস, এস—"

সুপ্রিয়া ডাকল না। একটা কালো মোটর বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা কে আর-একজন নিয়ে গেল সুপ্রিয়াকে। সুপ্রিয়া তাকে দেখতে পেল না।

অনেক বড় কলকাতা। অনেক মানুষ, অনেক পথ। সেই মানুষের ঢেউ কান্তির কাছ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়েছে সুপ্রিয়াকে। এখানে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অসীম কুণ্ঠা আর দ্বিধা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, চোখের সামনে কালো মোটরটা বেরিয়ে যায় নিষ্ঠুর উপেক্ষায়। এ গ্রামের মজুমদার-বাড়ি নয় যেখানে ছোট্ট একটুখানি বাগানের পথ পেরিয়েই পৌঁছে যাওয়া চলে, সোজা উঠে যাওয়া যায় সুপ্রিয়ার ঘরে: "কী পড়ছ অত? আর দরকার নেই ওসব, এসো একটু গল্প করি।"

অনেক দূরে সুপ্রিয়া। অনেক মানুষের ঢেউ দুজনের মাঝখানে।

কিন্তু কান্তি তো আশা ছাড়তে পারে না। সুপ্রিয়াকে ছাড়া তার কিছুতেই চলবে না। তার কাছ থেকে পাওয়া ওই আশ্বাসটুকুর জোরেই তো এতদিন বেঁচে থেকেছে কান্তি—এমনভাবে অক্লান্ত চেষ্টায় তবলার তপস্যা করছে।

"আমি গান গাইব, তুমি না হলে সে গানের সঙ্গে সঙ্গত করবে কে?"

ট্রাম এগিয়ে চলল। জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে রইল কান্তি। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আছড়ে পড়তে লাগল চোখে-মুখে। শুধু সঙ্গী? শুধু সান্ত্বনা?

কান্তি অনেক ভেবে দেখেছে। না, শুধু ওইটুকুতেই তার চলবে না। এই বিশাল কলকাতা। এত মানুষ, এত পথ, কালো রঙের মোটরটা। আর অপেক্ষা করা চলে না। আজকে তার কথা সুপ্রিয়াকে বলতেই হবে স্পষ্ট করে।

আজকেই। সন্ধ্যায় আবার চেষ্টা করবে কান্তি। সুপ্রিয়া তাকে আশা দিয়েছিল। সেই জোরেই দাঁড়াতে হবে কান্তিকে। না—আর দেরি করা চলবে না।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় গিয়েও কান্তি ঢুকতে সাহস পেল না।

একটা জোরালো আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে হলদে বাড়িটার সামনে। আরো সাত-আটখানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কালো মোটরখানাও আছে কিনা কান্তি বুঝতে পারল না।

পার্কের মধ্যেও একদল লোক দাঁড়িয়ে। তাদের দৃষ্টিও বাড়িটার দিকেই।

বুকের মধ্যে একবার ধ্বক করে উঠল কান্তির। একটা কোন সমারোহ চলেছে ওখানে। কিন্তু উপলক্ষটা কিসের? কারো বিয়ে? সুপ্রিয়ার?

কান্তি ঢুকতে পারল না। সেই একদল লোকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

"কী হচ্ছে মশাই ও-বাড়িতে?"

"গান হচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের দীপেন বোস গাইছে।"

"আঃ চুপ করুন, শুনতে দিন।"

লক্ষ্ণৌয়ের দীপেন বোস। নামটা শুনেছে বইকি কান্তি। সুপ্রিয়ার মুখেও শুনেছে। গান শুনেছে গ্রামোফোন রেকর্ডে।

কান্তি গিয়ে বসতে পারত গানের আসরে। অমিয় মজুমদারের বাড়িতে কেউ তাকে বাধা দিত না। অন্তত সুপ্রিয়া ছিল ওখানে। তবু বাইরে রবাহূতের মতোই দাঁড়িয়ে রইল সে। সাত-আটখানা মোটর সামনে রইল প্রাচীরের মতো, ভিতর থেকে গানের সুর লহরে লহরে এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দীপেন বোস খেয়াল গাইছিল।

চার

ঠিক সাড়ে আটটার সময় আজো অতীশ সেই বকুল-গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

নকল জ্যোৎস্নাঝরানো আলোর সারি। বকুলের পাতা কাঁপিয়ে হাওয়া চলেছে। অতীশ একটা সিগারেট ধরাল। সুপ্রিয়ার আসবার সময় হয়েছে।

রাস্তার ওপরে দুর্গাশঙ্করের ঘরে আলো জ্বলছে। বন্ধ-করা জানলার ফিকে লাল কাচের মধ্য দিয়ে অপরূপ দেখাচ্ছে আলোর রঙ।

দুর্গাশঙ্করের দু-তিনজন ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে চলে গেল একে-একে। রাস্তার ওপাশ থেকে অতীশ দেখতে লাগল। ওদের সে চেনে, আজ তিনমাস ধরে দেখছে নিয়মিত। কিন্তু সুপ্রিয়া কোথায় ?

প্রতীক্ষা ক্রমে অধৈর্যে পরিণত হতে লাগল। আর-একটা সিগারেট শেষ করলে অতীশ, আরো একটা। এখনো আসছে না কেন সুপ্রিয়া, কেন দেরী করছে এত ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করছে। একটা হতাশ ক্লান্তি একটু একটু করে ছেয়ে ফেলছে মনকে। সুপ্রিয়া কি আজকে গান শিখতে আসেনি ? ওর কি অসুখ করেছে ?

কেমন ফিকে, কেমন বিস্বাদ মনে হতে লাগল সব। আশা নেই, তবু দাঁড়িয়ে রইল অতীশ। সামনে দিয়ে মোটর আসাযাওয়া করতে লাগল, অতীশ গুনে দেখল বত্রিশখানা। মোট সাতখানা ডবল-ডেকার গেল, দুখানা লরি। তবু সুপ্রিয়া এল না।

তারপর ফিকে লাল কাচের ওপরে সেই অপরূপ আলোটা দপ করে নিবে গেল।

পাথরের মত ভারী পা নিয়ে ট্রাম-লাইনের দিকে এগোল অতীশ। সারাটা

দিন। অজস্র কাজ—ল্যাবরেটরি, ক্যালকুলেশন। তাদের ভিতরে এই সময়টুকু যেন একটা আবহসঙ্গীতের মত বাজতে থাকে। শুধু কয়েক মিনিটের জন্য সুপ্রিয়াকে কাছে পাওয়া—কয়েকটা কথা, ট্রামে তুলে দেওয়া—তারপর তার কথাই ভাবতে ভাবতে কাঁকুলিয়া রোডের মেসে ফিরে আসা।

অতীশ জানে এর কোনো পরিণাম নেই। সুপ্রিয়া একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে। ভুলে যেতেও দেরি হবে না। ভদ্রতা করে বলেছে, 'জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখের সময় তোমার কাছেই চলে আসব'। কিন্তু অতীশ জানে, সে-প্রয়োজন কোনদিনই ঘটবে না সুপ্রিয়ার। নিজেকে সে এতটুকু গোপন করেনি ; তার মন অন্য মেয়েদের মতো নয় ; অনেককে ভালবাসতে পারে সে। তার অনেক আছে। দু হাতে সে যতই দান করে যাক, তার ঐশ্বর্য কোনোদিন ফুরোবার নয়।

অতীশও তাদের মধ্যে একজন। কদিন মনে থাকবে—কতক্ষণ ?

তবু এমনি করে আসা, এই বকুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। সারাদিনের পর এইটুকুই পাওয়া, সারাটা রাত্রির জন্যে এইটুকুই স্বপ্নের সঞ্চয়। কতদিন এ-ভাবে চলবে অতীশ জানে না, কবে বিশাল ভারতবর্ষের সঙ্গীতের তীর্থে তীর্থে সুপ্রিয়ার ডাক আসবে তাও জানে না। কিন্তু যতদিন সে-সময় না আসে, ততদিন এই মুহূর্তটিই সত্য থাকুক। তারপর—

ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে অতীশ তিক্তভাবে চিন্তা করতে লাগল, একবার গেলেও হত মন্দিরার ওখানে। কিন্তু এখন আর সময় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ক্লান্ত পা নিয়ে অতীশ মেসে ফিরে এল।

যথানিয়মে প্রকাণ্ড মোটা একটা বইয়ের মধ্যে তলিয়ে ছিল শ্যামমাল। ওকে দেখে মুখ তুলল।

"কালকের সেই মেয়েটি দু-বার এসে আপনাকে খুঁজে গেছেন।"

তার মানে, মন্দিরা এসেছিল। এখনো কি একবার যাওয়া যায় ওদের

বাড়িতে? নাঃ, অনেক দেরি হয়ে গেছে। জামাটা খুলে অতীশ বিছানার উপরে বসে পড়ল। সমস্ত মনটা বিস্বাদ লাগছে। সারা শরীরে শিথিল ক্লান্তি। আজ রাতে অনেক কাজ করবার ছিল। কিছুই হবে না।

শ্যামলাল হঠাৎ বললে, "আপনার কথাটা ভেবে দেখলাম অতীশবাবু।"

"কী কথা?"

"সেই টিউশন।" শ্যামলালের কান পর্যন্ত রাঙা হল বলতে গিয়েঃ "শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েই গেলাম।"

অসীম বিস্ময়ে নিজের শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলে গেল অতীশ। বিভ্রান্ত চোখে তাকাল শ্যামলালের দিকে।

"তার মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।"

শ্যামলাল একটা ঢোঁক গিলল, "মানে, উনি যখন সেকেণ্ড টাইম এলেন, মানে প্রায় আটটার সময়, তখন ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। আমি উঠে যাচ্ছিলাম, আমাকে ডেকে বললেন, 'একগ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? ভারী তেষ্টা পেয়েছে।' কী আর করি। জল দিতে হল।"

বিস্ফারিত চোখে অতীশ চেয়ে রইল। শ্যামলাল মন্দিরাকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে, অথচ তার আগে অজ্ঞান হয়ে পড়েনি! শ্যামলালের উপর সে অনেকখানি অবিচার করেছিল বলে মনে হচ্ছে।

"হুঁ। তারপর?"

নববধূর মতো লজ্জিত ভঙ্গিতে শ্যামলাল বলতে লাগল, "তারপরে উনি বললেন, 'মিনিট দশেক বসতে চাই—আপনার কোনো আপত্তি আছে?' আমি আর আপত্তি করি কী করে? চুপচাপ বসেই বা থাকা যায় কতক্ষণ? শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বুঝি অতীশবাবুকে টিউশনের কথা বলেছিলেন? কেমিস্ট্রির জন্যে?' শুনে উনি বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ বলেছিলাম বটে। আপনি পড়াবেন?' আমি আর না করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত রাজীই হয়ে গেলাম।"

অতীশ কৌতুক বোধ করল, আশ্চর্য হল তার চাইতেও বেশী। শ্যামলালের জন্যে নয়, মন্দিরার জন্যে।

"বেশ করেছেন। মেয়েটি ভালো।"

শ্যামলাল উৎসাহিতভাবে বললে, "আমারও তাই মনে হল।"

আরো কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল শ্যামলালের, নতুন টিউশনটার আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চালাতে চাইছিল খুব সম্ভব। কিন্তু আজ অতীশের পালা। মনে হল, কিছুক্ষণ একা থাকা দরকার, শ্যামলালকে সে সইতে পারছে না। কোথায় যেন আজ ক্রমাগতই হার হচ্ছে তার।

অতীশ ছাদে উঠে এল। চিলেকোঠায় ঢুকে ঘুঁটের স্তূপের উপরে বসল না শ্যামলালের মতো, তার বদলে ছাদের রেলিং ধরে তাকিয়ে রইল নীচের দিকে। কলকাতার সেই পরিচিত অভ্যস্ত সন্ধ্যা। অন্ধকার গাছের সার—আলোজ্বলা জানালা—রেডিয়োর গান—শিশুর কান্না।

কেন এল না সুপ্রিয়া?

শরীর ভালো নেই? অতীশকে তার আর ভালো লাগে না? না মহাভারতের গীততীর্থের ডাক তার কানে এসে পৌঁছেছে?

শোবার আগে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছিল সুপ্রিয়া। রেবা ঘরে এল।

"বেশ গাইলেন দীপেনবাবু—না?"

"হুঁ।"

"কী মিষ্টি গলা। এখনো যেন কানে বাজছে।"

সুপ্রিয়া হঠাৎ মুখ ফেরাল।

"আচ্ছা—রেবা?"

"কী?"

"হঠাৎ যদি আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে যাই, কী হয় তা হলে?"

রেবা চমকে উঠল, "তার মানে? এ আবার কিরকম ঠাট্টা?"

"ঠাট্টা নয়। সত্যিই ভাবছি কথাটা। আমি পালাব এখান থেকে।"

রেবা বললে, "হঠাৎ এমন বেয়াড়া শখ হতে গেল কেন? কিসের জন্যে পালাবি?"

"সারা জীবন ধরে যাকে খুঁজছি, তার জন্যে।"

"এ যে কাব্যের মতো শোনাচ্ছে। কাউকে ভালোবেসে চলে যাবি নাকি তার সঙ্গে?"

"না—ঠিক উলটো," চিরুনি নামিয়ে রেখে সুপ্রিয়া বললে, "যাদের ভালোবাসি, তাদের কাছ থেকেই আমাকে চলে যেতে হবে। নইলে যা আমি চাইছি তা কোনদিনই পাব না। ওই ভালোবাসাই আমার পথ আটকে রাখবে।"

"ভালোবাসাই তো সব চেয়ে বড জিনিস সুপ্রিয়া। তার চাইতেও বড় তুই কী পাবি?"

"আমার গানকে।"

"গানকে?"

"হুঁ।"

"প্রেমের চাইতে গান বড?"

"তুলনা হয় ভাই? প্রেম তো দুজন মানুষের—তাদের ভিতরেই সে জন্মাবে, আবার ফুরিয়েও যাবে। কিন্তু গান চিরকালের—লক্ষ কোটি মানুষের ভালোবাসা আর স্বপ্ন দিয়ে সে গডা।

সে আমার তিলোত্তম—সে লোকোত্তর।"

রেবা কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"বুঝতে পেরেছি। সেই লোকোত্তরের জন্যেই তুই চলে যেতে চাস?"

"ঠিক ধরেছিস। মনে কর রাত্রে সকলের চোখ এড়িয়ে যদি পালিয়ে যাই—"

রেবা ভয়ঙ্করভাবে শিউরে উঠল, "সে কি!"

"ভয় নেই, আজ নয়। কিন্তু হয়তো খুব শিগগিরই।" আঙুলের ডগায়

খানিকটা ক্রীম নিয়ে সুপ্রিয়া মুখের উপরে ঘষতে লাগল, "কিন্তু সত্যিই যদি চলে যাই, লোকে আমায় ভুল বুঝবে তো?"

"বোঝাই তো স্বাভাবিক।"

"যারা আমায় ভালোবাসে?"

"তারাও ভুল বুঝবে। কিন্তু—" রেবা গম্ভীর হয়ে উঠল, "কিন্তু খ্যাপামি করবার আগে একটা কথা তোকে মনে করিয়ে দেব সুপ্রিয়া। তোর রূপ আছে—এ-কথা ভুলিসনি। আর এ-কথাও ভুলিসনি যে, ভারতবর্ষে যত তীর্থই থাকুক, এখানকার মানুষগুলো এখনো সাধু-সন্তে পরিণত হয়নি। একটি সুন্দরী একা মেয়ের পক্ষে এখনো এ-দেশ নিরাপদ নয়।"

"আচ্ছা ভেবে দেখব।" সুপ্রিয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা—তুই শুতে যা ভাই। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

রেবা চলে যাচ্ছিল, দোরগোড়ায় গিয়ে একবার থেমে দাঁড়াল।

"তোর রূপ আছে, এ-কথাটা কম করে বলেছিলাম। তুই আগুন। মানুষের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, দেবতাকেও তুই জ্বালিয়ে তুলতে পারিস। এক কলকাতাই তো যথেষ্ট, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে লঙ্কাকাণ্ড করতে চাইছিস কেন?"

রেবা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আয়নার ভিতরে নিজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়া। আগুন? এ-কথাটাও নতুন বলেনি রেবা। আরো দু-একজনের মুখেও তা শুনতে হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ নতুন করে রেবা মনে করিয়ে দিল কেন? ওর মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত আছে তার, একটা আছে আঘাত কোথাও?

তৃতীয় অধ্যায়

এক

বাইরের ঘরে বসে একটা কী যেন সেলাই করছিল রেবা। পাশে-রাখা রেডিয়োটায় নিচু পর্দায় পদাবলী কীর্তন চলছিল, রেবা গুনগুন করছিল তার সঙ্গে :

"আমি কানু-অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল তুলসী দিয়া—"

"আসব ?"

চকিত হয়ে রেডিয়ো বন্ধ করে দিলে, "আসুন।"

ঘরে ঢুকল অতীশ।

"অতীশবাবু ? এত রাতে ?"

"এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, একবার খবর নিতে এলাম।"

"ভালোই হল। বসুন।" রেবার চোখের কোনায় একটুখানি কৌতুক ছলছল করে বয়ে গেল, "কিন্তু বাবা নেই বাড়িতে, সুপ্রিয়াও না। ওঁরা পুবালি সিনেমায় মিউজিক কন্‌ফারেন্সে গেছেন।"

"ও।" অতীশ পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছে ফেলল।

"এই ঠাণ্ডার মধ্যেও বেশ ঘেমে গেছেন দেখছি। অনেকটা হেঁটে এলেন বোধ হয় ?"

"না—এমন বিশেষ কিছু নয়।" অতীশ জবাব দিলে। কিন্তু এখানে আসবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে, এই ঘরে বসে থাকবারও কোনো অর্থ হয় না আর। যা জানবার, নিঃশেষে জানা হয়ে গেছে। আজকেও যখন বকুলতলায় দাঁড়িয়ে সে অধৈর্য প্রতীক্ষা করছিল, ঘন ঘন দেখছিল ঘড়ির দিকে, দুর্গাশঙ্করের জানালার আরক্তিম আলোটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যখন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছিল চোখে, তখন সুপ্রিয়ার মনের সামনে সে কোথাও

ছিল না, সুপ্রিয়া তখন গিয়ে বসে ছিল সারা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণীদের দরবারে, তাকে ঘিরে রেখেছিল সুরের ইন্দ্রজাল, তার চোখের সামনে একটির পর একটি রাগ-রাগিণীর জ্যোতির্ময় বিকাশ ঘটছিল। সেখানে অতীশ কোথাও ছিল না।

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়বার কথা ভেবেছিল অতীশ, কিন্তু মন এত সহজেই হার মানতে চাইল না। অন্তত এত সহজেই রেবার কাছে ধরা দেবার কোন অর্থ হয় না। নিজের অসীম ক্লান্তি আর একরাশ হতাশাকে জোর করে চেপে রেখে অতীশ বললে, "আপনি গেলেন না গান শুনতে ?"

"আমার শরীরটা ভালো নেই। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জ্বর হয়েছে একটু। তা ছাড়া সত্যি কথাই বলি আপনাকে।" রেবা হাসল, "ও-সব উঁচুদরের গান বেশিক্ষণ আমার বরদাস্ত হয় না। কেমন মাথা ধরে যায়।"

"বলেন কি !" প্রাণপণ শক্তিতে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল অতীশ, "আপনি তো শুনেছি গানের চর্চা করে থাকেন। এ-কথা আপনার মুখে তো ঠিক মানায় না।"

"গান নয়, সেতার। কিন্তু যা শিক্ষালাভ হচ্ছে তা সেতারই জানে আর জানেন আমার গুরুজী। ও-কথা বলে আমায় আবার লজ্জা দেবেন না। সে থাক। কিন্তু আপনার রিসার্চের খবর কী ?"

"চলছে একরকম।"

"থীসিস দিচ্ছেন কবে ?"

"এই মাসেই।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কী ? আমাদের মতো অপদার্থ যা করে। অর্থাৎ প্রোফেসরির চেষ্টা করব।" অতীশ রেবার দিকে মুখ তুলে হাসল। কিন্তু তার আগেই অতীশের চোখের ক্লান্তি লক্ষ্য করেছে রেবা। অনুভব করেছে, জোর করে কথা বলছে অতীশ ; অনেকদিন পরে এসেছে, তাই কোনোমতে সেরে নিচ্ছে ভদ্রতার পালা।

হঠাৎ রেবার মনে পড়ল কালকের রাতের কথা। সুপ্রিয়া বলছিল : 'আমি যদি হঠাৎ কলকাতা থেকে পালিয়ে যাই—'

সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে রেবা বললে, "এবার একটা বিয়ে করুন না অতীশবাবু।"

অতীশ চমকে উঠল। কিন্তু সামলে নিলে সঙ্গে সঙ্গেই।

"বিয়ে তো করতেই চাই।" কৃত্রিম সপ্রতিভতায় অতীশ বললে, "কিন্তু এ হতভাগাকে বরমাল্য দেবে কে? পাত্রী কোথায় পাই বলুন?"

"আপনার জন্যে পাত্রীর অভাব। একবার মুখ ফুটে কথাটা বলুন না, দরজার গোড়ায় পুরো এক মাইল একটা লাইন পড়ে যাবে। কিন্তু এ-সব বিনয় থাক। পাত্রী তো ঠিক করাই আছে আপনার।"

অতীশ ঘেমে উঠল। রেবা হয়তো জানে। কিন্তু কতটুকু জানে? রুমাল দিয়ে আর-একবার মুখ মুছল অতীশ, হাত কাঁপতে লাগল অল্প অল্প।

"কোথায় আর পাত্রী ঠিক করা আছে? আপনারা তো কেউ চেষ্টা করছেন না আমার জন্যে।" অতীশ হাসল। কিন্তু রেবা হাসল না। বিষণ্ণ গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রেডিয়োটার দিকে।

"আপনি সুপ্রিয়াকে বিয়ে করুন।"

অতীশের মুখে যেন আঘাত এসে লাগল। হাত থেকে খসে পড়ল রুমালটা। নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে অতীশ শুকনো গলায় বললে, "ঘটকালির জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু সুপ্রিয়া রাজী হবে কেন?"

"কারণ সুপ্রিয়া আপনাকে ভালোবাসে।"

অতীশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। নতুন কথা নয়। সুপ্রিয়া নিজেই বলেছে অনেকবার, "অতীশ, তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বড় আমার গান। সেখানে যদি তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে না পারো—তা হলে তোমাকে নিয়ে আমার কেমন করে চলবে?"

অতীশ আর আত্মগোপনের চেষ্টা করল না। তাকিয়ে তাকিয়ে পায়ের

সামনে মেঝেতে মোজেইকের কারু-কাজ দেখতে লাগল, কান পেতে শুনতে লাগল ঘড়ির শব্দ। তারপরে মুখ তুলল।

"ভালো হয়তো বাসে। কিন্তু বিয়ে আমাকে সে করবে না।"

"কেন করবে না?"

"আমার চাইতে অনেক বড় জিনিসের জন্যে তার সাধনা।"

রেবা হাসল, "আমি জানি। অনেকবারই শুনেছি। কিন্তু একটা কথা ও বুঝতে পারে না যে, নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে জীবনে ও কিছুই পাবে না। ওর ও-সব পাগলামিতে কান দেবেন না অতীশবাবু।"

"কী করব তবে?"

"জোর করবেন।" রেবার গলা শক্ত হয়ে উঠল, "পুরুষমানুষের সত্যিকারের শক্তির পরিচয় পালোয়ানিতে নয়, এই তো তার জায়গা। আপনি জোর করে ওকে কাছে টেনে নিন।"

"সব কিছুই কি জোরের ওপরে চলে?"

"সব চলে না, অনেকগুলো চলে। এও তার মধ্যে একটা। সুপ্রিয়া আপনাকে ভালোবাসে, আপনি সুপ্রিয়াকে ভালোবাসেন। তা সত্ত্বেও কেন ওকে এগিয়ে দিচ্ছেন ভুলের দিকে? কেন জোর করে ফিরিয়ে আনছেন না?"

আবার কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইল অতীশ। কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে, কিন্তু মোছবার চেষ্টা করল না।

"ভুল করেছে কী করে বলব?" চোখ না তুলেই অতীশ বললে, "ও শিল্পী।"

"না, ও মেয়ে। সেই পরিচয়টাই আগে। জেদের ওপরে এই সত্যি কথাটাকেই ও স্বীকার করতে চাইছে না। কিন্তু বুঝবে অনেক দুঃখ পাওয়ার পরে। আপনি জেনে-শুনেও কেন সেই দুঃখের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ওকে?"

অতীশ চুপ করে রইল। সমস্ত জিনিসটাকেই বড় বেশী সহজ করে নিয়েছে রেবা, বিচার করে নিয়েছে নিজের মতো করে। কিন্তু সুপ্রিয়াকে তো

আরো ভালো করে জানে অতীশ। আসলে, প্রেমের সঙ্গে গানের বিরোধ নেই সুপ্রিয়ার, বিরোধ আছে বন্ধনের সঙ্গে। প্রেম তার জীবনে অনেক আসবে, বারে বারেই আসবে। তার মধ্যে অতীশও আছে। সে তো একমাত্র নয়। কাউকে জীবনে না জড়িয়েও সুপ্রিয়া নিজের মধুচক্রটি ভরে নিতে পারবে। অনেকের অর্ঘ্যকে কুড়িয়ে নিয়ে সে তাদের সুরের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, তার গানের দীপান্বিতায় তারা প্রদীপ হয়ে জ্বলবে।

অতীশ ক্ষীণভাবে হাসল। "ঠিক জানি না। আর দুঃখের বোধও হয়তো সকলের এক নয়। হয়তো নিজের মতো করেই সুখী হতে পারে সুপ্রিয়া।"

"মানলাম। কিন্তু আপনি?" তীরের মতো একটা সোজা প্রশ্ন রেবা ছুড়ে দিলে অতীশের দিকে, "আপনার দিকটা? ওকে ছেড়ে দেওয়াটা আপনি সইতে পারবেন? খালি ওর কথাই ভাবছেন, নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন একবার?"

বিবর্ণ হয়ে গেল অতীশের মুখ। এত দিন ধরে প্রাণপণে নিজেকেই ভুলে থাকবার চেষ্টা করেছে। ভাবতে চেয়েছে, যে-কদিন সুপ্রিয়া তার কাছে থাকতে চায় থাকুক। যত দিন সুপ্রিয়ার ভালো লাগে, ততদিন সে ওর মনটাকে সঙ্গ দিয়ে যাক। যেদিন সুপ্রিয়া সব কিছু নিজের হাতে সাঙ্গ করে দেবে সেদিন সেও জানবে, সমস্ত ফুরিয়ে গেছে, আর কিছু বলবার নেই, করবার নেই, ভাববার নেই।

আর তার মন? তার দিনগুলো? তার নিঃসঙ্গ দুপুর, তার বিবর্ণ সন্ধ্যা, তার ঘুমভাঙার রাত? কেমন করে কাটবে? জীবনে এমন কোন অপরূপ আনন্দ আছে, কোন আশ্চর্য বিস্ময় আছে, কোন অপরিমিত প্রাচুর্য আছে, যা এই সমুদ্রবিশাল শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে? ডি-এসসি? সম্মান? ভদ্র রকমের অধ্যাপনা? এক একটা অসহ্য মুহূর্তে আর্ত কান্নার মতো অতীশের মনে হয়েছে, কিছুই না, কিছুই না। কোনো অতলস্পর্শ গভীর খাদের উপর এরা মাকড়শার জালের মতো ছড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এত বড় ফাঁকিটার উপরে তারা যেন আরো কঠিন, আরো নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।

বাইরে হাওয়া উঠল। পার্কে পামের পাতায় মর্মর। রেডিয়োতে বাঁশির সুর। ঘরের ঘড়িটা স্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে সময়ের হৃৎপিণ্ডের মতো নিজের অস্তিত্ব জানাচ্ছে। প্রশ্নটা অতীশের দিকে এগিয়ে দিয়ে রেবাও বসে রইল চুপ করে। সেও জানে, এত সহজেই অতীশ এর উত্তর দিতে পারবে না।

অতীশ সহজ হতে চেষ্টা করল। কৃত্রিম সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললে, "আমি আমার কাজ নিয়ে থাকতে চেষ্টা করব। আচ্ছা, উঠি আজ। রাত হয়ে গেছে, আর আপনাকে বিব্রত করব না।"

রেবা বাধা দিল না, বিদায়-সম্ভাষণও জানাল না। ক্লিষ্ট ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিঃশব্দেই। অতীশ আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে গেল।

সেলাইটা আবার তুলে নিতে গিয়ে ছুঁচ ফুটে গেল আঙুলে। চুনির বিন্দুর মতো এক ফোঁটা রক্ত দেখা দিল। রেবা দেখতে লাগল সেটাকে। একটা গভীর সহানুভূতির উচ্ছ্বাসে রেবার মনে হল, অতীশ তাকে কেন ভালোবাসল না? সে নিজের সব কিছু দিত অতীশকে, তার সমস্ত উজাড করে দিত, কোথাও বাকী রাখত না। কিন্তু রামধনুর রঙে যার চোখ ভরে রয়েছে, মাটির ফুলকে সে কি দেখতে পায়?

মৃদু নিশ্বাস ফেলল রেবা। জীবন। তার সমস্ত সুতোগুলোই ছেঁড়া, কোথাও জোড়া লাগে না।

আর অতীশ হেঁটে চলল পথ দিয়ে।

মেসে ফিরবে? সেই ঘরে? আবার জটিল একরাশ অঙ্ক নিয়ে বসবে? পারবে না, কিছুতেই মন বসবে না আজকে। খালি মনে হতে থাকবে একটা অন্ধকূপের দেওয়াল তার চারদিকে, তার ভিতরে সে নিরুপায় বন্দী। একটা সন্ধ্যার কয়েকটা মিনিট ব্যর্থ হয়ে গেলে সব এমন মিথ্যে হয়ে যায়, এ-কথা এতদিন কেন বুঝতে পারেনি অতীশ?

রোমান্টিক? বিজ্ঞানের ছাত্র নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে বারবার। কিন্তু মনকে সে বিচার দিয়ে বশ মানাতে পারেনি। একা চলতে চলতে অতীশের মনে হল, এই বেদনাকে সে-ই নিন্দে করতে পারে, এমন যন্ত্রণা যার জীবনে

কখনো আসেনি, যার একটি সন্ধ্যার প্রত্যাশা এমনভাবে কখনো ব্যর্থ হয়ে যায়নি।

প্রেমের জন্যে মানুষ আত্মহত্যা করেছে। দু বছর আগে এ-কথা শুনলে অতীশ ব্যঙ্গের হাসিতে কুটিল হয়ে উঠত। বলত: "এসব গর্দভের হাত থেকে পৃথিবী যত তাড়াতাড়ি নিস্তার পায় ততই ভালো।" কিন্তু আজ? আজকে কি ঠিক এত বড় জোবের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর হাসি হাসতে পারে অতীশ!

সামনে পথ। আলো, মানুষ, গাড়ি, শব্দ। সব যেন এলোমেলো প্রলাপ। কী অর্থহীন, কী বিরাট ফাঁকি দিয়ে গড়া।

তার চাইতে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলা যাক ময়দানের দিকে। তারপর সামনে একরাশ অন্ধকার ভিজে ঘাস, আর আকাশভরা প্রথম শীতের বিষণ্ণ তারা।

সেই ভালো।

দুই

পথে মানুষের ভিড। টিকেট কেটে যারা ভিতরে ঢুকতে পায়নি, সেই রবাহূতের দল তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্বমুখে। য়্যামপ্লিফায়ারের দিকে। ওরই ভিতর দিয়ে কর্তৃপক্ষের করুণায় গানের আর বাজনার সুধাবৃষ্টি হচ্ছে। ঝরে পডছে রাগ-রাগিণীর ঝরনা।

ভিতরে যারা অনেক টাকা দিযে টিকেট কেটে বসেছে, তারা হয়তো গানের ফাঁকে ফাঁকে পান খাচ্ছে কেউ কেউ। হয়তো তাদের দু-একজন এ ওর কানে কানে কথা কইছে। হয়তো ওবই মধ্যে ঘুমিযে পডেছে কেউ বা। কিন্তু বাইরে যে রবাহূতের দল তখন থেকে অধীর প্রতীক্ষা করছে, দাঁডিয়ে আছে দল বেঁধে, বসে আছে রকের উপর, কিংবা ফুটপাথেই বসেছে মযলা চাদর আর গামছা বিছিয়ে, তারা এতটুকুও ফাঁক যেতে দিচ্ছে না। তালের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাথা নডছে, সমের মুখ 'আহা-আহা' করে উঠছে। পথচলিত ট্রাম-বাস গাড়ির শব্দে যখন বিঘ্ন ঘটছে, তখন বিরক্ত ভ্রূকুটি দেখা দিচ্ছে তাদের মুখে।

ওস্তাদ জলিলুদ্দিনের সরোদ থামল। বহু দূরেব থেকে বযে আসা বিপুল একটা সুরের ঢেউ যেন চূডান্ত কলোচ্ছ্বাসে ভেঙে পডে খান খান হয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বালির মধ্যে। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল জনতা। য়্যামপ্লিফায়ারে যখন কর্কশ হাততালির বেসুরো ঐকতান উঠল, তখন বাইরের কেউ একটু শব্দ পর্যন্ত করল না।

আর একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁডিয়ে রইল কান্তিভূষণ। সেও টিকেট পাযনি।

য়্যামপ্লিফায়ারে রুক্ষ গলার ঘোষণা। প্রথমে হিন্দীতে তারপরে বাংলায়।

"এতক্ষণ মহীশূর দরবারের ওস্তাদ জলিলুদ্দিন খাঁ আপনাদের সরোদ শোনালেন, এবাব খেয়াল গেয়ে শোনাবেন লখ্‌নউয়ের দীপেন বসু।"

কান্তি নড়ে উঠল একবার। দীপেন বসু। কোথাও একটা কিছু বুঝতে পেরেছে সে। কাল রাত্রেও সে এমনি পার্কে বসে খেয়াল শুনেছে সেই হলদে বাড়িটার সামনে। সকলের অভ্যর্থনা কুড়িয়ে, স্মিত হাসিতে দীপেন যখন নিজের গাড়িতে উঠেছে, তখনো বসে বসে দেখেছে কান্তি। রাত তখন এগারটার কাছাকাছি হয়েছিল, সে ছাড়া পার্কে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না।

আরো মনে পড়েছে কান্তির। কাল সকালে যার মোটরে চড়ে সুপ্রিয়া তার পাশ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল সে-ও দীপেন বসু ছাড়া আর কেউ নয়।

দীপেন বসু। মনে মনে কিছু একটা যোগফল টানতে চাইল কান্তি, পারল না। একটা নিশ্চিন্ত ধারণা যত বেশী করে এগিয়ে আসতে চাইছিল তত বেশী করেই কান্তি দূরে ঠেলে দিতে চাইছিল তাকে। নিজের এত বড সাংঘাতিক ক্ষতিকে, এমন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে পারছিল না কিছুতেই।

য়্যামপ্লিফায়ারে তবলার টুংটাং। কে সঙ্গত করছে? নামটা বলা উচিত ছিল, ভুলে গেছে। ভারী মিষ্টি হাত। কে বাজাচ্ছে? কাশীর পণ্ডিত লালতাপ্রসাদ? খুব সম্ভব।

ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দুখানা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ছুটে গেল উর্ধ্বশ্বাসে। শব্দের ঝড়টা যখন শেয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে মিলিয়ে গেল তখন দীপেন বোসের গান শুরু হয়েছে।

"গাগরী ভরনে যাঁউ"—

এ গান কালও শুনেছে কান্তি। আজকে আরো দরাজ, আরো উজ্জ্বল, আরো বিকশিত। সমজদারের দরবারে গুণীর গলা আপনিই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। ভালো লাগার একটা বিপুল উচ্ছ্বাসকে টেনে এনে মগ্ন হয়ে যেতে চাইল কান্তি, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ পেরে উঠল না। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ হয়ে রয়েছে, কপালের দুটো রগ টনটন করছে, কাল ঠাণ্ডায় রাত এগারটা পর্যন্ত বসে থেকে শরীরে দেখা দিয়েছে খানিকটা জ্বরের উত্তাপ, এই স্থূল সত্যগুলোকে সে কিছুতেই ভুলতে পারল না।

"ননদিয়া, গাগরী ভরনে যাউ—"

সাতটি স্বরের লহর খেলছে—লকলকিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের মত। অমিয় মজুমদারের পাশে বসে এক দৃষ্টিতে দীপেনের দিকে তাকিয়ে ছিল সুপ্রিয়া। উৎকর্ণ আসরের ভিতরে, উঁচু মঞ্চের উপর এই মুহূর্তে বসেছে দীপেন। এখন সে স্বমহিম, সে সম্রাট। এতগুলি মানুষের চোখ এখন তারই উপরে, এখন তারই স্বরের দোলায় দোলায় দুলে উঠছে এতগুলি রক্তোদ্বেল হৃৎপিণ্ড, এতগুলি চোখকে সেই তুলছে স্বপ্নরসায়িত করে, এই মুহূর্তে এতগুলি মনকে নিয়ে সে যা খুশী তা-ই করতে পারে।

সম্রাট বই কি!

কাল সকালের কথা মনে পড়ল। সে আর-একজন। তার চোখের কোনায় লালচে আভা, রাত্রির নেশার ঘোর তার কাটেনি, চোখের কোলে কোলে তার কালির পোঁচ পড়েছে। রগের দুপাশে চুল শাদা হয়ে গেছে, কুঁকড়ে গেছে গালের চামড়া। ভালোবেসে একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল, অথচ জীবনের কোথাও এতটুকু স্বীকৃতির সম্মান দেয়নি তাকে। সব মিলিয়ে কেমন ক্লেদাক্ত মনে হয়েছিল। তারপরে চা খেতে গিয়ে সেই প্রস্তাব, মহাকাল-তীর্থের সেই ধ্রুপদী মৃদঙ্গের ধ্বনি, সেই কর্ণাটকী রাগ, একটা অসহ্য আকর্ষণ পাঠিয়েছিল বুকের প্রতিটি রক্ত-নাড়ীতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেছিল সুপ্রিয়া। আরক্তিম সূর্যোদয়ের উপরে কোথা থেকে মেঘের ছায়া যেন নেমে এসেছিল।

ভেবেছিল সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু রাত্রেই সব এলোমেলো করে দিল দীপেন। গান শোনাল। আবার চঞ্চলতা, আবার মৃদঙ্গের বোল; আকাশ-ছোঁয়া বিরাট গম্ভীর মন্দিরের বিশাল চত্বরের উপর পড়ল দক্ষিণী নাচের পদক্ষেপ। অনেকক্ষণ ধরে যেন একটা ঘোরের মধ্যে তলিয়ে ছিল সুপ্রিয়া। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল রেবাকে, "আচ্ছা, আমি যদি কলকাতা থেকে হঠাৎ পালিয়ে চলে যাই, কেমন হয় তা হলে?"

কলকাতায় কিছু নেই, তা নয়। দুর্গাশঙ্কর রয়েছেন। কিন্তু তাঁর চোখে

জ্বালা নেই, তাঁর দৃষ্টি স্তিমিত, ধ্যানের মধ্যে সমাহিত। দুর্গাশঙ্করের দেওয়ালে গান্ধার রীতিতে আঁকা সরস্বতীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর গান শুনতে শুনতে আর আবছা নীল আলোটার মধ্যে মগ্ন হয়ে যেতে যেতে সুপ্রিয়ার মনে পড়েছে, 'কুমার-সম্ভব'। কিন্তু অপর্ণাবল্লভের লাস্যলীলাকে নয়। এ সেই শঙ্কর, কস্তুরীবাসিত অলকনন্দার শীকরবাহী বাতাস যাঁকে ঘিরে ঘিরে মুগ্ধ ভক্তের মতো প্রদক্ষিণ করছে, যিনি মীলিত ত্রিনেত্রে অজিনাশ্রিত, দেবদারুকুঞ্জের ছায়ামণ্ডপে শিলাবেদীতে যাঁর অস্তশ্চর মরুৎগুচ্ছ স্থির স্তব্ধ, দুর্গাশঙ্করের গানে তাঁরই প্রমূর্তি; মগ্ন করে, মাতাল করে দেয় না।

আর আজকে এ কী গান ধরেছে দীপেন?

এ কাল সকালের সেই বিশৃঙ্খল মানুষটা নয়, কাল রাতে যে গানের মোহচ্ছন্দ বিস্তার করেছিল সে-ও নয়। এ আর-একজন। যাকে সুপ্রিয়া কখনো দেখেনি, যার কাছে পৌঁছুতে হলে মাটিতে পা দিয়ে যাওয়া চলে না, যেতে হয় উর্ধ্বমুখী একটা জ্যোতিঃপথের অনুসরণ করে। সুরের সম্রাট আজ আকাশে বিছিয়ে দিয়েছে তার সঙ্গীতের সিংহাসন আর সেখান থেকে যেন এক-একটি করে সোনার পদ্মের পর্ণ পৃথিবীতে ঝরে ঝরে পড়ছে।

সেই স্বর্ণপর্ণের অভিষেকে শঙ্করের জাগরণ। কিন্তু দেবদারু-কুঞ্জের সেই ধ্যানশ্রী নয়। আকাশ-ছোঁয়া দক্ষিণী মন্দিরের চূড়া কত দূরে যে এখন উঠে গেছে, ছাড়িয়ে গেছে কোন্ সপ্তর্ষিলোক, পিতৃলোক, তা কেউ জানে না। গ্রানিট্ পাথরে গড়া মন্দিরের চত্বর এখন পৃথিবীর চতুঃসীমা পার হয়ে গেছে, পার হয়েছে সপ্ত সমুদ্র, প্রসারিত হয়েছে অনন্তে। এখন সমুদ্র হয়েছে মৃদঙ্গ, নক্ষত্রে নক্ষত্রে করতাল বাজছে, অরণ্যে ঝোড়ো হাওয়ায় বাজছে সারেঙ্গীর সুর। এখন নটরাজ শুরু করেছেন তাঁর তাণ্ডব, তাঁকে ঘিরে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে কোটি সূর্যের কোটি কোটি সপ্তশিখার বিচিত্রবর্ণ অলাতচক্র। এ যেন সৃষ্টির সেই আদি নৃত্য, যা একদিন পৃথিবীকে জন্ম দিয়েছিল; এ যেন সৃষ্টির সেই শেষ নৃত্য, যার শেষ পদক্ষেপে বস্তু-পৃথিবী রেণু রেণু হয়ে জ্যোতির নীহারিকায় মিলিয়ে যাবে।

সুপ্রিয়া তাকিয়ে রইল।

দীপেন থামল প্রায় এক ঘণ্টা পরে।

অনেকখানি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এল সুপ্রিয়া। ফিরে এল পৃথিবীতে, যেখানে মানুষের করতালির অট্টরোল, কথার উচ্ছ্বাস, চিনেবাদামের খোলা ভাঙবার শব্দ, চায়ের পেয়ালা। যে নক্ষত্র-জগৎ মাটির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল, আবার তা সরে চলে গেছে দূর-দুরান্তে।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে থেকে অমিয় মজুমদার বললেন, "লোকটা যেন ম্যাজিক জানে!"

সুপ্রিয়ার হঠাৎ কেমন ক্লান্তি লাগতে লাগল। উগ্র, ভয়ঙ্কর নেশার পরে শিরাছেঁড়া অবসাদের সঞ্চয়।

"কাকাবাবু, আমি বাড়ি যাব।"

"সে কী! এখুনি?"

"আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।"

"অমিয়বাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "চল্ তবে। কিন্তু জমেছিল বেশ।"

"আপনি বসুন না।" সুপ্রিয়া সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "আমি যাই।"

"একা?" অমিয়বাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "রাত তো দশটা বেজে গেছে।"

"একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব।"

অমিয়বাবু আবার দ্বিধাভরে বললেন, "আচ্ছা, সাবধানে যাস।"

একবারের জন্যে তাঁর মনে হল, হয়তো মেয়েটাকে পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল। এভাবে একা ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হল না। কিন্তু গানের এমন জমাট আসরের প্রলোভন ওটুকু দ্বিধাকে ভাসিয়ে নিলে। তারপরে ভাবলেন, কলেজে পড়েছে, স্কুলে পড়ায়, এটুকু স্বাধীনতা ওদের দেওয়া যেতে পারে।

মাইক্রোফোনে ধ্বনিত হল ভারতবর্ষের সেরা ওস্তাদের তবলা-লহরার বার্তা। অমিয় মজুমদার উৎকর্ণ হয়ে বসলেন। আর সুপ্রিয়া বেরিয়ে এল হল্ থেকে।

"আপনি চলে যাচ্ছেন?"

পাশ থেকে কে জিজ্ঞেস করল। সুপ্রিয়া তাকিয়ে দেখল, শীর্ণ কালো

চেহারার একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, ময়লা শার্টের উপরে বিবর্ণ কোট পরা। সুপ্রিয়া বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়ল।

"আপনার টিকেটটা আমাকে দেবেন?" একটা মিনতির মতো শোনাল ভদ্রলোকের স্বর।

"ওটা দু দিনের জন্যে। স্পেশ্যাল কার্ড।"

"ও:!"

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সরে গেলেন। তারপর আবার গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন পাশের পার্কের রেলিঙের গায়ে।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হয়ে চলল ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে।

"সুপ্রিয়া।"

চকিত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল সুপ্রিয়া। অতীশ? আজ সারাদিন ধরে অতীশের কথাটা থেকে-থেকে তাকে বিষণ্ণ করেছে, মনে পড়েছে, আজও সন্ধ্যায় দুর্গাশঙ্করের বাড়ির উলটো দিকে বকুলতলায় প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে অতীশ। সুপ্রিয়া খুশির চমকে ফিরে তাকাল।

কান্তি।

"কান্তিদা—তুমি!"

দুটো জ্বলজ্বলে চোখে সুপ্রিয়াকে লেহন করতে করতে কান্তি বললে, "কেন, আমার কি আসতে নেই তোমাদের কলকাতায়?"

"গান শুনতে এসেছিলে? কিন্তু তোমাকে তো ভেতরে দেখতে পেলুম না।"

"টিকেট পাইনি।"

সুপ্রিয়া নিজের ব্যাগ খুলল। বের করে আনল ফিকে গোলাপী রঙের স্পেশ্যাল কার্ডটা।

"এইটে নিয়ে ভেতরে যাও। কালকেও চলবে। আমার আর দরকার হবে না।"

"কার্ড থাক।" তেমনি জ্বলজ্বলে চোখে কান্তি বললে, "তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।"

সুপ্রিয়া হাতঘড়ির দিকে তাকাল। "কিন্তু রাত দশটা বেজে গেছে। আমাকে আবার ফিরতে হবে সেই ভবানীপুরে। তুমি বরং কাল সকালে আমাদের বাড়িতে যেয়ো কান্তিদা।"

মুখের উপরে যেন একটা চাবুকের ঘা এসে পড়ল কান্তির। কালকের সকাল, পথ দিয়ে একটানা পায়চারি, কেবল তাকিয়ে দেখা হলদে বাড়িটার নীল পর্দা হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে, তারপর সন্ধ্যা, সামনে একরাশ নানা রঙের মোটর যেন একটার পর একটা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে। আর আজ এই রাত দশটা পর্যন্ত—

দাঁতে দাঁত চাপল কান্তি। মাথার রগগুলো দপদপ করছে। সর্বাঙ্গে জ্বরের উত্তেজনা। টেম্পারেচারটা একটু বেড়েছে হয়তো। এক্ষুনি চলে যাওয়া উচিত। ফিরে যাওয়া উচিত নিজের বোর্ডিঙে, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা উচিত ছারপোকা-কণ্টকিত ঠাণ্ডা বিছানাটার উপরে, আর শুয়ে-শুয়ে ভাবা, নিজের এক-একটা আঙুলকে ছুরি দিয়ে কাটলে যন্ত্রণাটা কেমন লাগে ?

কিন্তু কান্তি পারল না। বললে, "বেশীক্ষণ তোমার সময় নেব না। মাত্র দশ মিনিট আমায় দিতে পারবে ? তারপরে আমি তোমায় ভবানীপুরে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

নিজের কানেই নির্লজ্জের মতো ঠেকল কথাটা।

সুপ্রিয়া একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলল।

"পাশের চায়ের দোকানটায় বসবে ?"

"থাক—কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে যাই। যেতে যেতেই কথা হবে।"

কান্তি আবার দাঁতে দাঁত চাপল। অর্থাৎ এতটুকু নিভৃতি দেবে না সুপ্রিয়া। একেবারে একান্ত করে পাওয়ার সুযোগ দেবে না কিছুক্ষণের জন্যেও। তার একেবারে নিজের কথাটাকেও বলতে হবে বহুজনের বিশৃঙ্খল বেসুরো শব্দের মধ্যে। কৌতূহলী অসহ্য ভিড়ের ভিতর।

একটা আহত গর্জনকে নিজের মধ্যে সংহত করে নিয়ে কান্তি বললে, "বেশ।"

কিন্তু কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া! এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হাঁটুর জোড়গুলো পর্যন্ত যেন খুলে আসছে, মাথার মধ্যে চাকার মতো ঘুরছে কী একটা, মুখের ভিতরটা অদ্ভুত তেতো হয়ে গেছে। তবু কান্তি আচ্ছন্নের মতো সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। মনে পড়ে গেল, পাঁচ বছর আগে এমনি একটা শারীরিক অসুস্থ যন্ত্রণার দিনে তার দিকে তাকিয়ে করুণায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল সুপ্রিয়ার চোখ, নিজের কোল পেতে দিয়ে বলেছিল, "একটুখানি শুয়ে থাকো লক্ষ্মী ছেলের মতো।" দু হাতে সুপ্রিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল কান্তি, সুপ্রিয়া তার চুলে মায়ের মতো আঙুল বুলিয়ে দিয়েছিল।

আজকে নিজের শরীরটাকে জগদ্দল পাথরের মতো টানতে টানতে কান্তি সুপ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েক পা নিঃশব্দে এগিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "তুমি ভালো আছ কান্তিদা? উঠেছ কোথায়?"

"উঠেছি শেয়ালদার একটা বোডিঙে। ভালোই আছি।"

"কাকিমা?"

"ভালো আছেন।"

"তোমার গান?"

হঠাৎ কোথা থেকে রূঢ় জবাব আসতে চাইছিল, কিন্তু কান্তি নিজেকে সামলে নিলে।

"চলছে একরকম।" তারপর চাপা গোটাকয়েক দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলে কান্তি বললে, "কিন্তু আর বেশী দিন চলবে না। এবার তোমাকে আমার দরকার। তুমি তো জানো, তার জন্যেই আমি অপেক্ষা করে আছি।"

সুপ্রিয়া শ্রান্ত চোখে কান্তির দিকে চাইল, "আমি তো আছিই তোমার জন্যে।"

"না, নেই।" কান্তির ঠোঁটের কোনা কাঁপতে লাগল, "সকলের ভেতরে তোমার এক টুকরো আমি পেতে চাই না। আমি এবার সম্পূর্ণ করে নিতে

চাই তোমাকে। একেবারে আমার জন্তেই। যেখানে আমার কোনো ভাগীদার থাকবে না।"

সুপ্রিয়া একটুখানি থামল। সামনে একটা জ্বলজ্বলে নিয়ন আলোর লেখার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "কিন্তু আমার সবটুকু তো একা তোমাকে দিতে পারব না কান্তি। অন্য লোকও আছে, তারা দাবি ছাড়বে কেন?"

সুপ্রিয়া হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু কান্তি হাসল না। চোখ থেকে এক ঝলক আগুন ঠিকরে পড়ল তার।

"ওসব থাক সুপ্রিয়া। আজ স্পষ্ট কথাই বলতে এসেছি তোমাকে। কবে বিয়ে হবে আমাদের?"

"বিয়ে!" সুপ্রিয়া এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের পেশীগুলো তার শক্ত হয়ে গেল।

কান্তি বললে, "হ্যাঁ, বিয়ে। কবে বিয়ে করবে আমাকে?"

আর লঘুতা চলবে না। কান্তির স্বরের জ্বালা অনুভব করল সুপ্রিয়া, দেখতে পেলে তার চোখের আগুন। শান্ত কঠিন গলায় সুপ্রিয়া বললে, "আমাকে বিয়ে করা তোমার দরকার?"

"শুধু দরকার নয়।" কান্তি হিংস্রভাবে বললে, "পারলে আজকেই—এই মুহূর্তেই।"

"ভেবে দেখতে পারি। কিন্তু কতকগুলো শর্ত আছে আমার।"

"বলো কী শর্ত।"

"আমি হয়তো আরো দু-একজনকে ভালোবাসব। তুমি আমাকে সবটাই পাবে, কিন্তু আমার মনের খানিকটা থাকবে তাদের জন্যেও। তারা আমার কাছে আসবে যাবে। সইতে পারবে সেটা?"

হাতের আঙুলগুলো কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে, কান্তি প্রাণপণে মুঠো করে ধরল। চাপা গলায় বললে, "চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা করা নয়, কথা দিতে হবে। তা ছাড়া আমার খরচ অনেক, তুমি চালাতে পারবে কান্তি?"

চলতে চলতে নুড়িতে হোঁচট খাওয়ার মতো প্রশ্নটা এসে আঘাত করল।

"আমার যা আছে সে তো তুমি জানোই।"

"ওতে চলবে না কান্তি। পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে বসে তোমার ঘর-সংসার দেখব, রান্না-বান্না করব, ছেলে মানুষ করব, আর সময়-সুযোগ পেলে এক-আধদিন তানপুরা নিয়ে বসব, সে আমার সইবে না। তুমি তো জানো, আমি বিলাসী। আমি শৌখিন হয়ে, সুন্দর হয়ে থাকতে চাই। শহরের জীবন নইলে আমার একদিনও চলবে না। তোমার রান্নাঘরের হাঁড়িতে কিংবা জামায় বোতাম লাগানোর কাজে একদিনও তুমি আমায় আশা কোরো না। আমি বড় বড় ওস্তাদের কাছে গান শিখব। শিখতে যাব বোম্বাইয়ে, বরোদায়, মাদ্রাজে। হাজার হাজার টাকা আমার জন্যে তোমার খরচ করতে হবে। যদি কখনো ভালো গাইয়ে হতে পারি—" সুপ্রিয়া একবারের জন্যে থামল, "তা হলে নানা জায়গায় আমার ডাক আসবে, আমি গাইতে যাব। তখন তুমি আমায় বাধা দিতে পারবে না। রাজী আছ কান্তি?"

কান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকের ভিতরটা তার হাপরের মতো ওঠা-পড়া করছে।

"তার মানে আমায় লাখোপতি হতে বলছ সুপ্রিয়া।"

"সে আমি জানি না। লাখোপতি কোটিপতির খবর তুমিই রাখবে। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমার এই খরচের দায় তোমায় নিতে হবে কান্তি। আমাকে শুধু নিজের ঘরে রাখতে পারবে না, বাইরেও ছেড়ে দিতে হবে। পারবে তো?"

এর চাইতে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান এমন নগ্ন ভাষায় আর করা চলে না। কান্তির একবারের জন্যে মনে হল, রুক্ষ, কর্কশ হাতে সে সুপ্রিয়ার মুখটা চেপে ধরে। তারপর আদিম যুগের বর্বর মানুষের মতো তাকে কেড়ে নিয়ে চলে যায় এখান থেকে।

সুপ্রিয়া শীতল হাসি হাসল। "তাই বলছিলাম কান্তি, কেন তুমি সম্পূর্ণ করে আমাকে চাও? তোমাকে যা দেবার আমি দিয়েছি। আর কেউ

যদি আমাকে নিয়েও যায়, তা হলেও তোমার যেটুকু পাওনা তা থেকে তুমি ঠকবে না। তাইতেই খুশী থাকো কান্তি। আমাকে সবটা পেতে গিয়ে কেন তুমি এত বড দায় তুলে নিতে চাও।"

কান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। পা দুটো পাথর হয়ে গেছে।

"তা হলে আগে বড়লোক হতে চেষ্টা করব। টাকার যোগ্যতা নিয়েই পৌঁছব তোমার কাছে।"

সুপ্রিয়া একবার তাকাল। শীতল কঠিন মুখের উপর একটুখানি সমবেদনার দীপ্তি ঝলকে গেল।

"টাকা জিনিসটাকে অত ছোট করে দেখো না কান্তি। দারিদ্র্যটা মানুষের গৌরব নয়, তার লজ্জা। অভাবের জ্বালায় মানুষ যখন রুখে দাঁড়ায়, তখন তার অর্থ এই নয় যে, সারা দুনিয়াকে তারা গরিব করে দেবে। সকলেরই বড়লোক হওয়ার দরকার আছে বলে কয়েকজন অতি-বড়লোকের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই।"

কান্তি শুনতে পাচ্ছিল না। চোখের সামনে কুয়াশার মতো কী খানিকটা ঘনিয়ে আসছে যেন।

সামনে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড। একখানা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল সুপ্রিয়া।

"সব চেয়ে বড কথা, আমি শিল্পী। যারা বলে অভাব আর দুঃখের মধ্যেই শিল্পের আসল বিকাশ, তারা মিথ্যে কথা রটায়, অক্ষমতার উপরে আত্মবঞ্চনার প্রলেপ এঁকে দেয়। কিন্তু কান্তি, আমি সেভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব না। আমাকে বড হতে হবে, আমাকে ভালো করে গান শিখতে হবে, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বিলাসিতা তার মধ্যে দিয়ে আমার মনকে জাগিয়ে রাখতে হবে। আমার অনেক টাকা চাই কান্তি, হাজার হাজার টাকা।"

"বুঝলাম।"

ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে পা বাড়িয়ে সুপ্রিয়া বললে, "তাই বলছি কান্তি, এসবে কী দরকার? আমার যেটুকু তোমায় দিয়েছি, তার সবটুকুই

তোমার, তার ভিতরে এতটুকু ফাঁকি নেই।" ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে বাইরে গলাটা একটু বাড়িয়ে উজ্জ্বল হাসি হাসল, "পাগলামি ছেড়ে দাও তুমি। বোর্ডিঙে ফিরে গিয়ে বেশ করে একটা ঘুম লাগাও আজ। তারপর কাল সকালে এসো আমাদের ওখানে। রবিবার আছে, চা খাব একসঙ্গে, গল্প করব অনেকক্ষণ।"

কান্তি জবাব দিল না।

ট্যাক্সির ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে কান্তির হাতে একটা চাপ দিলে সুপ্রিয়া। চমকে উঠল তারপরেই।

"জ্বর হয়েছে নাকি তোমার ?"

একটা ঠাণ্ডা সাপের ছোঁয়ায় যেন চমকে উঠল কান্তি। ঝট করে তিন পা সরে গিয়ে বলল, "না, কিছু না।" তারপরে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে।

সুপ্রিয়ার মনে হল, ওকে ফিরে ডাকা উচিত। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা অধৈর্যভাবে বললে, "কোথায় যাবেন ?"

নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "ভবানীপুর।"

তারাকুমার তর্করত্নের দৌহিত্র, কোন এক খুনীর ছেলে—যে-খুনীর ছদ্মনাম শান্তিভূষণ—উত্তরাধিকারসূত্রে সে দাদুর কাছ থেকে পেয়েছে পাড়াগাঁয়ে একখানা পুরনো দোতলা বাড়ি, একশো বিঘে ধানী জমি, একটা পুকুর, পোস্ট অফিসের বইতে সবসুদ্ধ বারোশো টাকা। মোটের ওপর বেঁচে থাকা চলে। কিন্তু হাজার টাকা—লক্ষ টাকা—

ম্যাট্রিক পর্যন্ত বিদ্যা, তাও পাশ করতে পারেনি। তবলায় আর গানে অনেকদিন আগে ওকে পি এইচ-ডি ডিগ্রি দিয়েছিল সুপ্রিয়া, কিন্তু কান্তি জানে, দেশের গুণীদের দরবারে এখনো তার পিছনের সারিতে বসবারও যোগ্যতা আসেনি। সেখানেও কেউ তাকে টাকার তোড়া নিয়ে ডেকে পাঠাবে না ঠাকুর ওঙ্কারনাথের মতো, হীরাবাঈ বরোদেকারের মতো, ওস্তাদ

বড়ে গোলাম আলী খাঁর মতো। রেশমী রুমাল বাঁধা মোহর তার পায়ের কাছে উড়ে পড়বে না রাজদরবার থেকে।

তা হলে কী করতে পারে কান্তিভূষণ ?

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো একটা বাসে উঠে বসে সে ভাবতে লাগল : কী করতে পারে ?

চুরি-ডাকাতি। বাটপাড়ি। খুন। আর-একটা কাজ পারে। আঠারো বছর বয়সে গঙ্গাযাত্রীদের কেউটের ফোকরভরা ঘরটার পাশে বসে যে-কথা সে ভেবেছিল। আত্মহত্যা করতে পারে।

জীবনে সেদিন যে-গ্রন্থিটুকু ছিল, আজ সেটা ছিঁড়ে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে। আজকে আর কোনো মোহ নেই। একটা কথাও ঠাট্টা করে বলেনি সুপ্রিয়া। বলেছে শীতল, কঠোর, নিষ্ঠুর ভাষায়। তার ভিতরে আত্মবঞ্চনার একটুকু রন্ধ্র নেই কোথাও।

"টিকেট ?"

কণ্ডাক্টরের গলা। লোহার বালাপরা একখানা প্রসারিত রোমশ হাত।

"কোথায় যাবে বাস ?"

"শ্যামবাজার।"

একটা এক টাকার নোট বের করে দিয়ে কান্তি বললে, "শ্যামবাজারের টিকেটই দাও।"

হাতে একটা টিকেট পড়ল, সেই সঙ্গে একরাশ খুচরো। কান্তি একসঙ্গে সবগুলো পকেটে ফেলল।

পাশে কাবুলীওলা বসেছে একজন। কালো জাব্বাজোব্বা থেকে হিংয়ের উৎকট গন্ধ। কান্তি বাইরে তাকিয়ে রইল। সারা শরীরে আগুন জলছে। কুয়াশা-মাখা চোখের সামনে কিছুই সে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোর ঝড় বয়ে চলেছে বাইরের পৃথিবীতে।

সেই সিনেমা হাউসটা। একবারের জন্যে তার পাশে এসে বাসটা দাঁড়াল।

নানা রঙের আলোয় মাদক আহ্বান। পথে, ফুটপাথে রবাহূত জনতা। য্যামপ্লিফায়ার থেকে তবলা-তরঙ্গ ঝরছে, দ্রুত লয়ে চলছে সিদ্ধ সাধকের হাত। মনে হচ্ছে রাজপুতানার পাথুরে পথ দিয়ে ছুটে চলেছে একদল সশস্ত্র ঘোড়সোয়ার। ঘোড়ার খুরে খুরে আগুন ঠিকরে পড়ছে।

কান্তি চোখ বুজল।

বাস আবার চলেছে। চোখের সামনে আলোর ঝড়। থেকে থেকে বাসটার থেমে দাঁড়ান। নানা রকমের মুখ। পাশ থেকে কখন নেমে গেছে কাবুলীওয়ালা। সামনের সীটে শ্যামলী একটি মেয়ে এসে বসেছে। ফাঁপানো বাবরি ধরনের চুল, তা থেকে লাইমজুসের মতো কী একটা গন্ধ।

কিন্তু এভাবেও আর বসে থাকা চলে না। শরীরে জ্বালার স্রোতটা সাপের বিষের মতো বয়ে যাচ্ছে। কোথায় চলেছে কান্তি? শ্যামবাজার? কেন যাবে? কী আছে সেখানে? কিসের আকর্ষণ?

কান্তি নেমে পড়ল। পা দুটো আর বইছে না। মনে পড়ে গেল গঙ্গা-যাত্রীদের ঘরের পাশে সেই অন্ধকার বিশাল বটগাছটা, যার তলায় এক টুকরো ছেঁড়া সিলকের কাপড়ের মতো সাপের খোলস উড়ছে। ওপারে একটা চিতা জ্বলছে, তারও পিছনে উদ্যত ভূতুড়ে হাতের মতো কলের গোটা দুই অন্ধকার চিমনি।

সেইখানে ফিরে যেতে পারলে হত। অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকা যেত ফাটলধরা ঠাণ্ডা ঘাটলাটার উপরে। তারপরে—

কিন্তু সে এখনো অনেক দূর। আজকে আর সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো ট্রেন নেই।

অতএব আবার সেই শেয়ালদার বোর্ডিং। ঠাণ্ডা বিছানা। ছারপোকার শরশয্যা। কালকের মতো আজও পাশের সীটের মোটা ভদ্রলোকের একটানা জান্তব নাকের ডাক। কিন্তু সেইখানেই ফিরে যেতে হবে।

রাস্তা পেরিয়ে কান্তি ওপারের ট্রামস্টপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা পোস্ট ধরে।

কতক্ষণ সময় গেল? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট? একখানাও গাড়ি আসছে না কেন?

পেছন থেকে কে আলগাভাবে স্পর্শ করলে তাকে। শীর্ণ, শীতল আঙুল। চকিত হয়ে কান্তি ফিরে তাকাল।

কালো একটি কদাকার মেয়ে। পরনে সস্তা ছিটের শাড়ি। চোখে কাজল। মুখে পাউডারের প্রলেপ। কোটরে বসা নিষ্প্রভ চোখের মধ্য থেকে কটাক্ষ বর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে, "আসবে?"

কান্তি তাকিয়ে রইল।

"এসো না।" মৃদু বিষণ্ণ মিনতি। আজকের সন্ধ্যাটা ওর ফাঁকাই গেছে খুব সম্ভব।

কান্তি তেমনি চেয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। পিছনে খোলার ঘরের সারি।

কী ভেবে কান্তি বললে, "বেশ, চলো।"

আসল কথা, সে আর দাঁড়াতে পারছে না। একটা কোথাও বসা দরকার, একটু জিরানো চাই। হাত-পা ভেঙে আসছে। কিন্তু তাই বলে এদের ঘরে? গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠা একটা অসহ্য ঘৃণার আবেগকে নিজের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত করে নিলে কান্তি। তার কিসের বিচার, কিসের সংকোচ? সে খুনী শান্তি-ভূষণের ছেলে। কান্তি আরো জানে, খুনী, শয়তান, সমাজের আবর্জনাদের জায়গা এদেরই ঘরে। পৃথিবীর যত পলাতক মানুষের এরাই ক্লেদাক্ত আশ্রয়।

মেয়েটি আবার চাপা ত্রস্ত গলায় বললে, "দেরি কোরো না, পুলিশ এসে পড়বে।"

একটা অন্ধকার নোংরা গলি দিয়ে, পায়ের তলায় জলকাদা মাড়িয়ে কান্তি খোলার ঘরে এসে ঢুকল। মেঝোতে একটা ময়লা বিছানা, ঘরে মিটমিট লণ্ঠনের আলো।

মেয়েটি বললে, "বোসো।"

আর একবার কান্তির শরীর শিরশিরিয়ে উঠল, আবার খানিকটা বমির

বেগ ঠেলে এল গলার কাছে। এক লাফে ছুটে যেতে চাইল বাইরে। কিন্তু পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। বিছানাটার উপরেই সে ধপ করে বসে পড়ল শেষ পর্যন্ত।

মেয়েটি এইবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল তাকে। কদাকার মুখে হেসে বললে, "কখনো এর আগে আসোনি—না ?"

"না।"

"নতুন যে সে বুঝতেই পারছি। বোসো, ভালো করে বোসো।"

বসা নয়, শুয়ে পড়া দরকার। মেরুদণ্ডটা যেন হাজার টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তবু কান্তি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"অমন করে চেয়ে আছ কেন ?" মেয়েটি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, "শরীর ভালো নেই তোমার ?"

"সে থাক। তুমি গান জানো ?"

"জানি কিছু কিছু। কিন্তু সে গান কি তোমার ভালো লাগবে ?"

পাশের ঘর থেকে মাতালের চিৎকার উঠল, একটি মেয়ে হেসে উঠল ডাকিনীর মতো খলখল গলায়। কান্তির দু হাতে কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করল।

"খুব ভালো লাগবে। তুমি গান শোনাও।"

বিছানার এক কোনায় ছোট একটা খেলো হার্মোনিয়ম। মেয়েটি সেই হার্মোনিয়ম নিয়ে বসল। খানিকটা উৎকট যান্ত্রিক আওয়াজ বেরুল কিছুক্ষণ, তারপর ভাঙা বেসুরো গলায় অমার্জিত উচ্চারণে মেয়েটি হিন্দী সিনেমার চটুল গান ধরল একখানা। আর সেই সঙ্গে হিন্দী ছবির নায়িকার মতোই কোটরে-বসা চোখের ভিতর দিয়ে কান্তির দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপের করুণ চেষ্টা করতে লাগল।

শুনতে শুনতে আবার কান্তির চোখ বুজে এল। চারদিকে একটা অবিচ্ছিন্ন শূন্যতা। শুধু আকাশ। সামনে, পিছনে, পায়ের নীচে। এই গান নয়, দীপেন বোস খেয়াল গাইছে। তার সুর যেন একরাশ জোনাকি হয়ে ঘিরে

ধরেছে তাকে। তার চারদিকে সুরের বিন্দু রূপ নিয়েছে আগুনের কণায়।
"ননদিয়া গাগরী ভরনে যাউ—"

মাঝপথেই গান বন্ধ করে আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি।

"ও টগরদি, ও টগরদি, শিগগির এসো। এ যে মুচ্ছো গেল গো! এ কী বিপদে পড়লাম। টগরদি—টগরদি—"

তিন

নাচ শেষ করে গীতা কাউর যখন পার্ক স্ট্রীটের বাসায় ফিরে এল, রাত তখন প্রায় দুটো।

চাকর এসে দরজা খুলে দিলে। শ্রান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে গীতা দেখল দীপেনের ঘরে আলো জলছে। গীতা আস্তে দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা ভেজানোই ছিল, খুলে গেল।

"তুমি তো এগারটায় ফিরেছ দীপেন। শোওনি এখনো?"

"ঘুম আসছে না।"

গীতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল। টেবিলে হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস।

"বসে বসে ড্রিঙ্ক করছিলে?"

"অল্প। আজ মাতাল হইনি, দেখছ তো? একটুখানি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। তাই সামান্য—"

গীতা বললে, "তুমি তো জান দীপেন, সামান্যও তোমার পক্ষে বিপজ্জনক। জেনে শুনে তবু কেন খাও?"

"কেন খাব না?"

"তোমার বেঁচে থাকার দরকার আছে বলে।"

দীপেন হেসে উঠল, "কার কাছে?"

"দেশের কাছে।"

"দেশ আমার কে? তার জন্যে জোর করে বেঁচে থাকতে হবে, এমন প্রতিশ্রুতি আমি দেইনি।"

গীতা নিজের ঘরে যাওয়ার কথা ভাবছিল, কিন্তু গেল না। বসে পড়ল সামনের চেয়ারটাতে। দীপেনের মুখোমুখি।

"তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে পারি দীপেন?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"তোমাদের এই ধরনের রোমান্স কবে কাটবে বলতে পারো?"

"কিসের রোমান্স?" গীতার গলার স্বরের রূঢ়তায় দীপেন ভুরু কোঁচকাল, "কী বলছ তুমি?"

"আজও তোমাদের সংস্কার, মদ খেয়ে লিভার পচাতে না পারলে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এখনো তোমরা মনে করো, বীভৎস রকম নেশা না করলে তোমাদের ইন্‌স্‌পিরেশন আসে না। অথচ এই মদের জন্যেই তোমরা ফুটতে না ফুটতে মরে যাও, আর নেশার ফাঁস পরিয়ে একটু একটু করে হত্যা করো নিজের শিল্পকে। ওমর খৈয়ামের স্বপ্নটা ছেড়ে দাও দীপেন, ওটা মধ্যযুগের ব্যাপার।"

দীপেন ব্যঙ্গের হাসি হাসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে, তারপর বললে, "মাঝরাতে তুমি কি আমাকে প্রহিবিশনের গুণগান শোনাতে এসেছ গীতা? লেকচার?"

"লেকচার নয় দীপেন। নিজেই ভেবে দেখ, এই মদের জন্যে কতগুলো প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছে দেশে।"

"আমিও না হয় মহাজনদের পথ ধরেই এগিয়ে চলব গীতা। সেইটেই কি ভালো নয়?"

"ওটা একটা চমৎকার ডায়লগ্‌ দীপেন, তার বেশী কিছু নয়। কথা দিয়ে অনেক ফাঁকিকে সাজিয়ে দেওয়া যায়, তাই বলেই তারা সত্য হয়ে ওঠে না। তুমি মদ ছেড়ে দাও। একান্ত ছাড়তে না পারো, একটা মাত্রা রাখ। 'সজনি

ভর্ সে পেয়ালা'র রোমান্স থাকতে পারে, কিন্তু বমির মধ্যে যখন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকো, তখন সে-দৃশ্য দেখে সজনী খুশী হয় না।"

"আজ তোমাকে ভারী উত্তেজিত মনে হচ্ছে গীতা।" দীপেন মুখের সিগারেটের ধোঁয়া রিং করতে লাগল, "খুব ভালো নেচে এসেছ বোধ হয়।"

"ঠাট্টা নয় দীপেন। তোমাকে মদ ছাড়তে হবে।"

"মদ ছেড়ে কী নিয়ে থাকব?"

"গান নিয়ে।"

"তা হলে গানের উৎসও আমার শুকিয়ে যাবে।"

"যাবে না দীপেন। তুমি তো জানো, শাস্ত্রে গানকে তপস্যা বলা হয়েছে। মাতলামি দিয়ে আর যাই হোক, তপস্যা হয় না। অমৃতসরে আমি এক গায়ককে দেখেছি। সোনার মন্দিরে তিনি গান গাইতেন, গাইতেন গুরু নানকের ভজন। কিছু মনে কোরো না, তোমাদের দেশের অনেক নামজাদা ওস্তাদ তাঁর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নন। কোনো নেশা, কোনো অসংযম তাঁকে স্পর্শ করেনি। প্রায় নব্বুই বছর বয়েসে তিনি মারা যান, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি বাইশ বছরের জোয়ান গলায় গান গেয়েছিলেন।"

"সকলে এক নয় গীতা।"

"খুব বেশী তফাতও নয় দীপেন। সংযম জিনিসটা একজনের আসে আর একজনের আসে না, এ-কথাটা অসংযমের সাফাই। তোমরা গানের জন্যে মদ খাও না, মদের তলায় তলিয়ে দিয়েছ গানটাকে।"

দীপেন আবার ভুরু কোঁচকাল। "তুমি নিজে এ-রসে বঞ্চিত, তাই বুঝতে পারছ না গীতা। যদি একবার—"

"একবার?" গীতা অদ্ভুত ধরনে হাসল, "একবার নয়, অনেকবারই আমি খেয়ে দেখেছি দীপেন। একটা সময় গেছে, যখন আমিও দিনের পর দিন নেশার মধ্যে ডুবে থেকেছি।"

"তুমি!" দীপেন সকৌতুকে বললে, "তোমারও চলত নাকি এ-সব? আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি বরাবরের গুড্ গার্ল।"

"গুড্ গার্ল!" গীতা শীর্ণভাবে হাসল, "তাই ছিলাম বটে এককালে। তখন লাহোরে আমার বাবা ব্যবসা করতেন, যখন প্রথম কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু তারপর বাঈজী হতে হল। স্কুলে নাচতে শিখেছিলাম, সেই নাচের মোড় ফিরল অন্যদিকে। তখন আর-এক অন্ধকারের জীবন। সে-অন্ধকারে তোমার মতো আমিও মদের বোতলকেই আঁকড়ে ধরেছিলাম।"

দীপেন আশ্চর্য হল: "হঠাৎ এ-পরিবর্তন কেন? কলেজ থেকে একেবারে বাঈজী?"

গীতার মুখের উপর ছায়া নামল, ঘন আর গাঢ় হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। জানলা দিয়ে একবাব বাইবে চেয়ে দেখল গীতা। রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড ম্যানসন-বাড়িটা বাত্রির সমুদ্রে একখানা জাহাজের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথার উপরে আকাশে একটা তারাও নেই, স্তরে স্তরে মেঘ এসে জমেছে সেখানে।

গীতা বললে, "সে আরো অনেকের মতো পুরনো গল্প দীপেন। দাঙ্গা বাধল, রক্তের পিচকারি ছুটল লাহোরের রাস্তায়। সেই রক্ত মেখে জানোয়ারের দল নেচে বেড়াতে লাগল। বাবাকে খুন করল রাস্তায়, মা-কে আমাদের চোখের সামনে বীভৎসভাবে টুকরো টুকরো করলো। তারপর আমাদের দু বোনকে চুল ধরে টেনে একটা ভ্যানে উঠিয়ে নিলে।"

গীতা একটু চুপ করল, মৃদু গলায় আবার বলতে আরম্ভ করল, "ফিরে এলাম দেড় বছর পরে, পাকিস্তান হয়ে গেলে। পালিয়ে এলাম। এই দেড বছর কীভাবে কেটেছে সে আর বলে লাভ নেই। ভ্যানে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হওয়ার পরে আমার বোনকে আর দেখতে পাইনি, দেড় বছরে কোনো সন্ধানও পাইনি তার। একাই ভেসে এলাম অমৃতসরে। সরকারী আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেখান থেকে আর-একজন চোস্ত সাহেবী চেহারার ইংরেজী-ওলা লোক বিয়ে করবে বলে এনে ভিড়িয়ে দিলে বাঈজীর আখড়ায়।"

দীপেনের সিগারেট আঙুলের পাশে এসে জলছিল। জানালা গলিয়ে সেটা বাইরে ছুঁড়ে দিলে। গীতা বলে চলল, "কিন্তু তার মধ্যে তখন আর বিশেষ কিছু গ্লানি ছিল না দীপেন। চূড়ান্ত অপমানে জলে গিয়েছিলাম অনেক আগেই, দ্বিধা খুব বেশী ছিল না আর। এতদিন জানতাম, ধুলোতেই পড়ে আছি; এখন দেখলাম আমার পায়ের ধুলোয় লুটিয়ে পড়বার জন্যেও অনেকে আছে। নাচতে জানতাম, আরো ভালো করে শিখলাম। শিখলাম, কেমন করে মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়, কেমন করে বুনো জানোয়ারদের কুকুরের মতো বশ করা চলে। যারা আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আমি বুঝেছিলাম এখন আমার চোখের দিকে তাকানোর শক্তিও আর তাদের নেই।"

দীপেন আস্তে আস্তে বললে, "আই য়্যাম অ-ফুলি সরি গীতা।"

"তুমি দুঃখিত হয়ে কী করবে দীপেন।" গীতা হাসল, "সেদিন নিজের সম্পর্কেও বোধ হয় কোনো দুঃখের চেতনা আমার ছিল না। তবু এক একদিন পুরনো স্মৃতিটা জেগে উঠত। মনে পড়ত: গুরুদ্বারে গান হচ্ছে, বাবা বসে আছেন চুপ করে, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দেখতে পেতাম, বিকালবেলা আমাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট লনটিতে আমি আর আমার বোন ব্যাডমিণ্টন খেলছি। আর মনে পড়ত আমাদের কলেজ: গেট পেরিয়ে লাল সুরকির পথ, দুধারে রাশি রাশি ফুল—আর, আর আমাদের ইংরেজীর জুনিয়র প্রফেসার সোহনলালকে। কতদিন দেখেছি, দোতলার স্টাফরুম থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সোহনলাল, আমি কখন কলেজে আসব তাই দেখবার জন্যে।"

দীপেন আর-একবার হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়িয়েই সরিয়ে নিলে। বললে, "তুমি তাঁকে ভালোবাসতে?"

"ষোল বছরের মনের খবর ঠিক জানি না দীপেন, বোধ হয় বাসতাম। তিনি যে বাসতেন, তাতে একটুকু সন্দেহ নেই। হয়তো পরে আমাদের বিয়েও হয়ে যেত।"

গীতা থামল। আকাশে কালো মেঘ। রাত্রির সমুদ্রে নোঙর-ফেলা জাহাজের মতো বিরাট ম্যানশনটা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে।

দীপেন বললে, "সোহনলাল বেঁচে আছেন ?"

"আছেন। দিল্লী কিংবা আগ্রার কোনো কলেজে প্রফেসর তিনি।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলে ?"

"তাঁকে দুঃখ দেবার জন্যে ?" গীতা বললে, "তিনি তো কোনো অন্যায় করেননি, মিথ্যে তাঁকে দণ্ড দেব কেন ? সে যাক, যা বলছিলাম তাই বলি। বাঈজী-জীবনের এক-একটা অবসরে যেদিন এ-সব কথা মনে পড়ত, মনে পড়ত সোহনলালকে, সেদিন নিয়ে বসতাম মদের বোতল। যতক্ষণ না জ্ঞান হারিয়েছি, ততক্ষণ ছাড়িনি। কিন্তু কী লাভ হল দীপেন ? যাকে ভুলতে চেয়েছি, মদ খেলে দেখেছি আরো বেশী করে তাকে মনে পড়ে। যে-যন্ত্রণা এমনিতে অস্পষ্ট হয়ে থাকে, সেটা টনটনিয়ে ওটে অসহ্যভাবে। আর নেশা কেটে গেলে আরো কয়েক ঘণ্টা অবসাদের মধ্যে সেই স্মৃতিটাই বিষের মতো জ্বলে অথচ শরীরে মনে কোথাও এমন এতটুকু উদ্যম থাকে না যে তাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দিই।"

দীপেন গীতার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটো ঝাপসা, জল এসেছে অল্প অল্প। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই গীতা বলে চলল, "মদ ছেড়ে দিলাম। ফিরে এলাম অনেকখানি স্বাভাবিক জীবনে। নাচকে জাতে তুললাম, শিখলাম ভরতনাট্যম্। নাম আমার ছড়িয়ে পড়ল, তোমরা আমাকে চিনলে। অবশ্য গীতা কাউরকেই চিনলে, কলেজের খাতায় যে-নাম ছিল, সে নামে নয়।"

"গীতা তোমার আসল নাম নয় ?"

"না। কিন্তু আগের নামটাই তো এখন নকল, সে-পরিচয় তো আমার কোথাও নেই। তবু আমি আর এখন এতটুকুও দুঃখ করি না দীপেন। জীবনে যে-পথ দিয়েই তুমি যাও, সেখানেই তোমার কিছু না কিছু করবার আছে। মাটিতে অনেক পোড়ো জমি থাকতে পারে দীপেন, কিন্তু জীবনে নেই ; ইচ্ছে করলে সব জায়গাতেই তুমি ফুল ফোটাতে পারো, ফল ধরাতে

পারো। তুমি মাঝে মাঝে বলো, যা চেয়েছিলে পাওনি, তাই তোমাকে এমনি করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে। কিন্তু তোমার চাইতেও মদের মধ্যে ডুবে যাওয়ার অনেক বেশী অধিকার আমার ছিল। তবু আমি দেখেছি, কিছুই ফুরয় না, কিছুই শেষ হয় না। যে-কোনোদিন তুমি আরম্ভ করতে পারো, যে-কোনো জায়গা থেকেই আরম্ভ করতে পারো। আমি শিল্পী, আমি আলাদা—এমনি কতগুলো গালভারী কথা বলে আত্মহত্যার মধ্যে হয়তো কিছু রোমান্স থাকতে পারে, কিন্তু ওগুলো ভারী খেলো জিনিস। মরার চাইতেও যে বেঁচে থাকাটা অনেক বড় আর্ট, সেইটে প্রমাণ করাই যে-কোনো শিল্পীর সবচাইতে মহৎ কাজ।"

গীতা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সালোয়ারের ওড়নায় মুছে ফেলল চোখ দুটো। "চার বছর আগে তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছিল দীপেন। কখনো কখনো ভাবি, হয়তো ভালোও বেসে ফেলেছি। কিন্তু আমি যখন মরে গিয়েও বেঁচে উঠতে চাই, তখন তোমরা বেঁচে থেকেও মরে যেতে চাও। আর এই জন্যেও ভারী ঘৃণা হয় তোমাদের উপরে। জীবনেব দাম যে দিতে জানে না—সে আর্টিস্টই নয়।"

গীতা এবার ঘড়ির দিকে তাকাল। অপ্রতিভ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

"ছিঃ—ছিঃ—এ যে রাত প্রায় তিনটে বাজে! নিজেও শুইনি, তোমাকেও শুতে দিলাম না। হ্যাভ্ এ গুড্ রেস্ট্। আর, প্লীজ, ওই মদের বোতল-টোতলগুলো এখন সরাও সামনে থেকে।"

গীতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল দীপেন, আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল। গীতা কি সত্যি কথা বললে, না আর-একটা গল্প বানিয়ে বলে গেল এতক্ষণ?

বাইরে কালো আকাশে গুরগুর করে মেঘ ডাকল। এখনি বৃষ্টি আসবে। দীপেন আবার মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়েও সরিয়ে নিলে। গীতার কাহিনী শুনেছে এতক্ষণ, উপদেশও শুনেছে, কিন্তু মনের ভিতরে তারা যে গভীর করে কোথাও আঁচড় কেটেছে তা নয়। এই নিথর রাত্রে গীতাকে

কাছে পেয়ে তার ভালো লাগছিল গল্প শুনতে। কিন্তু গল্প গল্পই। তার কতকটা জীবন থেকে নকল করা, কতকটা জীবনের ফাঁকা ঘর পূরণ করা। ওগুলো শুনে নেবার জন্যে, মেনে নেবার জন্যে নয়। মানতে গেলে তার জন্যে অনেক ভালো লোকের আরো অনেক ভালো ভালো কথাই আছে, সেজন্যে গীতা কাউরকে কোনো দরকার নেই।

তবু দীপেন বোস জানলা দিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে রইল। নিথর জাহাজের মতো কালো বাড়িটার উপর দিয়ে লাল বিদ্যুৎ চমকে গেল, আর আবার তার মনে পড়ল সুপ্রিয়াকে।

চার

রেবা জল খেতে উঠেছিল। তার মনে হল বারান্দায় কার ছায়া নড়ছে।

"কে ওখানে ?"

"আমি সুপ্রিয়া।"

"এত রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেন রে ?"

"হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম আসছে না। তাই অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছি একটু।"

শিরশিরে ঠাণ্ডা। গায়ে আঁচল টেনে বেরিয়ে এল রেবা। আকাশে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। সেই দিকে তাকিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রিয়া।

রেবা পাশে এসে দাঁড়াল। বিদ্যুতের আলোয় দুটো জ্যোতির্ময় চোখের মতো সুপ্রিয়ার চশমা ঝলকে উঠল আর-একবার।

"কী হয়েছে তোর ?"

"কিছু হয়নি। বললাম তো, ঘুম আসছে না।"

একটু চুপ করে থেকে রেবা বললে, "রোগটা নতুন। এর আগে কখনো

দেখিনি। কাল পর্যন্তও একবার ঘুমুলে ঢাক না বাজিয়ে তোকে জাগানো যেত না।"

সুপ্রিয়া ক্ষীণ রেখায় হাসল। "দিন বদলায়। মনও। কালকে আমি যা ছিলাম আজ তা নাও থাকতে পারি। কিন্তু তাকিয়ে ছাখ ভাই, কী সুন্দর মেঘ জমেছে আকাশে। মেঘরাগ গাইতে ইচ্ছে করছে আমার। বিশাল ঐরাবতে চড়ে আসছেন মেঘরাগ, পিছনে রাগিণীরা চলেছে সার বেঁধে, কেউ মাথার ওপরে ধরেছে চামরছত্র—"

রেবা বাধা দিলে, "মেঘরাগের কথা থাক। কিন্তু তোর কোন্ রাগ সেইটে বল।"

"আমি ?" সুপ্রিয়া আবার হাসল, "আমি বোধ হয় সোহিনী। ঝিলমিল করছে অষ্টমীর জ্যোৎস্না। ছলছল করছে জল—"

"এই রাত তিনটের সময় উঠে তুই কাব্য করছিস নাকি ?"

"সত্যি বলছি ভাই, দীপেনবাবু নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন আজ। কী গানই গাইলেন! মনে হল, নটরাজের ডমরু শুনতে পেলাম, দেখতে পেলাম তাঁর পায়ের নীচে সুরের সমুদ্রে তুফান উঠেছে। আর ভালো লাগছে না ভাই।"

"ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছ থেকে কিছুই পাসনি ?"

"উনি কেবল মগ্ন করে রাখেন, দোলা দিতে পারেন না। উনি যোগমগ্ন শঙ্করের সাধনা করেন। কিন্তু আমি তাঁর লাস্যরূপকে চাই, চাই তাঁর তাণ্ডবকে। এতে আমার মন ভরছে না।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ চলে যেতে হবে। বহুত দূর যা-না হায় ভেইয়া, বহুত দূর যা-না হায়—"

রেবা গম্ভীর হয়ে গেল। একটা সুস্পষ্ট বিরক্তিতে ভরে উঠল মন।

"তুই কি সত্যিই যেতে চাস নাকি ?"

"অন্তত এই মুহূর্তে তাই তো মনে হচ্ছে। সত্যি বলছি তোকে, আমি ঘরছাড়ার বাঁশি শুনেছি।"

"লোকে কী বলবে ?"

সুপ্রিয়া সহজ গলায় বললে, "খুব খারাপ বলবে, অন্তত তোর মুখে তাই শুনেছি। তবে সেজন্যে এর আগেও আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, এখনো নেই।"

"মা-বাবা—আমরা ?"

"তোরা হয়তো পরে আর আমার মুখদর্শন করবি না। কিন্তু যদি গীতলক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাই, তোদের মুখ আমি উজ্জ্বল করে তুলব, এ-গ্যারান্টি দিচ্ছি। আর সে আমি পারব, সে বিশ্বাস আমার আছে।"

সুপ্রিয়া গুনগুনিয়ে একটা গানের কলি ধরেছিল। থেমে বললে, "এর পরে অনেক স্পষ্ট কথাই হয়তো বলবে অনেকে, অনেক নিন্দা, অনেক ধিক্কার শুনতে হবে দিনের পর দিন। তোকে দিয়েই সেটা শুরু হোক, আমার আপত্তি নেই।"

রেবা রাগ করে বললে, "শেষ রাতে এই ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কাব্যচর্চা করতে আমার উৎসাহ হচ্ছে না। আমি শুধু একটা কথা বলব। অতীশকে অত করে নাচানোর কী দরকার ছিল চার বছর ধরে ?"

কথাটা কঠিন আর নিষ্ঠুর। সুপ্রিয়া আঘাত পেল। বললে, "আমি তাকে নাচাইনি।"

"নাচাসনি ? যদি বিয়ে না-ই করবি তবে এতদিন কেন আশা দিয়ে রেখেছিলি তাকে ?"

"বিয়ে করবার কথা তো কোনোদিন ভাবিনি। তাকে ভালোবেসেছি এই পর্যন্ত।"

"যাকে ভালোবেসেছিস, তাকেই বিয়ে করবি, এই তো স্বাভাবিক।"

ঝিরঝির করে মৃদু ছন্দে বৃষ্টি পড়ছে, যেন সেতারের ঝঙ্কার বেজে চলেছে। বৃষ্টির দিকে চোখ মেলে দিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "স্বাভাবিক কথাটা রিলেটিভ। যা আমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না—তাকে আমি স্বাভাবিক বলে মানব কী করে ? আমি অতীশকে ভালোবেসেছি, কান্তিকে ভালোবেসেছি, আরো অনেককে ভালো লেগেছে। দেখেছি, আমার অনেক আছে, অনেককে দিয়েও

তা ফুরয় না। তোকে একটা সত্যি কথা বলি। আমার মনের ভেতরে শুধু একজনের সিংহাসন নেই, আমি সেখানে আম-দরবার বিছিয়ে রেখেছি। সেখানে কারো স্থানাভাব ঘটবে না। কাউকে ভালোবাসব রূপের জন্যে, কাউকে গুণের জন্যে, কাউকে বিদ্যার জন্যে—"

"থাক—থাক।" রেবার ধৈর্যচ্যুতি হল, "যদি একজনের মধ্যেই সব পাওয়া যায়?"

"তা হলে সবই তাকে তুলে দেব। কিন্তু জীবনে সে-সুযোগ কখনো যে আসবে এমন ভরসা তো হয় না ভাই। এ-রকম তিলোত্তম মানুষ কবির কল্পনায় থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবে মেলে না। এক-একজন এক-একটা পারফেকশনের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে, কিন্তু সবগুলো এক সঙ্গে মিলিয়ে কাউকেই পাওয়া যায় না।"

"তা হলে তুই বিয়ে করবি কাকে?"

"আমার গানকে। আমি তাকেই ডাক দিয়ে বলব:

লহো লহো তুলে লহ নীরব বীণাখানি,
তোমার নন্দন-নিকুঞ্জ হতে
সুর দেহ তায় আনি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর—"

বাধা দিয়ে রেবা তীক্ষ্ণ গলায় বললে, "আর অতীশ?"

"তাকে আমি কখনো ঠকাইনি। বলেছি, গানের ডাক যখনি আসবে, তখনই আমার ছুটি। সেইটুকু সে মেনে নিয়েছিল অনেক আগেই। তাই আমি যখন চলে যাব, তখন সেই যাওয়াটাকে অতীশই নিতে পারবে সবচাইতে সহজে।"

রেবার আরো বেশী শীত করছিল। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে রেবা বললে, "তুই কি ভাবছিস, মানুষের মনের সামনে একটা গণ্ডি টেনে দিয়ে বলা চলে, আর এগোতে হবে না, ব্যাস, এইখানেই থাক? অতীশ কত বড় দুঃখ পাবে সে-কথা বুঝতে পারছিস তুই?"

সুপ্রিয়া বললে, "দুঃখ যদি পায়, সে দায়িত্ব তারই। আমি তাকে কখনো ভুল বোঝবার সুযোগ দিইনি। আজ কান্তিকেও আমার বিশ্রী রকমের আঘাত দিতে হয়েছে।" সুপ্রিয়ার স্বর বিষণ্ণ হয়ে এল, "বেচারার বোধ হয় জ্বর এসেছিল, তার মধ্যেই একরাশ অপ্রীতিকর কথা শোনাতে হল তাকে। কী করব, কোনো উপায় ছিল না আমার। আজ এতক্ষণ কান্তির মুখটাই মনে পড়ছিল আমার। তাই কাল যেটা তোকে হালকাভাবে বলেছিলাম, আজ সেটাকেই সত্য করে নেবার কথা ভাবছি। কান্তির জন্যে দুঃখ হচ্ছে, অতীশ জড়িয়ে ফেলছে আমাকে। সম্পূর্ণ বাঁধা পড়বার আগে সেইজন্যেই আমাকে ছুটে পালাতে হবে।"

বৃষ্টিটা নেমেছে জোরালো হয়ে। বারান্দায় জলের ছাঁট আসছে। রেবা রেলিঙের কাছ থেকে সরে এসে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "তোর কপালে বিস্তর দুঃখ আছে, তুই মরবি।"

"মরব ?" সুপ্রিয়া হাসল, "মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব। সত্যি, অতীশকে কার হাতে দিয়ে যাই ? তুই নিবি ?"

রেবা দরজায় পা দিয়েছিল। সেখান থেকে একটা অগ্নিদৃষ্টি ফেলে বললে, "চেষ্টা করব।" তারপরেই ভিতরে ঢুকে দুম করে বন্ধ করে দিলে দরজাটা।

সেই ঠাণ্ডার মধ্যে, সেই বৃষ্টি পড়া দেখতে দেখতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল সুপ্রিয়া। আরো অনেকক্ষণ। কান্তি একটা কাঁটা রেখে গেছে বুকের ভিতর। ওর জন্যে মায়া হয়। কিন্তু কষ্টটা বোধ হয় হবে অতীশের জন্যেই। এক-একটা সন্ধ্যায় যখন কার্জন পার্কে পাশাপাশি বসতে ইচ্ছে করবে তখন অতীশ ছাড়া কে সঙ্গ দেবে আর ? দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে হাতে হাত রেখে বালি ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থাকা, একটা চলন্ত ট্রেনের এক ঝলক আলোয় মনটাকে অকারণে দুলিয়ে দেওয়া, তখন অতীশকে ছাড়া কী করে চলবে সুপ্রিয়ার ?

কিন্তু আপাতত বাইরে এই বৃষ্টি। আকাশজোড়া বীণা বাজছে মেঘরাগে,

তার উপরে বিদ্যুতের আঙুল নেচে নেচে চলেছে, সমস্ত পৃথিবী এখন স্বপ্নমূর্ছিত। এর মধ্যে কোথায় অতীশ? এই সুর সে কোথায় পাবে?

এ দিতে পারে দীপেন। আর পারে সেই সব সঙ্গীতগুরুর দল, ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে যাঁরা অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। অতীশ পারে না।

"কিরে, কতক্ষণ ঘুমাবি আর?"

কাল রাতেই রেবা ভেবেছিল সুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবে। শেষের রসিকতাটা অনেকক্ষণ ধরে তার সারা গায়ে যেন বিছুটির জ্বালার মতো জ্বলছিল। শুধু কথা বন্ধও নয়, সাতদিন মুখদর্শন উচিত নয় ওর।

অতীশকে কি সত্যিই নিতে পারে না রেবা? এতই কি শক্ত কাজটা? রেবার মনে হয়েছিল সেও দেখবে একবার চেষ্টা করে, হিংসের জ্বালা ধরিয়ে দেবে সুপ্রিয়ার বুকে। অতীশ হয়তো সুলভ নয়, তাই বলে একান্তই কি দুর্লভ? প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে একবার নেমে দেখলে কেমন হয়?

কিন্তু রেবা সুপ্রিয়া নয়। আগুন নিয়ে খেলা করতে তার উৎসাহ হয় না। মনের দিক থেকেও সে রক্ষণশীল। বিয়ের ব্যাপারটা বাবার দায়িত্ব, তার নয়। যেখানে যাবে, নিজের মতো করে গড়ে নেবে ঘর। স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, সেবা দিয়ে। অতীশের বোঝা সে বইতে পারবে না। তার স্বামী একদিন অন্য কাউকে ভালোবেসেছিল, এটা কিছুতেই কোনোমতেই সইতে পারবে না রেবা। সে যাকে পাবে, তার কাছে সে-ই প্রথম প্রেম, প্রথম আবিষ্কার, প্রথম পদ্ম আর প্রথম সূর্যোদয়।

অতীশের কথা থাক। কিন্তু কী আশ্চর্য মেয়ে সুপ্রিয়া!

বেলা নটা পর্যন্ত চটে বসে ছিল রেবা, কিন্তু তারপরে আর পারল না। নিজের প্রকাণ্ড সেতারটা নিয়ে অনেকক্ষণ যা খুশি বাজাল, অমিয় মজুমদার বার কয়েক ভ্রূকুটি করে নেমে গেলেন নীচে। পড়ুয়া ছোট ভাইটি এসে সকাতরে জানাল, "কী করছিস ছোট্‌দি, পড়তে দিবি না?"

"কেন রে! এত চমৎকার বাজাচ্ছি, তোর তো আরো বেশী কন্‌সেন্‌ট্রেশন আসা উচিত।"

"সত্যি বলছি, একটু থাম। কানে তালা ধরে গেল।"

"তালা ধরে গেল!" রেবা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "বেরসিক ভূত! রবিবার অত পড়া কিসের রে? যা না, কোথাও মর্নিং শো-তে সিনেমা দেখে আয়। রাতদিন পড়ে পড়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছিস, চোখ দুটো প্রায় অন্ধ হওয়ার জো। কী হবে অমন যাচ্ছেতাই ভাবে পড়াশোনা করে?"

এবার মিনতি শোনা গেল, "ছোট্‌দি—"

"বেরো এখান থেকে।" রেবা চিৎকার করে বললে, "তোর যেমন পড়া, আমার তেমন রেওয়াজ। তুই রাতদিন ঘ্যানর ঘ্যানর করে পড়বি, অথচ আমি একটুখানি সেতার নিয়ে বসতে পারব না, আবদার নাকি? দূর হ বলছি—"

কিন্তু এত গোলমালেও সুপ্রিয়ার ঘুম ভাঙল না।

বাজিয়ে বাজিয়ে আঙুল যখন শেষ পর্যন্ত টনটন করতে লাগল, তখন সেতার ছাড়ল রেবা। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখনো কেন ঘুম থেকে উঠছে না সুপ্রিয়া? সকাল অবধিই কি দাঁড়িয়ে ছিল নাকি বারান্দায়?

রেবা এসে দরজায় ধাক্কা দিলে। খিল দেওয়া ছিল না, খুলে গেল। একটা চাদরে বুক পযন্ত ঢেকে মুখের উপর একখানা হাত রেখে ঘুমুচ্ছে সুপ্রিয়া। বালিশের উপর দিয়ে মেঘের মত চুল নেমে এসেছে অনেকখানি।

কিছুক্ষণ ক্লান্ত ঘুমন্ত সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে রেবা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এত শান্ত, এত কোমল মেয়েটার রূপ। মনে হয়, যেন চেলি-চন্দনে সেজে বিয়ের পিঁড়িতে বসবার জন্যেই জন্মেছে। চাদরের ফাঁক দিয়ে একটা পায়ের পাতা বেরিয়ে এসেছে। যেখান দিয়ে হেঁটে যাবে, লক্ষ্মীর পায়ের লেখা আঁকা পড়বে সেখানে। তবু কেন মনটা ওর এমনি অশান্ত? যখন হাতের কাছে অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অর্ঘ্য এসে পড়েছে, তখন কিসের জন্যে ছুটে যেতে চাইছে আলেয়ার সন্ধানে?

"কিরে, তুই কি এ বেলা আর উঠবি না ঘুম থেকে?"

সুপ্রিয়া চোখ মেলল।

"সারা রাতই কি বাইরে ঠাণ্ডার মধ্যে ছিলি কাল?"

সুপ্রিয়া উঠে বসল। চোখ কচলাল দু হাতে।

"বেলা কটা এখন?"

"দশটা।

"দশটা!" বিদ্যুৎ-চমকের মতো সুপ্রিয়ার একটা কথা মনে পড়ল, "কান্তি আসেনি?"

"না, কেউ আসেনি।"

সুপ্রিয়া চিন্তিত গলায় বললে, "কিন্তু আসা তো উচিত ছিল। আমি চা খেতে ডেকেছিলাম ওকে।"

এতক্ষণ মনের মধ্যে একটা করুণা সঞ্চারিত হচ্ছিল রেবার, কিন্তু সুপ্রিয়ার কথা শোনবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেটা। তিক্ত বিরক্তিতে রেবা দপ করে জ্বলে উঠল।

"রাস্তায় অপমান করে বাড়িতে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করলে কোনো ভদ্রলোক আসে না।"

রেবা বেরিয়ে গেল। সুপ্রিয়া আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল বিছানার উপরে। আজ বিকলে একবার খোঁজ নিতে হবে কান্তির। শেয়ালদার কাছে একটা বোর্ডিঙে এর আগে আরো দু-তিনবার সে উঠেছে, সুপ্রিয়া তার ঠিকানাটা জানে। আর একবার খবর নিতে হবে অতীশেরও। দু-দিন অতীশ দুর্গাশঙ্করের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসেছে, নিশ্চয় রাগ করেছে সে।

কাল রাত নটার পর অতীশ যে খোঁজ করতে এসেছিল, বিরক্তিতে সে-কথাটা বলতে ভুলেই গিয়েছিল রেবা।

সারাটা দিন একটা মানসিক অস্থিরতা নিয়ে সুপ্রিয়া কান্তির জন্যে অপেক্ষা

করল। রেবা প্রায় অসহযোগ করে আছে, ভালো করে কথাবার্তাই হল না তার সঙ্গে।

শুধু কান্তির জন্যে নয়। অতীশের জন্যে আরো খারাপ লাগছে।

"আমি তো তোমার কাছে বেশী কিছু চাই না সুপ্রিয়া।" অতীশ বলেছিল।

"চেয়ো না। যদি জোর করে চাও, যেটুকু আছে তাকেই ফাঁপিয়ে দিতে হবে জলমেশানো দুধের মতো। তাতে করে তোমাকেও ঠকানো হবে, আমি নিজেও শান্তি পাব না।"

ট্রাম-লাইনের তেলতেলে কালো ঘাসগুলোর দিকে চোখ রেখে অতীশ বলেছিল, "জানি। তবু যে-কদিন কাছে আছো, একটুখানি চোখের দেখা দেখতে দিয়ো। তোমাকে সারাদিন একবার দেখতে পেলেও আমি কাজ করবার দ্বিগুণ উৎসাহ পাব।"

"আর যখন আমি থাকব না?"

"তখনকার কথা তখন ভাবব, এখন নয়। তুমি যেন সেই ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন থেকে অদর্শনের রিহার্সাল দিতে শুরু কোরো না। সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

কিন্তু কথা রাখেনি সুপ্রিয়া। আজ দু-দিন অতীশ তার দেখা পায়নি। নিজের ভিতরে একটা অপরাধবোধ পীড়ন করছে তাকে। যদি গান না থাকত, যদি গীতময় ভারতবর্ষ এমনি করে সহস্র বাহু বাড়িয়ে তাকে হাতছানি না দিত, তাহলে জীবনের নিশ্চিত পরিণাম সে পেয়েছিল বইকি অতীশের মধ্যে। অতীশের বুকের ভিতরে মাথা গুঁজে সুপ্রিয়া বলতে পারত, আমি ধন্য, আর আমার চাইবার মতো কিছুই নেই।

অতীশ ভালোবাসে, কান্তিও ভালোবাসে। কিন্তু কান্তি খালি আশ্রয় চায় তার কাছে। নিজের ক্ষত নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে তার কাছে আসে সান্ত্বনার জন্যে। আর অতীশ আসে আশ্রয় দিতে। তার চোখের দিকে তাকালে

সুপ্রিয়ার মনে হয়, প্রেম নয় আরো গভীর, আরো শান্ত সমুদ্রবিশাল স্নেহ সেখানে পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে ; তার মধ্যে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তলিয়ে যেতে পারে সুপ্রিয়া।

আজ বিকেলে খোঁজ নিতে হবে। দু-জনেরই।

সারাটা দুপুর প্রায় ছটফট করে কাটল। বিকেলে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় অমিয় মজুমদার ডাকলেন।

"কিরে চলেছিস কোথায় ?"

মুখের সামনে যে মিথ্যেটা বেরিয়ে এল, সেইটেকেই অবলীলাক্রমে বলে ফেলল সুপ্রিয়া।

"একটা চায়ের নেমন্তন্ন আছে। সেখানেই যাব।"

"ফিরবি কখন ?"

"একটু দেরি হবে। গানের ব্যাপারও আছে।"

"সেকি কথা !" অমিয়বাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, "জলসায় যাবি না ?"

"সময় পেলে চলে যাব ওখান থেকে। দেরি হলে বাড়িতে ফিরে আসব।"

অমিয় মজুমদার বিস্ময়বোধ করলেন। গান-পাগলা মেয়েটার এত বড় জলসা সম্পর্কে এমন উদাসীনতা তাঁর কেমন অশোভন বোধ হতে লাগল। মনে হল, সুপ্রিয়া কাজটা ঠিক করছে না।

সুপ্রিয়া বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "আমি সময় পেলেই ওখানে চলে যাব কাকা।"

কিন্তু তার কান্তির কাছে যাওয়া হল না, অতীশের কাছেও না। তার আগেই একটা কালো মোটর পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল সামনে। দীপেন বোস।

"কোথায় চলেছ ?"

"একটা কাজে।"

"ওঠ গাড়িতে।"

"গাড়িতে আবার কেন ?"

"তোমায় লিফ্‌ট দেব।"

"আমি এমনিতেই যেতে পারব। আপনি বরং বাড়িতে যান, কাকার সঙ্গে দেখা করুন।"

"কাকার সঙ্গে তো দেখা করতে আসিনি—" দীপেন বোস হাসল, "এসেছি তোমার কাছেই। তোমাকেই আমার দরকার ছিল। পেয়ে গেছি যখন, আর ভাবনা নেই। উঠে পড়ো—"

"কিন্তু—"

দীপেন বোস আর বলতে দিলে না। গাড়ির দরজা খুলে বললে, "উঠে পড়ো।"

কাল রাত্রের সেই সম্রাট। জ্যোতির্লোকের সিংহাসনে স্বমহিমায় সমাসীন। গানের সুরে সুরে নটরাজ জেগে উঠছেন, আকাশে ঘন কালো মেঘে মেঘে উঠছে তার বিপুল নাচের মৃদঙ্গ-ধ্বনি। সুপ্রিয়া সম্রাটের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারল না, উঠে বসল গাড়িতেই।

কান্তি নয়, অতীশ নয়, দীপেন ছাড়া আর কেউ নয়। ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে অনেকক্ষণ আর অনেক মাইল গাড়ি চালাল দীপেন। অনেক কথার গুঞ্জন বাজল সুপ্রিয়ার কানে। তারপরে সন্ধ্যা হলে চৌরঙ্গির একটা হোটেল। দীপেনের হাতে হুইস্কির গ্লাস। আর একটা অরেঞ্জ স্কোয়াস সামনে নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইল সুপ্রিয়া। রক্তে ঝড় তুলে ওয়ালজ-রুম্বা ফক্‌স্‌ট্রটের উল্লাস চলতে লাগল।

রাত নটার সময় অমিয় মজুমদার দেখলেন তাঁর পাশে এসে বসেছে সুপ্রিয়া। আর মাইক্রোফোন গম্ভীর গলায় ঘোষণা করছে, 'লখনউয়ের দীপেন বসু এইবার আপনাদের কাছে ঠুংরি পরিবেশন করছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছেন ওস্তাদ দ্বারিক দাস। ইনি প্রথমে গাইছেন—"

চতুর্থ অধ্যায়

এক

'ডি-এসসি হয়ে গেল আপনার?" প্রসন্ন মুখে শ্যামলাল বললে, "কাগজে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য লোক আপনি, কিছুই তো বলেননি এতদিন। দিব্যি চেপে রেখেছিলেন সব।"

দাড়ি কামাতে কামাতে অতীশ বললে, "ব্যাপারটা এমন প্রলয়ঙ্কর কোনো কীর্তি নয় যে, ঢাকে ঢোলে ঘোষণা করতে হবে। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো থেকে প্রত্যেক বছরই কয়েক ডজন করে ডি-এসসি হয়ে বেরিয়ে আসে।"

"আপনি কোনো জিনিসকেই সিরিয়াসলি নেন না।" শ্যামলাল ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, "আমরা হলে—"

"আপনিও হবেন।" অতীশ সান্ত্বনা দিলে।

শ্যামলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "কই আর হয়। বি-এসসির আগে কম খেটেছি? বললে, বিশ্বাস করবেন না, উনিশ থেকে কুড়ি ঘণ্টা পড়তাম ডেলি। তবু ও একটা মাঝারি সেকেণ্ড ক্লাশ, তার বেশি কিছু হল না।"

"এম-এসসিতে পুষিয়ে নেবেন।"

"চেষ্টা তো করছি। কিন্তু কী জানেন—" শ্যামলাল গলার স্বরটা অন্তরঙ্গতায় নামিয়ে আনল, "শুধু পড়ে হয় না। আরো কতগুলো সিক্রেট কোথাও আছে নিশ্চয়। সেগুলো বুঝতে পারলে কাজ হত।"

মুখের উপর সাবানের ফেনার এক বিপুল স্ফীতি তৈরি করে আধবোজা চোখে অতীশ বললে, "লুব্রিকেশন পেপার।"

"লুব্রিকেশন পেপার!" শ্যামলাল আশ্চর্য হয়ে বললে, "কোনো স্পেশাল পেপার বুঝি? কই, কথনো জানতাম না তো। কেমিস্ট্রিতে?"

অতীশ বললে, "উঁহু, ইউনিভার্সাল।"

শ্যামলাল হাঁ করে রইল, "বুঝতে পারলাম না।"

"বুঝতে পারলেন না?" ফেনার স্তূপের মধ্যে ক্ষুর বসিয়ে অতীশ বললে, "তেল মশাই, তেল।"

"অ—ঠাট্টা করছিলেন।" শ্যামলাল ব্যাজার হয়ে বললে, "শ্যামলাল ঘটক ও-সব তেল-ফেলের মধ্যে নেই। পাশ করি, ফেল করি, নিজের জোরেই করব। আমার যদি চেষ্টা থাকে, কেন আমি ফার্স্ট ক্লাস পাব না, বলুন।"

"নিশ্চয়। এরই নাম পুরুষকার।"

শ্যামলাল চিন্তিত মুখে বসে রইল খানিকক্ষণ। বললে, "আপনার আর ভাবনা কী, বেশ কাজ গুছিয়ে নিলেন। ফার্স্ট ক্লাস, তায় ডি-এসসি, এর পর মোটা মাইনের চাকরি।" একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস পড়ল, "আমি যদি ফিজিক্সের ছাত্র হতাম, ভারী সুবিধে হত তাহলে। আপনার নোট-টোটগুলো পাওয়া যেত।"

এ-ক্ষেত্রে সহানুভূতি জানিয়ে লাভ নেই। অতীশ এক মনে জুলপির তলা চাঁচতে লাগল।

বাইরে একটা দেওয়াল-ঘড়ি টং টং করে উঠল।

শ্যামলাল চমকে বললে, "এই যাঃ, সাতটা! আমাকে যে এক্ষুনি বেরুতে হবে।"

"সে কী মশাই! পড়া ছেড়ে?"

শ্যামলাল বললে, "বা-রে আপনিই তো টিউশন জুটিয়ে দিলেন। পড়াতে হবে না?"

"ওঃ—বালিগঞ্জ প্লেসে?" অতীশ একবার কৌতুকভরা চোখ তুলে তাকাল, "তা কালও একবার সেখানে গিয়েছিলেন না? উইকে তিন দিন পড়ানোর কথা ছিল, আপনি তো দেখছি রোজই পড়াচ্ছেন আজকাল।"

কথা নেই বার্তা নেই, ফরসা শ্যামলাল লাল হয়ে গেল হঠাৎ।

অতীশ ছোট্ট করে খোঁচা দিল আর একটা, "মাইনেও কিছু পাচ্ছেন তো ?"

"ইয়ে—" শ্যামলাল ঢোক গিলল, "না, তা ঠিক নয়। মানে ওর টেস্ট আসছে কিনা—"

"ওর কার ? মন্দিরার ?"

শ্যামলাল আবার একটা ঢোক গিলে বলল, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—মন্দিরার। মানে, ওর টেস্টের আর দেরি নেই কিনা—"

সরস গলায় অতীশ বললে, "ও। তা পড়ছে কেমন ?"

"মেয়েটি বেশ ইন্‌টেলিজেণ্ট।" শ্যামলালকে কেমন স্নিগ্ধ মনে হল, "কখনো কখনো এমন এক-একটা কোশ্চেন করে যে আমি রীতিমত অবাক হয়ে যাই।"

"খুব ভালো।"

শ্যামলাল হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল, "সাতটা পাঁচ। নাঃ—আর দেরি করা উচিত নয়।"

ভাঙা কাপের মধ্যে বুরুশটা ধুতে ধুতে আড়চোখে অতীশ লক্ষ্য করতে লাগল। ব্র্যাকেট্ থেকে একটা পাঞ্জাবি পরে নিল শ্যামলাল, সেটা আদ্দির। এর আগে ওকে বালিশের ওয়াড়ের মতো মোটা লংক্লথের জামা ছাড়া পরতে দেখা যায়নি। জামা পরে আরো মিনিট তিনেক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও চুলটাকে কায়দা করতে চেষ্টা করল। এ অভ্যাসও ওর কখনো ছিল না। অতীশ লক্ষ্য করে দেখল, শ্যামলাল পণ্ডশ্রম করছে। বিধাতা বাম, খাড়া খাড়া চুলগুলো হাজার চেষ্টাতেও বাগ মানানোর নয়।

তারপর সবচাইতে আশ্চর্য কাণ্ডটা করল শ্যামলাল। জুতোটা সশব্দে বার কয়েক ব্রাশ করে নিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

অতীশ নিজের বিছানায় এসে বসল। সমস্ত লক্ষণই নির্ভুলভাবে মিলে

যাচ্ছে, কোথাও কোনো গোলমাল নেই। মন্দিরা নামটা এখন তার কাছে গোপন কথার মতো, সহজে উচ্চারণ করতে চায় না, বলে "ও"। টিউশনের আগ্রহটা দিনের পর দিন শ্যামলালের পক্ষ থেকেই বেড়ে চলেছে, নিজের পড়ার সময়টা অর্ধেক খরচ হচ্ছে মন্দিরার জন্যে। আর—সব চাইতে বড় কথা, পড়াশুনোয় মন্দিরা ইন্‌টেলিজেণ্ট এটা বলবার জন্যে অনেকখানি গুণমুগ্ধ হওয়া দরকার, ঠিক সাধারণ বুদ্ধির কাজ নয়। তা ছাড়া আদ্দির পাঞ্জাবি, মাথায় চুল, এরা তো সব আছেই।

অতীশ হাসল। লক্ষণ পরিষ্কার। হুবহু মিলে যাচ্ছে সব দিক থেকে।

এর নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্রনাথ থাকলে বলতেন। কিংবা আনাতোল্‌ ফ্রাঁস। সেই 'থেইয়ের' গল্পটা। ওপাশের দেওয়ালে যত্ন করে খানতিনেক ছবি টাঙিয়ে রেখেছে শ্যামলাল। একখানা সরস্বতীর, একখানা স্বনামধন্য চিরকুমার রাসায়নিকের, আর একখানা পৃথিবীবিখ্যাত সেবাব্রতী সন্ন্যাসীর। এই ত্রিমূর্তিই কিছুদিন পর্যন্ত উপাস্য ছিল শ্যামলালের। এখন অবশ্য চতুর্থজনের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু তার ছবি শ্যামলাল দেওয়ালে টাঙায়নি, টাঙিয়েছে নিজের বুকের মধ্যে।

সুতরাং ছাদ আর ঘুঁটের ঘরটা আপাতত বেকার। অবশ্য অতীশ ইচ্ছে করলে জায়গা নিতে পারে সেখানে।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারবে তো শ্যামলাল? মল্লিক সাহেবের নজরটা একটু উপর দিকে, তার সম্পর্কে কিছুটা প্রশ্রয় সত্ত্বেও তিনি যে ডি-এসসি পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন, তা অতীশ জানে। তাঁর ছেলে, তাঁর জামাই, তাঁর বন্ধুবান্ধব সব কিছু নিয়ে স্বভাবতই মল্লিক সাহেব একটু ঊর্ধ্বচারী। শুরুই করেন শ-পাঁচেক ফুট ওপর থেকে।

"বুঝলে অতীশ, কাল রোটারি ক্লাবে আমার বক্তৃতা ছিল। ইট্‌ ও'জ্‌ এ ব্রিলিয়াণ্ট য়্যাটেনডেন্‌স্‌। আমার সাবজেক্ট ছিল, সোস্যালিজম্‌—দি ইউটোপিয়া। দারুণ অ্যাপ্রিসিয়েশন হল।"

অতীশকে বলতে হয়, "আজ্ঞে সে তো হবেই।"

"ব্বাই দি ওয়ে, শশাঙ্কের চিঠি এসেছে। আরে—শশাঙ্ক, আমার বড় জামাই! এখন ইউনেস্কোতে রয়েছে। মাইনেটা অবশ্য মন্দ দেয় না, তবু আমার মনে হয়, ওর ক্যালিবারের ছেলের আরো ঢের উন্নতি করা উচিত ছিল।"

শশাঙ্ক ইউনেস্কোতে কত বড় চাকরি করে, কত টাকাই বা সে মাইনে পায় এবং কোন্ অসাধারণ ক্যালিবার নিয়ে উন্নতির কোন চরম শিখরে সে উঠতে পারত, এ-সব না জেনেও অতীশ মাথা নাড়েঃ "ঠিকই বলেছেন।"

"শুভেন লিখেছে, লণ্ডনে এবার খুব শীত পড়েছে। আরে বাপু, লণ্ডনে কম শীত পড়ে কবে? আমি যতবার গেছি—প্রত্যেকবারেই শীতের চোটে মনে হয়েছে, মাই গড্—ইটস্ হেল্। নতুন গেছে কি না, তাই ওর আরো বেশী খারাপ লাগছে।" মৃদু মন্দ হাসেন মল্লিক সাহেব।

অতীশ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয়, "ঠিক বলেছেন।"

"যাই বলো, ফলের রস খেতে গেলে স্ট্র-বেরির। এখানে যে-সব ফ্রুট পাওয়া যায়—"

তারা যে কোনো কাজেরই নয়, অতীশকে সে-কথা অনেকবার স্বীকার করতে হয়েছে।

সেইখানেই মাথা গলিয়েছে শ্যামলাল। জীবনে যে মেয়েদের দিকে চোখ তুলে চায়নি, কেউ সামনে এসে এক-আধটা কথা কইলে যে একগলা ঘেমে উঠেছে, সে গিয়ে পড়েছে এমন বাড়িতে, যেখানে ছেলেমেয়ের মেলামেশা দিনের আলোর মতো সহজ। সে-আলোয় চোখে ধাঁধা লেগেছে শ্যামলালের, আর পত্রপাঠ মন্দিরার প্রেমে পড়েছে।

ডি-এসসি হওয়ার পরে অতীশ যেখানে কিছু কৌলীন্য পেয়েছে, তা ছাড়া দূর আত্মীয়তার সূত্রে ছেলেবেলা থেকে আসা-যাওয়া করলেও আজো যেখানে অতীশ অন্তরঙ্গ হতে পারল না ভালো করে, সেখানে, এই খাড়া চুলের ভালো ছেলে শ্যামলাল? দন্তস্ফুট করতে পারবে?

তা ছাড়া মন্দিরা। অতীশ যদি ভুল বুঝে না থাকে, তা হলে বছর খানেক ধরে মন্দিরার চোখে যে-আলো সে দেখছে, তা কি আবার নতুন করে জ্বলবে শ্যামলালের জন্যে? সুপ্রিয়া যদি না থাকত—

অতীশ চকিত হয়ে উঠল। সুপ্রিয়া যদি না থাকত। কিন্তু সুপ্রিয়া তো থেকেও নেই। সেই সকলকে না জানিয়ে চলে যাওয়ার পরে মাস তিনেক আগে মাত্র টুকরো চিঠি এসেছিল তার।

"খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। দেখা করবার সময় ছিল না। রাগ কোরো না। কবে কলকাতা ফিরব জানি না। যেদিন ফিরব, সেদিন আমার প্রথম গান শোনাব তোমাকেই।"

সেই প্রথম গান শোনবার আশাতেই কি বসে থাকবে অতীশ? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর?

মল্লিক সাহেব হয়তো এইবারে রাজী হয়ে যেতেন। হয়তো মন্দিরাকে পেলে জীবনে সেই সহজ দিকটা অন্তত আসত, যেখানে নিজের দৈনন্দিনতাকে নিয়ে বিব্রত হতে হয় না। কিন্তু সেখানে সে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়েছে শ্যামলালকে। দাঁড় করিয়েছে নিজের হাতেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো ধোপে টিকবে না। কিন্তু শ্যামলালের চোখের সেই অসহ্য জ্বালাটার আঁচ যেন এরই মধ্যে এসে গায়ে লাগল অতীশের।

ওকে বোধ হয় সাবধান করে দেওয়া উচিত।

দেরি হয়ে গেল নাকি? অতীশের নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। আরো কিছুদিন পরে সুপ্রিয়াকে একটুখানি ভুলে যেতে পারলে হয়তো মন্দিরাকে বিয়ে করাও অসম্ভব নয় তার। কিন্তু সে যদি বিয়ে না-ও করে, তা হলেই কি কোনো আশা আছে শ্যামলালের? ধরা যাক, মন্দিরার চোখের আলোও হয়তো বদলাবে। কিন্তু মল্লিক সাহেব?

মল্লিক সাহেব শ্যামলালের জুতোটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। সেটা মচমচ করছিল।

ছোট্ট একটা নমস্কার জানিয়ে শ্যামলাল পড়ার ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, মল্লিক সাহেব ডাকলেন, "ওহে, শোনো।"

শ্যামলাল থমকে দাঁড়াল। এই মানুষটি সম্পর্কে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক আছে তার। এই চার মাসে বার চারেক কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে এবং প্রত্যেকবারই সে চেষ্টা করেছে কত তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারে তাঁর সামনে থেকে।

মল্লিক সাহেব খবরের কাগজটা ভাঁজ করে সামনের টেবিলে রাখলেন।

"আজ তোমার এ-বেলা আসবার কথা ছিল নাকি?"

"ইয়ে—" শ্যামলাল ঘামতে লাগল, "কাল অবশ্য—"

"বুঝেছি, বলে গিয়েছিলে। কিন্তু বেবি তো নেই। গেছে দমদম এয়ারপোর্টে। কাল রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছিল, ওঁর এক মাসিমা আসছেন আমেরিকা থেকে, তাঁর স্বামী সেখানে এমব্যাসিতে কাজ করেন। বেবি তাঁকে রিসিভ করতে গেছে।"

পাংশু-মুখে শ্যামলাল বললে, "আচ্ছা, আমি তা হলে চলি।"

"বোসো না, এত ব্যস্ত কেন? একটু গল্প করা যাক।"

শ্যামলাল চলে যেতে পারল না। নিরুপায়ভাবে সসংকোচে মল্লিক সাহেবের মুখোমুখি বসে পড়ল।

"তোমাদের দেশ কোথায়?"

"আগে ঢাকায় ছিল," শীর্ণ স্বরে শ্যামলাল বললে, "এখন পুরুলিয়ায়।"

"ওঃ! সেখানে কী করেন তোমার বাবা?"

"গালার ব্যবসা।"

"শেল্যাক? সীড্‌ল্যাক? মন্দ নয়। কত হয় বছরে?"

"আজ্ঞে আমি ঠিক বলতে পারব না।"

"খালি বুক-ওয়ার্ম, না? কজন ভাইবোন তোমরা?"

শ্যামলাল বললে, "আজ্ঞে দশ।"

"মাই গড্! দশ! ওয়ান-টেন্‌থ অব কুরুবংশ!"

প্রায় মাটিতে মিশে গেল শ্যামলাল। মল্লিক সাহেবের ঘৃণাভরা দৃষ্টির

সামনে তার মনে হল, তার গালার ব্যবসায়ী বাপের মতন এমন একটা অশালীন লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

মল্লিক সাহেব বললেন, "তোমার বাবা যত টাকাই রোজগার করুন, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" তাঁর অভিজ্ঞ চোখ আর একবার ঘুরে গেল শ্যামলালের মচমচ-করা জুতোর উপর, তার ছোট ছোট খাড়া খাড়া চুলে, মধ্যবিত্ত পরিবারের অযত্নপালিত মুখের উপর।

শ্যামলালের বুক কাঁপতে লাগল। মল্লিক সাহেবের চোখজোড়া যেন 'এক্স-রে'র মতো দেখছে তাকে। শুধু উপরের দিকটাই নয়, একেবারে তার অস্থি-মাংস ভেদ করে চলেছে।

"ইণ্ডিয়ায় গালা ইণ্ডাস্ট্রীর ভবিষ্যৎ কি রকম বলে তোমার মনে হয়?"—হঠাৎ একটা অর্থ নৈতিক প্রশ্ন করে বসলেন মল্লিক সাহেব।

"আজ্ঞে, আমি ঠিক—"

"ঠিক বুঝতে পারো না—না?"—মল্লিক সাহেব বিতৃষ্ণাভরে তাকালেন: "অথচ ইয়োর ফাদার ইজ ল্যাক ট্রেডার। আর তোমরাই গড়বে দেশের ভবিষ্যৎ! স্ট্রেঞ্জ!"

শ্যামলালের কপাল বেয়ে ঘাম নামতে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কাঁপা গলায় বললে, "আজ আমি আসি।"

"ইয়েস—ইউ মে।"

পথে বেরিয়ে নিজের উপর কেমন একটা অশ্রদ্ধা হল শ্যামলালের। গালা সম্বন্ধে সে যে বিশেষ কিছু জানে না—কেবল সেজন্যেই নয়; তার গালার ব্যবসায়ী বাবা, যিনি ন-হাতী কাপড় পরেন এবং হুঁকোয় করে তামাক খান, যাঁর নামে ইংরেজী চিঠি এলে অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়; তার ভাইবোনের দল, যারা সকালবেলা মুড়ি দিয়ে জিলিপি খায় আর তার লাল শাড়ি পরা মা, যিনি বছরে একবার সিনেমা দেখেন কি দেখেন না আর ভাদ্রমাসে থালা বোঝাই করে তালের বড়া ভাজেন, তাদের সকলের উপর একটা তিক্ত বিদ্বেষে শ্যামলালের মন কালো হয়ে উঠল।

গোড়া থেকেই সব ভুল হয়ে গেছে। আবার আরম্ভ করতে হবে নতুনভাবে। কিন্তু পন্থাটা জানা নেই। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যামলাল। প্রকাণ্ড আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। নিজেকে যেন বিশ্রী একটা ক্যারিকেচারের মতো দেখাতে লাগল এবার।

স্কুলে পড়া না পেরে জীবনে একবার মাত্র কেঁদেছিল শ্যামলাল। আজকে তেমনিভাবে হঠাৎ তার কান্না পেতে লাগল।

দুই

"তুই কী করে বেড়াচ্ছিস বাবা? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

রুক্ষ নিষ্ঠুর গলায় কান্তি বললে, "সব তোমার না বুঝলেও চলবে মা। আমি যা করছি, করতে দাও।"

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ইন্দুমতী শিউরে উঠলেন। অদ্ভুত দেখাচ্ছে কান্তির চোখ। বন্য একটা উগ্রতা দপদপ করছে সেখানে, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে, কয়েকটা সর্পিল রেখার কুঞ্চন পড়েছে কপালে।

মা-র বুকের ভিতরে ধ্বক করে উঠল। একটা হাতুড়ি দিয়ে কে যেন ঘা মারল সেখানে। তিনি যেন দেখতে পেলেন শান্তিভূষণকে, যে শান্তিভূষণ স্কুলের নিরীহ মাস্টার নয়, তাঁর নিরুত্তাপ প্রায় নির্বাক স্বামীও নয়; যে শান্তিভূষণ খুনী, দু হাতে মানুষের রক্ত মেখে যে পালিয়ে এসেছিল।

মা-র মুখে যেন বোবা ধরল। গোঙানির মতো আওয়াজ বেরুল একটা।

"কান্তি!"

"আমি এক্ষুনি কলকাতায় যাচ্ছি।"

"এই তিন মাস ধরে তুই পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিস কলকাতায়। মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে যাচ্ছিস—"

"আমি তবলা শেখাই ওখানে।"

"কিন্তু বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে—"

"দরকার পড়লেই নিতে হয়—" কান্তি বেরিয়ে চলে গেল।

কী আর করতে পারেন মা? জীবনে অনেক কান্নাই কেঁদেছেন, শেষ কান্না হয়তো বাকী আছে এখনো। প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছে কান্তি। উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল চেহারা, ভালো করে কথা বলে না, কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে, চিৎকার করে বীভৎসভাবে। চরম আঘাতও হেনেছে একদিন।

"কে তোমার ছেলে? কার জন্যে কাঁদছ? আমি খুনীর ছেলে, গোখরোর বাচ্ছা। এ তো তুমি জানতেই যে, আমিও একদিন ছোবল মারব। কেন বড় করে তুলেছিলে? কেন বিষ খাওয়াওনি ছেলেবেলাতেই, কেন আঁতুড়েই মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলতে পারোনি?"

সেদিন সারারাত মা জেগে বসে ছিলেন যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে। আর টের পেযেছিলেন কান্তিও ঘুমোয়নি, তাঁব মতো অস্থিরভাবে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে সেও।

আজকেও মা নিথর হয়েই বসে রইলেন। অতীতটা ধূসর, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই অন্ধকার বেয়ে কোথায যে নেমে যাচ্ছে কান্তি, তা তিনি জানেন না। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন উঠোনের দিকে, দেখতে লাগলেন পেয়ারা গাছটার তলায় কখন পডেছে একটা মরা পাখির ছানা, তাকে ঘিরে ধরেছে একদল লাল পিঁপডে।

সামনে কডাইতে চাপানো তরকারিটা পুড়ে কালো হয়ে গেল।

আর কান্তি প্রায় ছুটে এল স্টেশনে, এক মিনিট দেরি হলেই গাড়ি ফেল হত।

বেলা এগারোটার গাডি। ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড় নেই, একটা লম্বা শূন্যপ্রায় কামরার এক কোণে কাঠে হেলান দিয়ে বসল। চলন্ত গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তিনটে দীর্ঘ মাসও যেন ছুটে যেতে লাগল।

সেই মেয়েটা। তার নাম আঙুর।

রাস্তায় টেনে ফেলে দিতে পারত, দেয়নি। উলটে মাথায় জল দিয়েছে, পাখা করেছে সারারাত। ভোরবেলা যখন জ্বরটা ছেড়ে গেল তার, উঠে বসতে পারল, তখন তার মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছে। এ কোথায় সে, কার বিছানায়? কে এই কালো কদাকার মেয়েটা, বিড়িতে পোড়া পুরু পুরু ঠোঁট নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছে, "কে গা তুমি? আচ্ছা বিপদেই যা-হোক ফেলেছিলে আমাকে। চা খাবে?"

চা কান্তি খায়নি, খাওয়ার প্রবৃত্তিও ছিল না। কিন্তু মনে পড়েছে কাল-রাতের কথা, সুপ্রিয়ার নিষ্ঠুর শীতল হাসি: "অনেক টাকা দরকার আমার। সে তুমি কোথায় পাবে কান্তি? তার চাইতে—"

কান্তি উঠে পড়েছে। মনিব্যাগ খুলে যা পেয়েছে ছুড়ে দিয়েছে মেয়েটার বিছানার উপরে। টলতে টলতে চলে এসেছে বাইরে, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়েছে, ফিরে এসেছে বোর্ডিঙে।

দুটো দিন পড়ে থেকেছে নিজের ঘরে। খতিয়ে দেখেছে নিজেকে। ফুরিয়ে গেছে কান্তিভূষণ, আর তার কিছুই করবার নেই। আট বছর আগে যা পেরে ওঠেনি, এইবারে তার সে-কাজ করবার সময় এসেছে।

গ্রামে ফিরে এল। দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন ইন্দুমতী।

"আজ সাতদিন তোর খবর নেই, আমি কেঁদে মরি। কী করছিলি তুই? একি চেহারা হয়েছে তোর?"

"জ্বর হয়েছিল।" সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে কান্তি।

আবার সেই গঙ্গার ধার। সেই কালো রাত্রি। সেই পুরনো ঘরটা, যেখানে অসংখ্য গঙ্গাযাত্রী মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ঘড়ঘড়ে গলায় শ্বাস টেনেছে। সেই ভুতুড়ে বটগাছ, কেউটের গর্ত, আর ওপারে দুটো চিতা জ্বলছিল পাশাপাশি।

তবু এবারেও হল না। বেঁচে থাকাও এমন একটা অভ্যাস যে কিছুতেই তার উপরে সহজে ছেদ টেনে দেওয়া যায় না। খানিক পরে কান্তির মনে হল,

আশে পাশে দু-একটা কী যেন বটের ঝরাপাতার উপর নড়ে বেড়াচ্ছে। বুকের ভিতর ভয়ের একটা বরফঠাণ্ডা হাত যেন বাড়িয়ে দিলে কেউ, কান্তিভূষণ পালিয়ে এল।

পরের দিন বিকালের ট্রেনে সে এল কলকাতায়।

মনে পড়ল, একজন তার অপরিচ্ছন্ন বিছানায় সারারাত তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, পাখার বাতাস করেছিল মাথায়, হাত বুলিয়ে দিয়েছিল আস্তে আস্তে। সে-ও আর একটি মেয়ে। বেশি টাকা সে চায় না, তার দাবি সামান্যই। তারই কাছে অবারিত দরজা মাতালের জন্যে, লম্পটের জন্যে, খুনীর জন্যে, খুনীর সন্তানের জন্যে।

কান্তিভূষণ সেইখানেই এসে দাঁড়াল।

সন্ধ্যার মুখে আরো অনেক ছিল আশে পাশে। রঙিন শাড়ি, পুরু পাউডারের প্রসাধন, জীবন্ত প্রেতিনীর একদল বিগ্রহ। এক রকম তীক্ষ্ণ হাসি, এক কর্কশ কণ্ঠস্বর।

"কিগো—কাকে চাই?"

"আঙুরকে।"

"ওলো আঙুর—তোর লোক এসেছে—"

একটু আশ্চয হয়ে এগিয়ে এল আঙুর। তারপরেই চমকে উঠল। চিনতে পেরেছে দেখবামাত্র।

"তুমি!"

"হ্যাঁ, আবার আসতে হল। কিন্তু ভয় নেই, এবার জর নিয়ে আসিনি।"

আঙুর হেসে বললে, "এসো।"

সেই ঘর, সেই ময়লা বিছানা, সেই ক্লেদাক্ত পরিবেশ। কিন্তু আজ কান্তি মন স্থির করেই এসেছিল।

"তোমার গান শুনতে এলাম।"

"আমার আর গান। আমি কি গাইতে পারি?"

"বেশ পারো। তুমি গান গাও, আমি সঙ্গত করব। বাঁয়া-তবলা আছে?"

আঙুর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখল কান্তিকে। বললে, "এনে দিচ্ছি।"

পাশের ঘর থেকে বাঁয়া-তবলা নিয়ে এল আঙুর।

বেসুরো গানের সঙ্গে সাধ্যমত বাজাচ্ছিল কান্তি, এমন সময় দোর-গোড়ায় কালো চোয়াড়ে লোকটা এসে দাঁড়াল। গলায় রুমাল বাঁধা, ঘাড়টা প্রায় চাঁদির কাছ পর্যন্ত ছাঁটা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল খানিকক্ষণ। গান নয়, তবলা। মাথা নাড়তে লাগল সমঝদারের মত। তারপর গানটা শেষ হলে বলল, "করছ কী ওস্তাদ? এমন বিদ্যে খরচ করছ ওই পেত্নীর গানের সঙ্গে ঠেকো দিয়ে?"

আঙুর বিশ্রী ভাষায় তাকে গাল দিয়ে উঠল।

অতিরিক্ত পান খাওয়া এক রাশ লাল দাঁত বের করে বুনো জন্তুর মতো হাসল লোকটা: "আমার ওপর চটো আর যাই করো, আমি সাফ কথা বলব। ওহে ওস্তাদ, একবারটি বাইরে এসো তো দেখি।"

লোকটার নাম জগু। বাজে কথা সত্যিই বলে না, কাজের লোক।

"বাজাতে চাও তো চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"তোমার জায়গা মাফিক। নামদার বাঈজী আছে, ভালো সঙ্গতী ..য়। মোটা মাইনে দেবে। যাবে?"

"কত মাইনে দেবে?"

"সে তোমার খুশী করার ওপরে। ভাবনা নেই দাদা, গুণী লোক আমি চিনি। তুমি ঠিক কাজ বাগিয়ে নিতে পারবে। যদি চাও তো চলো আমার সঙ্গে।"

কান্তি বেরিয়ে পড়ল তখনি। তার সব সমান। তবে বাজাতে হলে একটু সমঝদারের জায়গাই ভালো।

বাঈজীর নাম মুনিয়া। অদ্ভুত ছোট এক গলির ভিতরে অদ্ভুত এক প্রকাণ্ড বাড়ির দোতলায় দেখা পাওয়া গেল তার।

কাশ্মীরী কার্পেটে মোড়া মেঝে। ভেলভেটের তাকিয়া ছড়ানো চারিদিকে।

একরাশ বাজনা, ঘুঙুর ইতস্তত। পরনে দামী বেনারসী শাড়ি। গা-ভরা গয়না, চোখে সুর্মা, ঠোঁটে পানের রঙ, নাকে জলজলে হীরার ফুল। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বাটা থেকে রুপোর তবকে মোড়া পান খাচ্ছিল।

"মুনিয়া বাঈ, সঙ্গতী খুঁজছিলে, এই এনে দিলাম।"

পানের রসে রাঙানো ঠোঁট আর নাকে হীরের ফুলপরা বাঈজী কালো তরল চোখ তুলে তাকাল। মোহিনী হাসি দেখা দিল মুখে। মধু-ছড়ানো গলায় সম্ভাষণ করলে, "নমস্তে।"

সন্দেহ নেই, বাঈজী রূপসী। বয়েস ত্রিশ পেরিয়ে ভাঁটার টান ধরলেও এখনও প্রখর। কান্তি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"বৈঠিয়ে।"

আবার সেই মধুমাখা সম্ভাষণ। ছড়ানো পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে ভব্য হয়ে বসল বাঈজী। একটা তাকিয়া ঠেলে দিয়ে বললে, "বৈঠিয়ে বাবুজী।"

কান্তি বসল। ঘরের তীব্র উজ্জ্বল আলোয় চোখ যেন জ্বলে যেতে লাগল। উগ্র আতরের গন্ধ এসে ক্লোরোফর্মের মতো সারা শরীরে ঘোর ছড়িয়ে দিতে লাগল তার।

"পান ?"

বাটাটা এগিয়ে এল।

"পান আমি খাই না।"

"মিঠা সরবত ?"

"না।

"বীয়ার ?"

"না।"

"তবে চা আনাই ? মশলা-দেওয়া চা ?"

"আমার কিছুই দরকার নেই।"

জগু বললে, "বাবু ভদ্দরলোক, ইয়ার নয়। তুমি সঙ্গতী চেয়েছিলে, তাই এনেছি। আদর-যত্ন পরে হবে বাঈ, এখন একটু বাজিয়ে দেখে নাও।"

বাঈজী আবার মধুবৃষ্টি করে হাসল, "বহুত অচ্ছা বাত।"

একটু পরেই তৈরি হয়ে এল বাঈজী। পরে এল পেশোয়াজ, পায়ে ঘুঙুর। কোথা থেকে এসে দেখা দিল সারেঙ্গিওয়ালা। জগু আড়ষ্ট নিষ্প্রাণ কান্তির কাঁধে চাপ দিলে একটা।

"লেগে যাও ওস্তাদ। মওকা মিল্ গিয়া।"

তবলা বাঁয়া টেনে নিলে কান্তি।

ঘুঙুরের ঝঙ্কার উঠল। বাঈজীর তিরিশ-পেরুনো শরীর হঠাৎ যেন সাপের মতো লিকলিকে হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একরাশ বিদ্যুৎ খেলতে লাগল ঘরের মধ্যে। সোনার কাজ-করা লাল পেশোয়াজ ঘুরতে লাগল আগুনের চাকার মতো। থেকে থেকে "আহা" "আহা" করে উঠতে লাগল সারেঙ্গিওয়ালা। ঘুঙুরের ঝঙ্কার, আগুনের ঘূর্ণি, বিদ্যুতের ঝলক আর দমকে দমকে ছড়িয়ে-পড়া তীব্র আতরের গন্ধ যেন কান্তির রক্তের মধ্যে এক-একটা করে তীরের মতো ছুটে যেতে লাগল। দুটো হাত বাঁয়া-তবলার উপর নেচে চলল ঝড়ের তালে।

পেশোয়াজের ঘূর্ণি থামিয়ে বাঈজী বললে, "সাবাস।"

সারেঙ্গিওয়ালা মাথা নাড়ল : "হাঁ—হাত বহুত মিঠা হ্যায় ইনকো।"

কান্তি বাহাল হল। এখন মুনিয়া বাঈজীর সঙ্গতী সে।

চোখ মেলে তাকাল কান্তি। ট্রেন লিলুয়া ছেড়েছে। মুনিয়া বাঈজীর সঙ্গতী সে এখন। এর চাইতে ভালো পরিণাম কী আর হতে পারে তার? সমাজের কাছে এর চাইতে কতটুকু বেশী মর্যাদা পেতে পারে খুনী শান্তিভূষণের ছেলে?

মদ এখনো ধরেনি কান্তি, এখনো হার মানতে পারেনি ততখানি। তবু কখনো কখনো, মুনিয়া বাঈজীর নাচের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর যখন আগুনের কণা ঝরে পড়তে থাকে, নেশায় জড়ানো চোখ নিয়ে কোনো শেঠজী হীরের আংটি বসানো আঙুলে ভেলভেটের তাকিয়ায় ভুল তাল দিতে থাকে, তখন

কান্তিরও নেশা ধরে। শান্তিভূষণের নেশা। একটা হিংস্র ভয়ঙ্কর কিছু করবার নেশা। তবলার উপর আঙুলগুলো লোহার আংটার মতো শক্ত হয়ে যায়।

টাকা। এই লোকটার মতো অনেক টাকা যদি তার থাকত!

একটা অসতর্ক মুহূর্তে মনের গোপন কথাটা শুনেছিল জগু। অতিরিক্ত পান-খাওয়া দাঁতগুলো থেকে রক্ত-জমাট হাসি ছড়িয়ে বলেছিল, "টাকা চাই ইয়ার? সে তো ছড়ানোই রয়েছে, নিতে পারলেই হয়।"

কান্তির চোখ চকচক করে উঠেছিল: "তাই নাকি? কোথায় পাওয়া যায়?"

কান্তির কাঁধে গোটা কয়েক থাবড়া দিয়ে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনেছিল জগু: "একদিন চল আমার সঙ্গে—ব্যাঙ্কে।"

"ব্যাঙ্কে!"

"হাঁ—ব্যাঙ্কে। কে অনেকগুলো টাকা তুলছে, চোখ রাখতে হবে তার দিকে। যখন টাকাগুলো নিয়ে কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে সে গুনে দেখছে, তখনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবে, 'গির গিয়া, আপকো নোট গির গিয়া।' মাথা নামিয়ে যেই নোট খুঁজতে যাবে, অমনি খপ করে তুলে নাও টাকাগুলো। আমরা সব এধার-ওধার দাঁড়িয়ে থাকব। হাতে হাতে পাচার হয়ে যাবে টাকা।" জগুর পান-খাওয়া দাঁতগুলো জন্তুর মতো দেখাতে লাগল। "তোমাকে ধরে হয়তো কিছু মার লাগাবে, থানাতেও নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু টাকা কাছে না পেলে কিছুই করতে পারবে না। রাজী আছ দোস্ত?"

আতঙ্কে চমকে কান্তি বলেছিল, "না।"

কিন্তু মনের অগোচর পাপ নেই সে-কথা কে আর বেশী করে জানে তার নিজের চাইতে! আজ তো এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সে শান্তিভূষণের সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়। চুরি ডাকাতি খুন সব কিছুরই সহজাত অধিকার নিয়ে সে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছে। কালো অন্ধকার রাত্রির সরীসৃপ গলিগুলো সৃষ্টি হয়েছে তাদের মতো মানুষের জন্যেই; তাদেরই

মুঠোর জন্যে পৃথিবীর সমস্ত চকচকে বাঁকা ছুরিতে শান পড়েছে; নিশীথের নির্জন গঙ্গার উপর দিয়ে দাঁড় টেনে টেনে যে ছায়ার মতো নৌকোটা বে-আইনী আফিং আর চোরাই পিস্তল নিয়ে আসছে, তা একান্তভাবে তাদেরই প্রয়োজনে; কোনো এক অপরিচ্ছন্ন ক্লেদাক্ত সকালে ডাস্টবিনের মধ্যে যে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গেল, তার গলায় তাদেরই আঙুলের দাগ!

পারে। শান্তিভূষণের রক্তে যাদের জন্ম, তারা সবই পারে। তবু কান্তিভূষণের যে বাধে, সে খানিকটা অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তিভূষণের মতো সাহস তার নেই।

তবু একদিন সে-ও পারবে। এক-একদিন উদ্দাম রাত্রে মুনিয়া বাঈজীর নাচ যখন সংযমের শেষ সীমাকে পার হয়ে চলে যায় সেদিন কান্তিভূষণও পারবে। এখন কেবল অপেক্ষার কাল, কেবল প্রস্তুতির পর্ব।

ট্রেন হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। চারদিকে নেমে এল একটা গম্ভীর কালো ছায়া। যেন ওই ট্রেনটার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও এসে প্রবেশ করল কোনো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পরিণামের মধ্যে, যার হাত থেকে তার মুক্তি নেই।

তিন

বাড়িটা মালাবার হিল্‌সের ওপর। জানলা দিয়ে রাত্রির আরব সমুদ্র আর মেরিন ড্রাইভের দীপান্বিতা। বহু দূরে ট্রামের বিদ্যুৎবিন্দু। জেটি থেকে একটা জাহাজের গম্ভীরমন্দ্র আত্মঘোষণা।

গীতা ঘরে ঢুকে বলল, "দীপেন আসেনি?"

সুপ্রিয়া বলল, "না। কী কাজে গেছে রাওয়ের ওখানে।"

গীতা ভ্রুকুটি করলে, "রাওয়ের ওখানে কাজ তো বোঝাই যাচ্ছে। এখানে এমনিতে প্রহিবিশন, ড্রিঙ্ক করতে তো সুবিধে হয় না। তাই রাওয়ের মতো কয়েকজনই মাতালদের আশা-ভরসা।"

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল। দীপেনের মদ খাওয়া নিয়ে সে গীতার মতো বিচলিত হয় না।

গীতা আস্তে আস্তে বললে, "যে-ভাবে চলেছে, তাতে আর [illegible] পাঁচেক বেঁচে থাকবে। তার বেশী নয়।"

সুপ্রিয়া চমকে উঠল, "সেকি কথা!"

গীতা সামনের সোফাটায় বসে পড়ল। "তুমি জানো না? ওর লিভার বেশ কিছুদিন থেকেই তো ওকে ট্রাব্‌ল দিচ্ছে। ডাক্তারেরা ওকে সাবধান করে দিয়েছে অনেকবার। দিন কয়েক ভয় পেয়ে সামলে থাকে, তারপরেই আবার আরম্ভ করে দেয়। মরবে, আর দেরি নেই।"

সুপ্রিয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল: "কিন্তু তুমি তো ওকে বাঁচাতে পারো গীতা।"

"আমি?" গীতা আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকাল, "আমার কথা শুনবে কেন? আমি চেষ্টা করছি চার বছর থেকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।"

"তুমি তো ওকে ভালোবাস।"

গীতা হাসল, "তা হতে পারে। কিন্তু ও আমাকে ভালোবাসে না।"

"তা হলে এই দু বছর ধরে—"

"এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াই, এই তো?" গীতা বললে, "তাতে কী আসে যায়। আমি ওকে ভালোবাসি, তাই কাছে থাকতে চাই। ওর সঙ্গীর দরকার হয়, সেই জন্যেই ও আমাকে অভ্যাস করে নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওর মনের ওপর রাশ টানতে পারি, এমন জোর আমি কোথায় পাব? সে পারো একমাত্র তুমিই।"

"আমি!"

গীতা বললে, "কারণ ও তোমাকেই ভালোবাসে।"

সুপ্রিয়া বিস্বাদ হাসি হাসল। এই তিন মাসের মধ্যে দীপেন ও-কথাটা তাকে অনেকবারই বলেছে। খানিকটা বিশ্বাস করে সুপ্রিয়া, খানিকটা করে না। দীপেনের মনে হয়তো খানিকটা রঙ লাগিয়ে রেখেছে, কিন্তু সে তো

কেবল একাই নয়। আরও অনেকে এসেছে সেখানে, আরও অনেকেই আসবে। তার সুরের আসরে অবারিত দ্বার।

অবশ্য দীপেনকে সেজন্যে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঠিক এই রকম কথা সে নিজেই কি বহুবার বলেনি অতীশের কাছে, বলেনি কান্তিকে? আমার মনের ভিতরে অনেক বেশী জায়গা আছে, মাত্র একজনকে দিয়ে সে সে-জায়গা ভরবে না। আমি আরো বহু মানুষকে ডেকে আনতে পারি সেখানে। তাই বলে হিংসা কোরো না। তোমার জন্যে যেটুকু মন আমি আলাদা করে রেখেছি সে কেবল তোমারই একার।

খুব ভালো কথা। অতীশ যেমন সে-কথা মেনে নিয়েছে বিষণ্ণ শান্ত মুখে, যেমন সে-কথা দাঁতে দাঁতে চেপে মেনে নিয়েছে কান্তি, তেমনি সহজভাবেই সুপ্রিয়ারও স্বীকার করে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোথায় যেন এখন বাধে সুপ্রিয়ার। নেশায় লাল টকটকে চোখ মেলে দীপেন যখন বলে, "তোমার জন্যেই আমি এতদিন অপেক্ষা করে বসে ছিলাম—" তখন মনের ভিতর কেমন কুঁকড়ে যায় তার। দীপেন তাকে ভালোবাসবে, সারা ভারতবর্ষের অত বড নামজাদা গায়ক সরস্বতীর ধ্যান করতে গিয়ে বুকের ভিতরে দেখতে পাবে তারই মুখ, তাকেই কল্পনা করে দীপেনের গানের সুর নির্ঝরিত হবে সহস্র বেণীতে, এর চেয়ে বড় স্বপ্ন আর কী আছে সুপ্রিয়ার? তবু কখনো কখনো দীপেনের হাত যখন তার হাতে এসে পড়ে, তখন তিক্ত ঈর্ষার সঙ্গে কোথা থেকে একরাশ তিক্ত অস্বস্তি তাকে সংকুচিত করে ফেলতে থাকে।

গীতার কথায় চকিত হয়ে উঠল সুপ্রিয়া।

"জানো সুপ্রিয়া, দীপেন কতবার বলেছে আমাকে। বলেছে, জীবনে আমার অনেকেই এসেছে, কিন্তু তারই প্রতীক্ষা করে বসে আছি এতদিন। আমার গানের সব চাইতে দুর্মূল্য সঞ্চয় যেখানে, তার সোনার চাবিটি সে-ই নিয়ে আসবে। সে এলেই আমি বেঁচে উঠব, নেশা ছেড়ে দেব, গানের তপস্যায় বসব সন্ন্যাসীর মত। আমার চোখের সামনে থাকবে তারই বিগ্রহ। সেদিন

আর তোমায় বলতে হবে না গীতা, নিজের হাতেই আমি মদের বোতল আছড়ে ভেঙে ফেলব।"

সুপ্রিয়া বললে, "তুমি কি ভাবছ আমিই সেই মেয়ে?"

"দীপেন তোমার নাম করেছিল আমার কাছে। এবার কলকাতায় যাওয়ার আগে আমাকে বলেছিল, গান গাইতে কলকাতায় যাচ্ছি না, আনতে যাচ্ছি আমার গীতলক্ষ্মীকে। নিয়ে এল তোমাকে। এবার তো তোমার সময় হয়েছে সুপ্রিয়া, এখন তো তুমি ওকে ফেরাতে পারো এই আত্মহত্যার পথ থেকে।"

সুপ্রিয়া নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল একবার। দীপেনের কথা কানে ভাসছে: "শুধু কাছে থাকবে, শুধু চোখে দেখব, এইটুকুতেই আমার সান্ত্বনা কোথায়। তোমায় আরো বেশি করে চাই।"

আরো বেশি? সে-বেশির অর্থ বুঝতে দেরি হয়নি। দীপেনের রক্তাভ চোখে সেই জ্বালা—যা আদিম, যা উলঙ্গ, যা আরণ্যক। সে-চাওয়ার দাবি সুরের সাধনা থেকে আসেনি, এসেছে শরীরের ক্ষুধা থেকে। তার হাতে নিজেকে এ-ভাবে সঁপে দিয়ে দেউলিয়া হতে রাজি নয় সুপ্রিয়া। দীপেনকে সম্পূর্ণ করে না চেনা পর্যন্ত, নিজের সাধনার সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত, এবং শান্ত-নিশ্চিন্ত পরিণামে সমাজের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে এত সহজেই সে শূন্য করে দিতে পারবে না।

"তুমি ওকে ফেরাও। এখনো ফেরাও।" গীতার গলায় একটা আর্ত অনুরোধ।

দেহের দাম দিয়ে? একটা বিস্বাদ হাসি আবার ভেসে উঠল সুপ্রিয়ার ঠোঁটের কোনায়। শুধু ওইটুকু? কেবল অতটুকুর জন্যেই সব কিছু আটকে আছে দীপেনের? কী করে বিশ্বাস করবে সুপ্রিয়া? কলেজ জীবনের অমরেশ্বরকে মনে পড়ল। তার জন্যে খাতার পর খাতা কবিতা লিখেছিল অমরেশ্বর, তাতে বলছিল, আমি সমুদ্র, তুমি চাঁদ, দূরে থেকে আমার বুকে জোয়ার জাগিয়ো, তাতেই আমি চরিতার্থ হয়ে থাকব। কিন্তু অমন সমুদ্রের

মতো বিশাল রোমাঞ্চ মুহূর্তে কুশ্রী লোলুপতায় পরিণত হয়েছিল গড়ের মাঠের দূরান্তে রাত্রিগম্ভীর একটা গাছের ছায়ায়। সুপ্রিয়া কেবল প্রকাণ্ড একটা চড় বসিয়েছিল অমরেশ্বরের গালে। মাথা ঘুরে বসে পড়েছিল অমরেশ্বর। তারপর হাত ধরে তাকে উঠিয়ে বসিয়েছিল সুপ্রিয়াই। বলেছিল, "খুব হয়েছে—এবার বাড়ি ফিরে চলুন।"

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে অনেকক্ষণ ধরে কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল অমরেশ্বর। শরীরের না মনের যন্ত্রণায়, সুপ্রিয়া জানে না; সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পায়নি।

তবু আশা ছিল, ওটা ক্ষণিক দুর্বলতা, সমুদ্রের সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। কিন্তু সেই থেকেই দূরে সরে গেল অমরেশ্বর। সুপ্রিয়া যেচে গেছে তার কাছে, একদিন টেনেও নিয়ে গিয়েছিল একটা চায়ের দোকানে, কিন্তু অমরেশ্বর আর ভালো করে তাকাতেও পারেনি তার দিকে। ছাইয়ের মতো নেভা চোখের দৃষ্টি মেলে রেখেছে মাটির দিকে, একটা কথা বলতে গিয়ে তিনটে ঢোক গিলেছে, তারপর খানিকটা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ঠোঁট পুড়িয়ে জামা নষ্ট করে একরকম উর্ধ্বশ্বাসেই পালিয়ে গেছে সামনে থেকে।

দীপেনের এত কল্পনা, এত স্বপ্নের শেষও কি ওইখানেই? জোর করে কিছুই বলা যায় না। পৃথিবী সম্পর্কে অমরেশ্বর তার চোখ খুলে দিয়েছে। তার সম্পর্কে দীপেনের এতদিনের প্রতীক্ষা কেবল কি ওইটুকুর জন্যেই সমাপ্তি পাচ্ছে না? তা হলে অমরেশ্বরের সঙ্গে দীপেনের তফাত কোথায়? তা হলে কিসের জন্যে সে কলকাতা থেকে চলে এল এতদূরে?

আর এ-কথাই কি জোর করে বলতে পারে সুপ্রিয়া যে, এর পরেই দীপেনের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না? একরাশ কাদা মাখিয়ে তার স্বপ্নলক্ষ্মীকে সে সমুদ্রে বিসর্জন দেবে না? নাকি গান শেখবার জন্যে তাকে নিজের শরীর ঘুষ দিতে হবে দীপেনকে? ছিঃ—ছিঃ—এত তুচ্ছ দীপেনের গুরুদক্ষিণা?

গীতা আবার ওকে চকিত করে তুলল।

"কথা বলছ না যে ?"

"কী বলব ?"

"দীপেন সম্পর্কে তোমার কি কিছুই করবার নেই ?"

সুপ্রিয়া ম্লানমুখে বললে, "আমার সম্পর্কেই ওর করবার ছিল বেশি।"

গীতা বললে, "তাতে তো ত্রুটি হয়নি। এখানকার সেরা ওস্তাদ পণ্ডিতজীর কাছে ও তোমার গান শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যাতে টাকার দিক থেকে তোমার ওর কাছে হাত পাততে না হয়, তার জন্যে ওর ছবিতে তোমার প্লে-ব্যাকের বন্দোবস্ত করেছে। তুমি যা স্বপ্ন দেখেছিলে তা তো ও পূর্ণ করে দিয়েছে। তুমি কিছু করবে না সুপ্রিয়া ?"

"চেষ্টা করব।"

গীতার দৃষ্টিতে জ্বালা ফুটে উঠল : "তোমার আরো একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত ছিল ওর ওপরে।"

কৃতজ্ঞতা ? সুপ্রিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করল। এমন কথা তো ছিল না। সে যে জীবনকে অনেক বেশি বিস্তীর্ণ অনেকখানি বিকশিত করে তুলতে চেয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই ; সে চেয়েছিল ভারতবর্ষের গীত-তীর্থে দেবতাকে অঞ্জলি দিতে, চেয়েছিল সুরের তীর্থ-সলিলে নিজের পূর্ণকুম্ভটি ধন্য করে নিতে। কিন্তু তার জন্যে তো দীপেনের কাছেই একান্তভাবে এসে সে প্রার্থনা জানায়নি। দীপেন উপযাচক হয়েই এসেছে তার কাছে, হাত পেতেছে ভিক্ষার্থীর মতো, বলেছে, "দয়া করো আমাকে। আজ এতদিন ধরে তোমারই পথ চেয়ে ছিলাম। আমার সব গান এখনো কুঁড়ি হয়েই আছে, তারা ফুটতে পারছে না। তুমি এসো, তাদের ফুটিয়ে দাও, আমার মনের মালঞ্চকে ভরে তোলো।"

সেই ফুল ফোটাতেই সুপ্রিয়া এসেছে। কৃতজ্ঞতার পালা তো তার নয়, ও কাজ দীপেনেরই ছিল। আজ তার পক্ষ থেকে উলটো চাপ দিচ্ছে গীতা। মন্দ নয় !

কিছুক্ষণ চুপ। সমুদ্রের বুক থেকে উচ্ছৃঙ্খল হাওয়া। মেরিন ড্রাইভের

দীপাম্বিতা। ট্রেনের বিদ্যুৎ-বিন্দু। কালো সমুদ্রের উপর একটা জাহাজের বিচিত্রবর্ণ আলোর আন্দোলন।

গীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"হঠাৎ তোমাকে একটা রূঢ় কথা বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না। আমার মনকে আমি জানি। আমাকে যে ও ভালোবাসে না, তুমি যে ওর সবখানি জুড়ে আছ, তার জন্যে আমি তোমাকে হিংসে করি। আর সেই সঙ্গে যখন ভাবি, তুমি ইচ্ছে করলেই ওকে বাঁচাতে পারো, বাঁচাতে পারো অত বড় গুণীকে, অথচ কিছুই করছ না, তোমাকে তখন আর ক্ষমা করতে মন চায় না।"

সুপ্রিয়া জবাব দিল না। কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শুধু এইটুকুর জন্যেই সার্থক হতে পারবে না দীপেন? সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সাধনা, সমস্ত প্রতীক্ষার সমাপ্তি হচ্ছে না কেবল এরই জন্যে?

গীতা একবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল।

"বারোটা বাজে। এখনো ফিরল না! রাস্তায় পুলিশে ধরল না তো?"

"তা হলে ভাবনা নেই।" সুপ্রিয়া হঠাৎ হেসে ফেলল, "ভালোই থাকবেন আজকের রাত।"

গীতা একটা ক্রুদ্ধ উগ্র দৃষ্টি ফেলল তার দিকে, আস্তে আস্তে উঠে গেল সামনে থেকে। সুপ্রিয়া বসে রইল দূরের দিকে তাকিয়ে। তার অতীতকে মনে পড়ছে।

আশ্চর্য, সবাই চেয়েছে তার কাছে। কান্তি, অমরেশ্বর, দীপেন—আরো অনেকেই। এমনকি, ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করও। মুখ ফুটে কোনো কথা কখনো বলেননি, তবু তার মনে হয়েছে, শূন্য ব্যথিত চোখের দৃষ্টি মেলে দুর্গাশঙ্কর জানাতে চেয়েছেন, "আমি ভারী নিঃসঙ্গ—তুমি আমার কাছে থাকো। যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ব, তখন আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দাও আমার মাথায়।" শুধু অতীশই কিছু চায়নি কোনোদিন। বরং দিতে চেয়েছে, বরং বলেছে, "আমি তোমার কাছে কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি; শুধু কোনোদিন যদি তোমার প্রয়োজন হয়, আমাকে ভুলো না। আমি জানি, যখন তুমি থাকবে না,

তখন আমার বাঁচবার সব উৎসাহ যাবে ফুরিয়ে। তবু আমি তোমার জন্যেই বেঁচে থাকব। যদি কখনো পৃথিবীতে তোমার আর কিছু না থাকে, আমি আছি।"

একটা ক্লান্ত নিশ্বাস পড়ল সুপ্রিয়ার। গান সে শিখছে। স্বপ্নে যে দিকপাল ওস্তাদের পায়ের ধুলো ভিক্ষা করেছে, আজ গান শিখছে তাঁরই পায়ের কাছে বসে। তবু যখন তাঁর বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে আসে, তখন তার চোখটা অভ্যাসবশেই রাস্তার ওধারে চলে যায়। আর তখনই মনে পড়ে, এ তো কলকাতা নয়! এখানে সেই বকুলগাছের তলায় নীল অন্ধকার নেই, যেখানে শাদা শার্টের কলার তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রতীক্ষা করছে অতীশ।

ভারী ফাঁকা লাগে সুপ্রিয়ার।

কিন্তু ইউনিভার্সিটির ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র তার কী কাজে লাগবে? তার সঙ্গে কোথায় ছন্দ মেলাবে অতীশ? সে তো তার গানের আসরে সঙ্গত করতে পারে না।

গীতা ফিরে এল।

"ফোন করেছিলাম। রাও বললে, কোনো চিন্তা নেই, দীপেন রওনা হয়েছে ওর ওখান থেকে।"

গীতা আবার মুখোমুখি বসল সুপ্রিয়ার। মুখে একটা বিষণ্ণ ভাবনা। কী একটা কথা বলতে এসেছে যেন, কিছুতেই সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "আজকে নাচ ছিল না তোমার?"

"ছিল।"

"কেমন হল?"

"ভালোই।" হঠাৎ যেন বহুক্ষণের একটা আবরণ মনের উপর থেকে জোর করে সরিয়ে দিলে গীতা: "জানো, আজ আমার নাচ দেখতে এসেছিলেন সোহনলাল!"

"সোহনলাল।"

"আমি ভাবতেই পারিনি—" গীতার গলা কাঁপতে লাগল, "কল্পনাই করিনি উনি বম্বেতে রয়েছেন।"

"তুমি তো বলেছিলে সোহনলাল দিল্লী কিংবা আগ্রার কোনো কলেজে প্রোফেসারি করছেন।

"তাই তো জানতাম।" গীতা বিহ্বল চোখে বললে, "হয়তো কোনো কারণে বম্বেতে এসে পড়েছেন। আমার নাচ দেখতে এসেছিলেন, বসেছিলেন একেবারে সামনের রো'তে। আমি ওঁর দৃষ্টি দেখেছি। আমাকে চিনতে পেরেছেন।"

গীতার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পডতে লাগল।

"একবারের জন্যে আমার নাচে তাল কেটে গেল ভাই। একবার মনে হল, আমি ছুটে পালিয়ে যাই এই স্টেজ থেকে। শুধু স্টেজ থেকেও নয়, পৃথিবীর চোখের সামনে থেকে। গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পডি সমুদ্রে।"

সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বললে, "চিনলেই কি বিশ্বাস করবেন? সোহনলাল তো জানেন তুমি আর বেঁচে নেই।"

ওডনার প্রান্তে জল মুছে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকাল গীতা: "ঠিকই বিশ্বাস করেছেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম কালো হয়ে গেছে ওঁর মুখ। তারপর প্রত্যেকটা নাচের সময় কেবল একদৃষ্টিতে আমার দিকেই তাকিয়ে রইলেন মূর্তির মতো। মাথা নাডলেন না, হাততালি দিলেন না, কিছুই না।"

নীরবে বসে রইল সুপ্রিয়া।

"আজ মনে পডছে, একবার কলেজ সোশ্যাল শেষ হলে সকলের চোখের আড়ালে আমার হাতে একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া এনে দিয়েছিলেন সোহনলাল। সেদিন ওঁর একটা দৃষ্টি দেখেছিলাম আজ দেখলাম আর-এক দৃষ্টি।" গীতার চোখ বেয়ে আবার জল পডতে লাগল।

বাইরে কালো সমুদ্র। মেরিন ড্রাইভের দীপান্বিতা। ঝডের মতো হাওয়া।

গীতা আবার বললে, "যদি মদ পেতাম, আজকে দীপেনের মতোই ড্রিঙ্ক

করতাম আমি। ভোলবার জন্যে নয়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবার জন্যে। আজকের রাত আমার কী করে কাটবে সুপ্রিয়া?"

বাইরে মোটরের শব্দ হল। দীপেন ফিরে এসেছে।

(কান্তি বলছিল, "তুমি কি চাও, আমি আত্মহত্যা করি?"

"আত্মহত্যা কেন করবে কান্তি? জীবনটা কি এক টুকরো বাজে কাগজ, যে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ইচ্ছে করলেই ছুড়ে ফেলে দেওয়া চলে?"

কান্তির শান্ত মুখটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল: "আমার কাছে জীবন ছেঁড়া কাগজের টুকরোর চাইতে বেশী নয়। প্রমাণ চাও? দেখাচ্ছি!"

বলতে বলতেই কান্তি নিজের একটা হাত তুলে আনল বুকের কাছে। বিস্ফারিত চোখে সুপ্রিয়া দেখল সে-হাত মানুষের নয়! ভালুকের মতো কালো কালো লোমে ভরা। আর হাতের আঙুলগুলো একরাশ শাদা ধারালো বাঘের নখ। পরক্ষণেই কান্তি সেই নখগুলো নিজের বুকের মধ্যে বসিয়ে দিলে। পুরনো কাপড় ছেঁড়বার মতো শব্দ করে ছিঁড়ে গেল বুকের চামড়া, মট্ মট্ করে ভেঙে গেল পাঁজর আর উদ্ঘাটিত বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো হৃৎপিণ্ডটা, ঝুলে পড়ল বাইরে।

একটা রক্তমাখা ভালুকের থাবা সুপ্রিয়ার কপালে রেখে কান্তি বললে, "দেখছ?")

অমানুষিক ভয়ে সুপ্রিয়া ঘরফাটানো আর্তনাদ করে উঠল। স্বপ্ন ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার আবছা আলো। স্বপ্নের আতঙ্ক জড়ানো চোখে সুপ্রিয়া দেখল, তার পায়ের কাছে তখনো কান্তি দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মতো।

যেন প্রেতলোকের পার থেকে কান্তির গলা ভেসে এল, "চেঁচিয়ো না, আমি।" তারপরেই বাঘের থাবার মতো দুটো লুব্ধ বাহু বাড়িয়ে সে ঝুঁকে পড়ল সুপ্রিয়ার দিকে।

আবার একটা আর্তনাদ তুলল স্বপ্রিয়া। কান্তি! কান্তি ছাড়া এ আর কেউ নয়। বুক চিরে হৃৎপিণ্ড ঝুলছে বাইরে—রক্ত ঝরে পড়ছে অগ্নিবৃষ্টির মতো। আর দুটো নিষ্ঠুর কঠিন হাত দিয়ে স্বপ্রিয়ার গায়ের মাংসও যেন সে ছিঁড়ে নিতে চাইছে। দুটো পা তুলে প্রাণপণে সে লাথি মারল প্রেত-মূর্তিকে। চাপা যন্ত্রণার একটা গোঙানি তুলেই মূর্তিটা সোজা উলটে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে বিকট শব্দে উলটে পড়ল একটা টিপয়, ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ে গেল একটা কাচের গ্লাস।

আর সারা বাড়ি কাঁপিয়ে গীতার চিৎকার উঠল: "কে—কে—কে?"

চার

একটা কিছু মনে হয়েছিল মুনিয়া বাঈয়ের। হয়তো মেয়েদের স্বাভাবিক সংস্কারেই সে বুঝতে পেরেছিল।

"বাবুজী, ঘরে কে আছে তোমার?"

"মা।"

"শুধু মা? বিবি নেই? সাদী করোনি?"

কান্তি মুখ ফিরিয়ে নিলে। খানিক দূরে ট্রাম লাইনের তারে এক ঝলক নীল আলো উদ্ভাসিত হল, তার দীপ্তি দুলে গেল তার চোখের উপর।

"না, সাদী হয়নি।"

পানের বাটা থেকে লবঙ্গ তুলে নিয়ে সেটাকে দাঁতে কাটল মুনিয়া বাঈ।

"কোনো মেয়ে বুঝি দুঃখ দিয়েছে তোমাকে? দিওয়ানা হয়েছ সেইজন্যে?"

কান্তি চমকে উঠল। যে ছোট লোহার হাতুড়িটা দিয়ে সে তবলা বাঁধছিল, তার একটা ঘা এসে পড়ল আঙুলে।

"কেন বলছেন এ-কথা ?"

"মানুষ দেখে দেখেই তো কাটল জিন্দিগিভর।"—মুনিয়া বাঈ হাসল, ঝিকমিক করে উঠল নাকের হীরার ফুল: "প্রেমের জন্তে যে দিওয়ানা হয়, তার চোখমুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি।"—খানিকক্ষণ গভীর চোখে থেকে মুনিয়া বাঈ বললে, "তুমি যদি দশ বছর আগে আসতে বাবুজী।"

সেই পুরনো ক্ষতটা থেকে রক্ত গড়াতে শুরু করে দিয়েছিল কান্তির। তবু মুনিয়া বাঈয়ের কথায় সে জবাব না দিয়ে থাকতে পারল না।

"কী হত দশ বছর আগে এলে ?"

"তখন যে কানায় কানায় ভরে ছিলাম আমি।"—মুনিয়া বাঈয়ের গভীর দৃষ্টি কান্তির মুখের ওপরে স্থির হয়ে রইল: "তোমাকে আমার জওয়ানী থেকে পেয়ালা ভরে দিয়ে বলতাম: পী লেও! দুনিয়া আজ আছে—কাল নেই। দিল-তোড়নেওয়ালী চলী গই ? বহুত আচ্ছা, যা-নে দেও। আমি তো আছি। এমন অনেকের দুঃখ আমি মিটিয়েছি বাবুজী।"

কান্তি চুপ করে রইল।

মুনিয়া বাঈ আশ্চর্য কোমল হাসি হাসল: "হ্যাঁ অনেকের দুঃখ মিটিয়েছি। পিয়াসে পাগল হয়ে ছুটে এসেছে—আমি জ্বালা জুড়িয়েছি তাদের। জানো বাবুজী, আমরা হচ্ছি গঙ্গা মাইয়ের স্বজাত। গঙ্গাজী যেমন সকলের পাপ টেনে নেন—তেষ্টা মেটান—আমরাও তাই করি।—" মুনিয়া বাঈ আর-একটা লবঙ্গ তুলে নিলে বাটা থেকে: "ভারী অদ্ভুত লাগছে কথাটা—না? তুমি মানো ?"

হাতুড়ির ঘা লাগা আঙুলটায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। তার চাইতেও বেশি যন্ত্রণা জলছিল বুকের ভেতরে। কান্তি জবাব দিলে, "জানি না।"

"তুমি মানবে না। কিন্তু ওই তো আমাদের সান্ত্বনা। ওই জোরেই তো আমরা বলতে পারি, যার কেউ নেই—সংসারে আমরা আছি তার জন্তে। কিন্তু তোমাকে সে কথা বলতে পারি না। তুমি আমার চাইতে অনেক ছোট। এখন আমি তোমার বড় বহিন হতে পারি, তার বেশি কিছু নয়।"

যন্ত্রণাটা বেড়েই যাচ্ছে। সহানুভূতি হয়েছে মুনিয়া বাঈয়ের ? সমবেদনা জানাচ্ছে তাকে ? কিন্তু আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে সেটা। দেউলে হয়ে যে পথে বেরিয়েছে, তার হাতের মুঠো ভরে ভিক্ষা দিলে সেটা আরো বেশি অপমান হয়ে বাজতে থাকে।

কান্তি নিঃশব্দে উঠে পড়ল। চলে গেল ঘর থেকে।

মুনিয়া বাঈ মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল একটা। উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গুন গুন করতে লাগল : "দিওয়ানা হুঁ—ম্যায়্ দিওয়ানা হুঁ—"

সেই রাত্রেই ঘটনা ঘটল।

মুনিয়া বাঈ নাচছিল।

নামজাদা এক শেঠ এসেছেন তাঁর ঘরে। তিনটে কোলিয়ারি, দুটো পাটের কল, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মালিক। আরো কী কী ব্যবসা আছে তাঁর। লাখ দশেক টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন এবার, ফাঁকি দিয়েছেন তার তিনগুণ।

এসেই শেঠজী বের করেছেন একটা পেটমোটা মস্ত বড় মনিব্যাগ। দুখানা দশ টাকার নোট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছেন, "নোকর লোগ্‌কো বকশিস।"

তারপর এসেছে আতরদান, সোনালী তবকমোড়া বাটাভরা পান, রূপোর থালায় কয়েক ছড়া মোটা মোটা মালা, আর এসেছে মদের বোতল।

মুনিয়া বাঈ বেশি মদ খায় না। কিন্তু এমন সম্মানিত অতিথির সে অমর্যাদা করতে পারেনি। শেঠজীর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকপাত্র চড়িয়ে নিয়েছে, নিজেও উচ্ছলতম গান শুনিয়েছে একটার পর একটা, দু চোখে ছড়িয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবাণ। তারপর শুরু হয়েছে নাচ।

ত্রিশ বছর পেরিয়ে যাওয়া মুনিয়া বাঈ যেন পিছিয়ে গেছে দশ বছর। সমস্ত শরীর তার ফণা-তোলা সাপের মতো ছোবল মেরেছে শেঠজীকে। এমনকি বুড়ো সারেঙ্গিওলার চোখ পর্যন্ত চমকে উঠেছে কয়েকবার। শেঠজী একটার পর একটা গ্লাস শেষ করেছেন, শেষ পর্যন্ত আর সোডারও দরকার হয়নি।

নেশার জড়তা আর নাচের ক্লান্তিতে এক সময় কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়ল মুনিয়া বাঈ। তার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছেন শেঠজী। প্রকাণ্ড মুখটা হাঁ করে আছে, নাক দিয়ে বেরুচ্ছে উৎকট আওয়াজ। সারেঙ্গি রেখে বুড়ো সারেঙ্গিওলা এগিয়ে গেল, একটা তাকিয়া টেনে সস্নেহে মুনিয়া বাঈয়ের মাথাটা তুলে দিলে তার উপর, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কান্তি তবলা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল আবার।

শেঠজীর গলায় চিকচিকে সোনার হার। হাতের আঙুলে সবশুদ্ধ গোটা আটেক আংটি, তার একটা থেকে কমলহীরের একটা দীর্ঘ রশ্মিরেখা কান্তির চোখে এসে আঘাত করছে। পেটমোটা মনিব্যাগটা গড়িয়ে পড়েছে কার্পেটের উপর। জামার বোতামগুলোতেও যা চিকচিক করছে, তা হীরে ছাড়া আর কিছুই নয়।

কান্তির হাত-পা যেন জমে পাথর হয়ে গেল।

কত টাকা হতে পারে সবশুদ্ধ? পাঁচ হাজার, সাত হাজার? ওই মনিব্যাগটাতেই যে কত আছে কে জোর করে বলতে পারে?

কান্তি চারদিকে তাকাল একবার। রাত একটা বেজে গেছে। একটা চাকরেরও সাড়া নেই কোথাও। তারা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে নিজেদের জায়গায়। মুনিয়া বাঈ নেশায় অচেতন, শেঠজীর নাক ডাকছে।

কমলহীরের দীর্ঘ রশ্মিরেখাটা শয়তানের সংকেতের মতো ডাকতে লাগল কান্তিকে। পেটমোটা মনিব্যাগটা সাদর আমন্ত্রণে হাতছানি দিতে লাগল। বোতামের উজ্জ্বল বিন্দুগুলো আলোর সুতোয় পরিণত হল, তারা যেন দু পায়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল কান্তির।

কান্তি একবার কপালের ঘাম মুছে ফেলল। তাকিয়ে রইল মন্ত্রবদ্ধের মতো। তারপরে মনে হল, তার চোখের তারাদুটো আর চোখের ভিতরে নেই, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়েছে তারা, ওই আংটিটার উপর, ওই মনিব্যাগটার উপর জ্বল-জ্বল ঝক ঝক করে জ্বলছে।

আলোর সুতোগুলো সরীসৃপ হয়ে কান্তির দু পা জড়িয়ে ধরে টানতে লাগল। একটা তুর্জয় লোভ বুকের ভিতরে আঁচড়াতে লাগল ক্রমাগত। মাথার ভিতরে শুধু কমলহীরের আলোটা আগুনের ঊর্ধ্বমুখী শিখার মতো জলতে লাগল।

কান্তি ফিরে গেল শেঠজীর কাছে।

পাঁচটা আংটি খুলে এল সহজেই, কমলহীরেটা এল সব চেয়ে সহজে। গোটা তিনেক বাধা দিলে, আর তুটোও খোলা গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। একটা শুধু শক্ত হয়ে আঁকড়ে রইল, আঙুলের মোটা গাঁটটা কিছুতেই পেরোতে রাজী হল না।

ওটা থাক, এমন কিছু লোভনীয় নয়। বোতামটার সঙ্গে এল বেশ মোটা সোনার চেন। আর মনিব্যাগটা তো তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল।

ঘামে জামাটা লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে। কান্তির চোখের সামনে সমস্ত ঘরটা ভূমিকম্পের মতো দোল খাচ্ছে। শেঠজীর নাক ডাকছে সমানে। একটা ছিঁড়ে আনা পদ্মের মতো লুটিয়ে আছে মুনিয়া বাঈ। কান্তি দ্রুতপদে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সেখান থেকে সোজা সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু সিঁড়িতে প্রথম পা রাখতেই কে যেন তার কাঁধে থাবা দিয়ে চেপে ধরল। লোহার মতো শক্ত তার মুঠো। থরথর করে কেঁপে উঠল কান্তি।

সারেঙ্গিওলা।

কোটরে-বসা চোখ তুটো ঝিলিক দিচ্ছে ক্রোধে। বজ্রগর্জনে বুড়ো বললে, "কাঁহা যাতা? ঠহ্‌রো!"

"কেঁও?"

"তোম্ চোরি কিয়া।"

খুনী শান্তিভূষণ জেগে উঠল কান্তির রক্তে। কান্তি পালটা গর্জন করে উঠল, "মুখ সাম্‌লাও।"

"চোপরও চোট্টা। জেব দেখলাও!"

একটা ঝটকা মেরে বুড়োকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল কান্তি, কিন্তু পারল

না। পরক্ষণেই বুড়ো প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল কান্তির মুখে। ঠোঁট ফেটে গেল সঙ্গে সঙ্গেই, নাক দিয়ে দরদরিয়ে নেমে এল রক্ত।

শান্তিভূষণের বিষাক্ত রক্ত সাপের মতো হিসহিসিয়ে যেন কান্তিভূষণকে বললে, "তুমি খুনীর ছেলে, সে-কথা ভুলো না।"

ফাটা ঠোঁট আর রক্তাক্ত নাক নিযে কান্তি বাঘের মতো বুড়োর উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

বাড়ির চাকরবাকরগুলো এসে যখন কান্তিকে টেনে তুলল বুড়োর বুক থেকে, তখনো বুড়োর গলায় তার আঙুলগুলো অকারণে পাকের পর পাক দিচ্ছে। ফাটা ঠোঁট আর নাকের রক্তমাখানো মুখে ফেনা তুলে কান্তি তখনো অবরুদ্ধ স্বরে বলে চলেছে "এবার—এবার ?"

পাঁচ

"দাদা, ঘুমুচ্ছেন ?"

সাড়া নেই।

"ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি, ও অতীশবাবু ?"

"উঁ ? কী বলছেন ?" অতীশ পাশ ফিরল।

শ্যামলাল নিজের তক্তপোশে ছটফট করল আরো কিছুক্ষণ। খালি মনে হচ্ছে অজস্র ছারপোকা কামড়াচ্ছে বিছানায়। উঠে বসল, বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে খুঁজেও দেখল। না, একটা ছারপোকারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

নেমে গিয়ে কুঁজো থেকে জল খেল এক গ্লাস। তারপরে আবার করুণস্বরে বললে, "ও অতীশবাবু!"

"হুঁ।"

"ঘুমুচ্ছেন ?"

"হুঁ ।"

"আচ্ছা। ঘুমোন।"

অতীশ চোখ মেলল। জড়ানো গলায় বললে "ডাকছিলেন কেন ?"

"না—এমনি। আপনি ঘুমুচ্ছেন কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম।"

অতীশের পাতলা ঘুম সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল, বিরক্ত হয়ে বললে, "আমার ঘুম ভাঙিয়ে সেটা না জানলে কি আপনার চলছিল না ? নিজেও পড়ে পড়ে নাক ডাকান না—আমাকে কেন জ্বালাচ্ছেন ?"

শ্যামলাল কুঁকড়ে গেল। অপ্রতিভ হয়ে বললে, "না-ইয়ে-এমনি। আমার ঘুম আসছিল না কিনা, তাই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব। তা আপনি ঘুমোন। ডিসটার্ব করলাম, কিছু মনে করবেন না।"

অতীশ হাই তুলল। আধশোয়া ভঙ্গিতে উঠে বসল বিছানায়। ঘরে আলো নেই, কিন্তু জানলা দিয়ে একফালি ফিকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শ্যামলালের মুখে। অত্যন্ত বিপন্ন আর কাতরভাবে তাকিয়ে আছে শ্যামলাল।

অতীশ একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের কাঠির চকিত আলোয় শ্যামলালের বিষণ্ণ মুখখানাকে আরো বিবর্ণ মনে হল।

"মনে করলেই বা আর করছি কী। একবার যখন জাগিয়ে দিয়েছেন, তখন সহজে আমার আর ঘুম আসবে না। কিন্তু ব্যাপার কী ? পড়ছেন না অথচ জেগে রয়েছেন এমন অঘটন তো আপনার ক্ষেত্রে ঘটে না।"

শ্যামলাল বললে, "মানে—কেমন যেন মাথা ধরেছে, তাই—"

"এ-পি-সি খাবেন ? দিতে পারি এক পুরিয়া।"

"ধন্যবাদ—দরকার নেই। আমি বলছিলাম, কবে এলাহাবাদ যাচ্ছেন ?"

অতীশ বললে, "আমাকে জয়েন করতে হবে প্রায় একমাস পরে।"

"ও ! তা বেশ ভালো চাকরি আপনার। ওসব জায়গার ইউনিভার্সিটি মাইনে দেয় ভালো, তা ছাড়া ফরেন স্কলারশিপ পাওয়ার সুবিধেও আছে।" শ্যামলাল নিঃশ্বাস ফেলল।

"দেখা যাক।" টোকা দিয়ে মেজেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে অতীশ বললে, "কিন্তু ব্যাপারটা কী শ্যামবাবু? আমার কুশল আর খবরাখবর নেবার জন্যেই কি এত রাতে আমাকে ডেকে তুললেন নাকি?"

সামনের রাস্তা দিয়ে মড়া গেল একটা। হরিধ্বনির দানবিক চিৎকারটা সমস্ত অঞ্চলকে মুখর করে তুলল, কয়েকটা কুকুর সাড়া দিল তীক্ষ্ণ ভীত গলায়, একটা ঘুমভাঙা কাক কঁকিয়ে উঠল বাইরের শিরীষ গাছে। শ্যামলাল বিবর্ণ মুখে খানিকক্ষণ-দূরে-চলে-যাওয়া হরিধ্বনির আওয়াজ শুনল, তারপর সসংকোচ বললে, "আপনি মল্লিক সাহেবদের ওখানে যান?"

শ্যামলালের অলক্ষ্যে অতীশ অল্প একটু হাসল।

"আজকাল বিশেষ যাওয়া হয় না। তবে মাসখানেক আগে গিয়েছিলাম একবার।"

"ওরা আপনার আত্মীয়?"

"দূর সম্পর্কের। কেন, বলুন তো?"

"না—এমনি।" শ্যামলাল ঢোক গিলল, "মানে ওরা একটু—"

অতীশ বললে, "সাহেব-ঘেঁষা। তা ভদ্রলোকের অনেক টাকা। দু বার আই-সি-এস ফেল করেছেন; যদ্দূর জানি, ব্যারিস্টারি ব্যাপারটাও সহজে হয়নি। কাজেই বিলেতে অনেক দিন থেকেছেন এবং সাহেবি করবার অধিকারও ওঁর আছে।"

"ওঁরা সবাই তা হলে—"

অতীশ হাসল, "না—সবাই নয়। মল্লিক সাহেবের স্ত্রী এখনো বাড়িতে পায়ে জুতো পরেন না, এবং ওঁদের রান্নাঘরে এখনো বাবুর্চি ঢুকতে পায় না। আর মন্দিরাকে তো আপনি দেখেইছেন।"

"তা দেখেছি।" শ্যামলালের চোখ চকচক করে উঠল, "চমৎকার মেয়ে।"

"যা বলেছেন।" অতীশ উৎসাহ দিলে, "অমন বাড়ির মেয়ে, অথচ কোন খটমটে চাল-চলন নেই। একেবারে সাদামাটা। মানে, মেয়েটা ওর মায়ের দিকটাই পেয়েছে কিনা।"

উত্তেজনায় ভালো করে নড়ে-চড়ে বসল শ্যামলাল। ঝুঁকে পড়ল অতীশের দিকে।

"ঠিক বলেছেন। মেয়েটি একেবারেই ও বাড়ির মতো নয়। আর দারুণ ইণ্টেলিজেণ্ট।"

অতীশ আবার সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। "তাতে আর সন্দেহ কী! বিশেষ করে কেমিস্ট্রিতে ওর যা মাথা খোলে, তার আব তুলনা নেই। আমি তো মধ্যে মধ্যে ভাবি, বি-এসসি পাশ করবার আগেই কোনদিন বা ও ডি-এসসি হয়ে বসবে।"

শ্যামলাল একটু চমকে উঠল। খোঁচা লাগল গায়ে। মন্দিরার যে কেমিস্ট্রিতে এতখানি মাথা, অতটা শ্যামলালও ভাবতে পারে নি।

"ঠাট্টা করছেন না তো?"

"ঠাট্টা করব কেন? মেয়েটা সত্যিই খুব শার্প।" অতীশ গম্ভীর হয়ে গেল।

শ্যামলাল চুপ করে রইল। নির্জন নিঃশব্দ পথের উপর সুদূর থেকে আসা হরিধ্বনির একটা ক্ষীণ রেশ তখনো কাঁপছে। পথের কুকুরগুলো ডেকে চলেছে একটানা। শিরীষ গাছটায় ঝোড়ো হাওয়ার দোলা লেগেছে, শন-শনানির আওয়াজ উঠছে একটা। কোথায় যেন তীব্র তীক্ষ্নস্বরে পুলিশের বাঁশি বাজল।

শ্যামলাল একটু সামলে নিয়ে আবার বললে, "আচ্ছা—"

"বলে ফেলুন।"

"মানে—মনে করুন—" শ্যামলাল একটা গলা খাঁকারি দিলে, "ওই সাহেবী আবহাওয়া থেকে বাইরে যদি কোথাও—" শ্যামলাল আবার ঢোক গিলল, "বাইরে যদি কোথাও মন্দিরার বিয়ে হয়, তবে ও কি সুখী—"

"সুখী হবেই তো। সাদাসিদে গেরস্থর ঘরেই ওকে মানাবে ভালো।"

শ্যামলালের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "জানেন, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কোন সাদাসিদে ঘরেই ওকে মানাবে ভালো। তাই বলে কি

আর ওর রান্নাবান্না করতে হবে? চাকর-ঠাকুর সবই থাকবে। তবে হয়তো মোটরে চাপতে পারবে না, কিংবা টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে হবে না—"

"কোনো দরকার নেই।" অতীশ জানালা গলিয়ে সিগারেটটা বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলে, "ওসব তেমন ওর পছন্দও নয়। ও পিঁড়ে পেতে গরম বেগুনভাজা দিয়ে মুসুরীর ডাল খেতে খুব ভালোবাসে, গাড়ি চড়ে ঘোরাঘুরির চাইতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ানোই ওর পছন্দ।"

"বাঃ—বাঃ!" শ্যামলের চোখ আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "একেই বলে ভারতীয় নারী।"

"পার্ফেক্ট।" অতীশ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে।

"কিন্তু ওঁর বাবা এ-সব পছন্দ করেন?"

"না করেই বা কী করবেন? তিনি তো জানেনই, শেষ পর্যন্ত ওর সাধারণ বাঙালীর ঘরেই বিয়ে হবে।"

শ্যামলালের হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। এত জোরে যে, সন্দেহ হতে লাগল অতীশ তার শব্দ শুনতে পাবে। উত্তেজনায় তার কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

"আপনি তো অনেক খবর জানেন দেখতে পাচ্ছি।" কোনোমতে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শ্যামলাল বললে, "আপনাকে বুঝি সব খুলে বলে মন্দিরা? আত্মীয় বলে বুঝি খুব বিশ্বাস করে?"

"শুধু আত্মীয় কেন?" একটা হাই তুলে অতীশ বিছানায় পিঠটাকে এলিয়ে দিলে। অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বললে, "আমি ছাড়া এ-সব আর কে বেশি জানবে? আমাদের ঘরের সঙ্গেই তো শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে হবে মন্দিরাকে।"

শ্যামলাল কান খাড়া করল। কেমন বেসুরো ঠেকল কোথাও।

"মানে? আপনাদের ঘরের সঙ্গে কেন?"

"বা-রে!" অতীশ তেমনি সরল নিরীহ ভঙ্গিতে আলতোভাবে ছড়িয়ে দিলে কথাটা: "আমার সঙ্গেই যে বিয়ের কথা আছে মন্দিরার।"

আকাশ থেকে যেন প্রকাণ্ড একটা লোহার মুগুরের ঘা শ্যামলের মাথায় এসে পড়ল। শ্যামলাল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। প্রায় চিৎকার তুলে বললে, "কী বললেন?"

"একটা পাকা খবর দিলাম আপনাকে।" অতীশ নিশ্চিন্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ল, "আমার ডি-এসসি আর চাকরির জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলেন মল্লিক-সাহেব। কাল আমি একটা চিঠি পেয়েছি ওঁর। আমি এলাহাবাদে চলে যাওয়ার আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান।"

কথাটা ঠিক। মল্লিক-সাহেবের দিক থেকে অন্তত।

শ্যামলাল জবাব দিতে পারল না। কী একটা বলবার উপক্রম করেছিল, গলা দিয়ে খানিকটা গোঙানি ঠেলে বেরিয়ে এল।

"কী হল আপনার?" আবার সরল বিস্মিত প্রশ্ন অতীশের।

"মিথ্যেবাদী—লায়ার!" হঠাৎ একটা সিংহগর্জন বেরিয়ে এল শ্যামলালের মুখ দিয়ে।

"কে মিথ্যেবাদী? কে লায়ার?"

"কেউ না, কাউকে বলছি না।" শ্যামলালের স্বর প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ল, "মন্দিরার সঙ্গে আপনার ঠিক হয়ে রয়েছে এ-কথা আগে কেন বলেননি? চেপে রেখেছিলেন কিসের জন্যে?"

অতীশ বললে, "থামুন—আর বেশি বকাবেন না। আমার সঙ্গে মন্দিরার বিয়ে নিয়ে আপনার কী মাথাব্যথা যে, আগ বাড়িয়ে বলতে যাব আপনাকে? আপনি ও-বাড়িতে প্রাইভেট টিউশন করতে গেছেন—তা-ই করবেন। আপনার তো এ-সব দুশ্চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই।"

শ্যামলাল বোবাধরা গলায় বললে, "না, চিন্তার কোনো কারণ নেই। তা হলে আপনি ইচ্ছে করেই—ওঃ—! মানুষ কী বিশ্বাসঘাতক!" শেষটা আর বলতে পারল না, বোধ হয় চোখের জলে থমকে গেল।

অতীশ চটে গেল। কড়াভাবে বললে, "এও তো জ্বালা কম নয় দেখছি! আপনি প্রাইভেট টিউটর, বাড়ির সব খবরাখবর আপনাকে দিতেই হবে, এমন

কথা কোন্ আইনে বলে বলুন দেখি। থামুন, এখন আর বেশি বকবক করবেন না। অনেক রাত হয়েছে, প্রায় দেড়টা বাজে, আমাকে ঘুমুতে দিন।”

শ্যামলাল আর কথা বললে না। ধুপ করে নেমে পড়ল তক্তোপোশ থেকে, তারপর দুমদুম করে চলে গেল ছাদের দিকে। অতীশ চুপ করে শুয়ে শুয়ে শ্যামলালের পায়ের শব্দ শুনতে লাগল। কোথায় যাবে—ছাতে? সেই ঘুঁটের ঘরে? সেখানেই কি শুকনো গোবরের উপর বসে বসে নতুন করে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করবে শ্যামলাল? তিন মাস ধরে ওর যে ব্রতচ্যুতি ঘটেছে, সারারাত ধরে সরস্বতীর কাছে চোখের জল ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করবে তার?

কিন্তু খামোখা শ্যামলালকে এমনভাবে আঘাত করল কেন অতীশ? একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল, শ্যামলাল বড্ড বকর-বকর করছিল মাঝরাতে। যেভাবে শুরু করেছিল, তাতে আর সহজে ঘুমুতে দিত না। অথচ আজ রাতে তার ভালো করে ঘুমোনোটা একান্তই দরকার। সেই ঘুম ভাঙিয়ে দেবার শাস্তি খানিকটা দেওয়া গেল শ্যামলালকে।

শুধু কি এই? না, আরো কিছু ছিল এর ভিতরে? তার চোখের সামনে দিয়ে শ্যামলাল একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে মন্দিরার দিকে, সেই জন্যে কি খানিকটা ঈর্ষাও ছিল তার মনে? আর ঈর্ষা থেকেই কি এই আঘাত?

অতীশ চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। একবার অবশ্য ভাবল: শ্যামলাল বড় বেশি আঘাত পেয়েছে—এই মাঝরাতে একা ছাদে গিয়ে সে কী করছে সেটা দেখে এলে মন্দ হয় না। কিন্তু কী লাভ? মৃদু অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল অতীশের ঠোঁটের কোনায়। শ্যামলালের মতো হিসেবী ছেলেরা অত সহজেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে না। প্রেম করে বিয়ে করতে গিয়েও যদি পণের টাকার গোলমালে তার বাপ আসর থেকে তাকে তুলে আনে, তা হলে সে চোখের জল মুছতে মুছতে বাপের পিছনে পিছনে গাড়িতে এসে উঠবে। আর কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু সত্যিই কি মন্দিরাকে সে বিয়ে করবে? মল্লিক-সাহেব চিঠিতে তো স্পষ্ট করেই সে-কথা লিখেছেন।

ক্ষতি কী! কোনো ভাবনা নেই, কোনো দায়িত্ব নেই, জীবনের ঘাটে নিশ্চিন্তে নোঙর ফেলা। নির্ঝঞ্ঝাট—নিশ্চিন্ত! নিজের গৃহিণীপনার বাইরে এতটুকুও দাবি করবে না মন্দিরা, সুপ্রিয়ার মতো অতখানি চাইবার শক্তি তার নেই।

কেবল, কেবল সুপ্রিয়াকেই যদি ভুলতে পারা যেত! মন্দিরা সম্পর্কে সাধ্যমতো রোমান্টিক হতে গিয়েও সে কিছুতেই পেরে উঠছে না। সুপ্রিয়ার একটা বিষণ্ন ছায়া এসে মন্দিরার মুখখানাকে আড়াল করে দিচ্ছে বার বার।

পঞ্চম অধ্যায়

এক

অমিয় মজুমদার অপরিমিত খুশি হয়ে বললেন, "আরে এসো, এসো। কেমন আছো?"

অতীশ পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। বললে, "চলছে একরকম।"

"কাগজে পড়েছিলাম তুমি ডি-এসসি হয়েছ। ভারী খুশি হয়েছিলাম। আমি তো বরাবরই জানি, তোমার মতো ছেলে আর হয় না।" সস্নেহ দৃষ্টিতে অতীশের সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে অমিয় মজুমদার বললেন, "কী করছ এখন? বিলেত-টিলেত যাবে তো?"

"না, বিলেত যাওয়া আপাতত হবে না। চাকরি পেয়েছি।"

"কোথায়?"

"এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে।"

"ভালো, খুব ভালো। জএন করছ কবে?"

"আরো হপ্তা তিনেক দেরি হবে।"

"বেশ—বেশ!" অমিয় মজুমদার প্রসন্ন মনে বললেন, "রেবার বিয়েটাও দেখে যেতে পারবে।"

"ঠিক হয়ে গেছে নাকি?" হঠাৎ কোথায় একটা আঘাত লাগল অতীশের: "কোথায় ঠিক করলেন?"

"জামশেদপুরে। টাটায় চাকরি করে ছেলেটি, ইঞ্জিনীয়ার।" তৃপ্তভাবে অমিয় মজুমদার বললেন, "দেখতে শুনতে মোটামুটি ভালোই। তা ছাড়া বাড়িতে গানবাজনার চর্চাও আছে। ছেলের বাবা খুব ভালো পাখোয়াজ বাজান, অনেক বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন।" অমিয়বাবুর চোখে খানিকটা

আবিষ্ট সুখস্মৃতি ফুটে উঠল, "আমি তো গেলাম কথাবার্তা পাকা করতে। তা কথাবার্তা কী আর হবে, সারা সন্ধ্যে আমায় পাখোয়াজ বাজিয়েই শোনালেন। হাত আছে বটে। যেন পাখোয়াজেই সাতটা সুর তুলে দিলেন ভদ্রলোক।"

অতীশ চুপ করে রইল। কেউ অপেক্ষা করবে না, কেউ না। সে জানত, তার উপরেও অমিয়বাবুর লোভ আছে, শুধু সাহস করে মুখ ফুটে বলতে পারেন না। শুধু তার দিক থেকে একটুখানি ইঙ্গিতের অপেক্ষা ছিল মাত্র। আর মস্ত বড় একটা হৃদয় ছিল রেবার। সেই হৃদয় তাকে পাখির নীড়ের মতো আশ্রয় দিতে পারত।

রেবা তো জানে সুপ্রিয়া তার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। যদি কোনোদিন ফিরেও আসে, তা হলেই বা কী আসে যায়? মহাভারতের সঙ্গীত-তীর্থে-তীর্থে পূর্ণকুম্ভ সে ভরতে চলেছে, তা দিয়ে সে যে বিগ্রহের অভিষেক করবে, সে আর যে-ই হোক অতীশ নয়। রেবা তো জানত, একমাত্র তার কাছেই অতীশ নিজেকে সম্পূর্ণ করে মেলে ধরতে পারে, সান্ত্বনা চাইতে পারে, আশ্বাস পেতে পারে। শেষ পর্যন্ত রেবা তো তাকে বলতে পারত, "আমি তো রইলামই। সুপ্রিয়ার প্রয়োজন হয়তো আমাকে দিয়ে মিটবে না, তবু যেটুকু দিতে পারব, তার দামও কম নয়।"

কিন্তু রেবা অপেক্ষা করল না। একবারও বললেন না অমিয় মজুমদার। কেউ অপেক্ষা করে না কারো জন্যে। শুধু একা অতীশই কি সুপ্রিয়ার পথ চেয়ে বসে থাকবে?

অমিয়বাবু বললেন, "বোসো, রেবাকে ডাকি, চা খাও।"

অন্য সময় হলে অতীশ বলত, "আজ থাক, আমি যাই।" কিন্তু এই মুহূর্তে ওই বিনয়টুকুও সে করতে পারল না। সত্যিই এখন তার এক পেয়ালা চা দরকার, কোথাও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকা দরকার। রেবা আসে তো আসুক, না এলেও ক্ষতি নেই।

কারো সময় নেই। চোখের সামনে দিয়ে রূপকথার গল্পের সেই মায়া-হরিণের দল ছুটে চলেছে। সময়মত ধরতে পারলে পেলে, নইলে হারালে

চিরদিনের মতো। আধবোজা দৃষ্টিতে অতীশ দেখতে লাগল ছেলেবেলার একটা দিনকে। পাহাড় ধ্বসিয়ে, অরণ্যকে উপড়ে ফেলে তিস্তার বন্যা নেমেছে, গ্লেশিয়ারের বাঁধ ভেঙে ছুটেছে উথাল-পাথাল গেরুয়া রঙের জল, দু মাইল দূর পর্যন্ত তার হাহাকার শোনা যাচ্ছে। আর সেই স্রোতের ভিতর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছে উৎপাটিত শাল-শিমুল-গামার গাছের দল। সেই ভয়ঙ্কর স্রোতের পাশে ডাঙার উপর দড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুঃসাহসী মানুষেরা। সামনে দিয়ে কাঠ ছুটে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে নদীতে, দড়ি বেঁধে কাঠকে টেনে আনবে ডাঙায়। কেউ পারবে, কেউ পারবে না। কখনো কখনো এক আধজনের সর্বাঙ্গ সেই হিমশীতল জলে কালিয়ে যাবে, কাঠের সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার স্রোত চিরদিনের মতো ভাসিয়ে নেবে তাদেরও।.

অতীশেরও কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার প্রয়োজন ছিল। হয় পেত, নইলে তলিয়ে যেত। কিন্তু এ কোথায় কোন্ ডাঙার উপরে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখল সুপ্রিয়া? নিজে এল না, কাউকে আসতে দিল না। রেবা চলে গেল, মন্দিরাও হয়তো চলে যাচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত—

অমিয়বাবু উঠে গিয়েছিলেন। রেবা এসে দাঁড়াল।

"নমস্কার। কেমন আছেন?"

"ভালো। নমস্কার।"

অতীশ তাকিয়ে দেখল। মাস তিনেক সে আসেনি, কিন্তু এর মধ্যেই কেমন বদলে গেছে রেবা। সামান্য একটু মোটা হয়ে গেছে যেন, গাল দুটো ভরে উঠেছে, চোখে খুশির আভাস চিকচিক করছে। রেবার কোনো ক্ষোভ নেই। জীবনে সঙ্গী নির্বাচনের দায় সে নেয়নি, কাজেই যে আসছে তার জন্যে তৃপ্ত মনে সে প্রস্তুত হয়েই রয়েছে।

রেবা বসল। "চা করতে বলেছি, এখনি আসবে। আপনার ডক্টরেটের জন্যে অভিনন্দন।"

"ধন্যবাদ।"

"বাবার মুখে শুনলাম, এলাহাবাদে যাচ্ছেন।"

"কী আর করা। একটা চাকরি-বাকরি তো করতেই হবে।"

রেবা অতীশের মুখের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললে, "আমি সেট্‌ল করতে যাচ্ছি, শুনেছেন বোধ হয়।"

"শুনেছি।" অতীশ হাসল: "উইশ ইউ এ হ্যাপি ম্যারেড লাইফ।"

"এবারে ধন্যবাদের পালা আমার।" রেবা আবার একটু থামল, "কিন্তু আপনি?"

"আমার কথা কী বলছেন?"

রেবা খুব সহজেই আবরণটা ভেঙে দিয়েছে। হয়তো ওরও মনের ভিতরে তীব্র জ্বালা ছিল একটা, হয়তো অতীশের যন্ত্রণা ওকেও স্পর্শ করেছিল এসে।

"সুপ্রিয়ার জন্যে কেন মিথ্যে বসে থাকবেন আর? কোনোদিন যে আপনার দাম দেবে না, কেন নিজেকে নষ্ট করছেন তার জন্যে?"

অতীশ বললে, "ঠিক জানি না।"

"ক্ষতি যা সে তো আপনারই একার।"

"তাই নিয়ম। ক্ষতি চিরকাল তো একজনেরই হয়। নদীর দুটো কূল কখনো একসঙ্গে ভাঙে না।" অতীশ হাসতে চেষ্টা করল।

রেবার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, "তার মানে ওকে আপনি ভুলতে পারবেন না কোনোদিন?"

"এতবড় কথা কেমন করে বলি?" অতীশ হাসিটাকে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করল ঠোঁটের কোনায়, "কোনোদিন কাউকে ভুলতে পারব না, এতখানি মনের জোর আমার নেই। তবে কিছুদিন হয়তো সময় নেবে। তা ছাড়া জীবনে অনেক কাজ। এলাহাবাদে গিয়ে কিছুদিন চাকরি করলে একটা বাইরের স্কলারশিপ পেয়ে যেতে পারি। নইলে নিজেই যাব। বিলেতের একটা ডিগ্রি আমার চাই। আর এত সব কাজের মধ্যে সুপ্রিয়া নিশ্চয় মুছে যাবে মন থেকে। তখন হয়তো এসে দাঁড়াব আপনাদের কাছেই। বলব, আমি তৈরি হয়ে আছি, এবারে একটি ভালো পাত্রী খুঁজে দিন।"

চা এল।

রেবা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে টি-পটে চামচে নাড়ল, তারপর চা ঢেলে পেয়ালা এগিয়ে দিলে অতীশের দিকে।

"সে আশা আমরাও করি। তবে অত দেরি না হলেই আরো বেশি খুশি হব।"

অতীশ জবাব দিলে না। তুলে নিলে চায়ের কাপ। চা-টা অতিরিক্ত গরম, ঠোঁট দুটো জ্বলে উঠল।

পথে বেরিয়ে অতীশ ভাবল, সত্যিই সে কেন দেরি করবে? কার জন্যে দেরি করবে?

সুপ্রিয়ার প্রয়োজনে? যদি কখনো সুপ্রিয়া এসে তার কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পেতে দাঁড়ায়, তা হলে সেই শুভলগ্নটিতে চরিতার্থ হওয়ার আশায়? সেইটুকুই তার চাওয়ার শেষ—তার পৌরুষের পরিণাম?

বিয়ের মরশুম পড়েছে কলকাতায়। বসন্তের ফুল ধরেছে গাছে গাছে। হাওয়াটা নেশা লাগানো। অতীশ তাকিয়ে দেখল, রাস্তার ওপারে একটা তেতলা বাড়ির ছাতের ওপর ত্রিপলের বিশাল আচ্ছাদন পড়েছে। পাশ দিয়ে বাস হর্ন দিয়ে গেল—শব্দটা শঙ্খধ্বনির মতো মনে হল। সামনে একটা 'দশকর্ম ভাণ্ডার'। অত্যন্ত স্থূল চিত্রকলার বরবধূ, মিলিত করপুট ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো। তবুও তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করল ছবিটার দিকে।

তিন মাসের মধ্যে আর চিঠি দেয়নি সুপ্রিয়া।

তার গান, তার ভারতবর্ষ। ত্র্যম্বক মহাকালের বন্দনা উঠছে সপ্ত স্বরে; জালিকাটা শ্বেত পাথরের বিরাট জলসাঘরের দেওয়ালে যেখানে সারি সারি মোগল আর রাজপুত শিল্পকলা, সেখানে এক ঝাঁক রঙিন পাখির মতো উড়ছে ঠুংরির ঝঙ্কার; দক্ষিণী মন্দিরে যেখানে অগ্নিবলয়িত নটরাজের অষ্টধাতুমূর্তি নৃত্যোদ্যত পদক্ষেপে স্তব্ধ, সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু মৃদঙ্গের স্বর।

আর এই কলকাতা। সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরি। অতীশ।

কী আছে এখানে? কতটুকু? বকুলগাছের তলায় রাত্রির একটুখানি নীল-কাজল ছায়া। কিন্তু সে-ছায়াটুকুও একান্তভাবেই অতীশের, সুপ্রিয়ার নয়। দক্ষিণী নটরাজের তৃতীয় নেত্রে একটা জলন্ত হীরা, সেই হীরার আলোয় এই ছায়াটুকু কবে মিলিয়ে গেছে সুপ্রিয়ার।

অতীশ দাঁতে দাঁত চাপল। কেন সে দেরি করবে?

এলাহাবাদ যাওয়ার আগে একবার বহরমপুরে যেতে হবে। দেখা করতে হবে মা-বাবার সঙ্গে। ভেবেছিল, দিন কয়েক পরেই যাবে বহরমপুরে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন অসহ্য লাগল কলকাতাকে। আজকেই বা চলে গেলে ক্ষতি কী? এক্ষুনি? কিসের বাধা তার?

অতীশ ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। ঘণ্টাখানেক পরেই একটা ট্রেন আছে।

মেসের কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্দিরা বেরিয়ে আসছে।

অতীশ দ্রুতপায়ে ফুটপাথ পার হল। ডাকল, "মন্দিরা!"

মন্দিরা চমকে উঠল। এতদিন 'আপনি' বলে ডেকে হঠাৎ 'তুমি'তে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে অতীশ। একবারের জন্যে কালো হয়ে গেল মন্দিরার মুখ।

"এই যে।" শুকনো গলায় মন্দিরা বললে, "আপনার কাছেই গিয়েছিলাম। দেখলাম আপনি নেই।"

তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে অতীশ মন্দিরার দিকে তাকিয়ে দেখল। না, কোনো ভুল নেই। একটু আগেই কাঁদছিল মন্দিরা। এখনো লালচে আভা তার চোখে, এখনো বাঁ দিকের ভিজে গালটা চকচক করছে।

তীব্র, তীক্ষ্ণ ঈর্ষায় অতীশ জ্বলে গেল। শেষ পর্যন্ত শ্যামলাল! সেই স্থূল গ্রন্থকীট, প্রায়-নির্বোধ শ্যামলাল। সে-ও ছাড়িয়ে গেছে অতীশকে। আজ একটু আগেই রেবার বিয়ের কথা শুনে মনের মধ্যে যে ঘা লেগেছিল সেটা আবার রক্তাক্ত হয়ে দগদগ করতে লাগল।

স্রোতে ভেসে চলেছে সব। অতীশ যাকে মনে করছিল হাতের মুঠোয়, ভেবেছিল চাইবামাত্র যা অর্ঘ্যের মতো লুটিয়ে পড়বে তার পায়ের কাছে, তারা

সবাই ছাড়িয়ে চলেছে তাকে। সে কাউকে পাবে না, রূপকথার একটা মায়া-হরিণকেও ধরতে পারবে না। সে যখন আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে, তখন যে যা পারে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে মাটি থেকে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তার জন্যে। কিন্তু শ্যামলাল শেষ পর্যন্ত ? মন্দিরার কী রুচি!

মাথার মধ্যে এক ঝলক উচ্ছলিত রক্তের আঘাতে বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল বহরমপুর।

"মন্দিরা!"

অপরাধীর মতো মন্দিরা দাঁড়িয়েছিল, এক দৃষ্টিতে দেখছিল দূরের বস্তির-কলের সামনে কতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে। বোধ হয় অতীশের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিল না।

"কী বলছিলেন ?"

"তোমার সময় আছে ?"

"কেন ?" মন্দিরা বিব্রতভাবে হাতের ছোট ঘড়িটার উপরে চোখ বোলাল : "একটু কাজ ছিল।"

"কাজ পরে হবে। চলো আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে ?"

"যেখানে হোক। যে-কোনো একটা চায়ের দোকানে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

অতীশের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল মন্দিরা। ঠোঁট নড়ে উঠল বার কয়েক।

"আজকে না হলে হয় না ?"

"না।" শক্ত গলায় অতীশ বললে, "কথাটা জরুরী।"

প্রতিবাদ করতে আর সাহস পেল না মন্দিরা। একবার মুখের ঘামটা মুছে ফেলল হাতের ছোট রুমালটায়। তারপর যেমন করে মানুষ নিজেকে তুলে দেয় ভাগ্যের হাতে, তেমনিভাবেই অতীশকে অনুসরণ করলে।

চায়ের একটা মনোমত দোকান পাওয়া গেল বড় রাস্তা পেরিয়ে।

সময়টা অসময়। দোকানে লোক ছিল না। তবু পুরোনো জীর্ণ নীল পর্দা সরিয়ে দুজনে একটা কেবিনেই ঢুকল। মাথার উপর পাখাটা খুলে দিয়ে বয় বললে, "কী চাই ?"

"কিছু খাবে মন্দিরা ?"

ভয়-ধরা ফিসফিসে গলায় মন্দিরা বললে, "কিছু না।"

"শুধু চা ?"

"শুধু চা।"

বয় চলে গেল। মন্দিরা আঁচড় কাটতে লাগল চায়ের দাগধরা ময়লা টেবিল-ক্লথটার উপর। অতীশ মন্দিরার মাথার পাশ দিয়ে পিছনের কাঠের দেওয়ালটাকে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ। তারপর :

"তুমি কি আজ আমার খোঁজেই গিয়েছিলে মন্দিরা ?"

তীক্ষ্ণ জড়তাহীন প্রশ্ন। মন্দিরা ত্রস্ত চোখ তুলল।

"এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন ?"

"দরকার আছে বলেই বলছি। সত্যিই কি আমার খোঁজে তুমি গিয়েছিলে ?"

মন্দিরা পাংশু মুখে বললে, "আপনি কী বলছেন আমি ঠিক—"

"বুঝতে পারছ না ?" অতীশ হিংস্র হাসি হাসল : "কার জন্যে গিয়েছিলে তুমিই জানো। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমি না থাকাতেও তোমার কোনো অসুবিধে হয়নি। শ্যামলাল ছিল, কী বলো ?"

ভয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মন্দিরা হঠাৎ যেন রুখে দাঁড়াল।

"তাতে কী অন্যায় হয়েছে ? তিনি আমার মাস্টারমশাই।"

বয় চা দিয়ে গেল। তার চলে যাওয়া পর্যন্ত নিজের ভিতরে বন্য ক্রোধটাকে কোনোমতে সংযত করে রাখল অতীশ। তারপরে চাপা গলায় যতটা সম্ভব বিদীর্ণ হয়ে পড়ল।

"কিন্তু আমি বলব, শ্যামলালের সঙ্গে মেলামেশায় এখন তোমার সতর্ক হওয়া দরকার।"

মন্দিরার গাল রাঙা হয়ে উঠল, নিঃশ্বাস পড়তে লাগল দ্রুত। চায়ের পেয়ালা তুলেছিল, নামিয়ে রাখল।

"আপনি আমার অভিভাবক?"

"এখনো নই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হতে পারি। বোধ হয় জানো, দু বছর ধরে তোমার বাবা আমাদের মধ্যে বিয়ের কথা ভাবছেন। তিনি আমায় প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন। আমি আসছে আটাশ তারিখে চাকরি নিয়ে এলাহাবাদে চলে যাব, তার আগেই বিয়েটা সেরে নিতে চাই।"

"আমার ইচ্ছে বলে কিছু নেই?"

অতীশ কঠিন ভাবে হাসল: "না, তোমার বাবার ইচ্ছেই চরম।"

যেটুকু জ্বলে উঠেছিল, তার দ্বিগুণ নিভে গেল মন্দিরা। যেন অতল জলে ডুবে যাচ্ছে, এমনি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল অতীশের দিকে। ঠোঁট দুটো আবার থর-থর করে কাঁপল, অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, "কিন্তু—"

"আমিও অপেক্ষা করে আছি। তুমি এক সময় আভাস দিয়েছিলে, আমাকে তুমি ভালোবাসো।"

মন্দিরা বসে রইল নিথর হয়ে। অতীশ উগ্র চোখে তাকে দেখতে লাগল। একটা অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে সে, হাতে-পাওয়া শিকারকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার আনন্দ।

মন্দিরা আবার শক্তি ফিরিয়ে আনল প্রাণপণে।

"কিন্তু আপনি তো সুপ্রিয়াকে—"

"ওটা ক্রোড়পত্র। তেমনি তুমিও ভালোবেসেছিলে শ্যামলালকে। আমার জীবন থেকে সুপ্রিয়া চলে গেছে, তোমার জীবন থেকেও শ্যামলালকে চলে যেতে হবে।"

"আপনি আশ্চর্য নিষ্ঠুর!" মন্দিরার গাল বেয়ে জলের একটা ফোঁটা নেমে এল।

অতীশ হাসল, তিক্ত বিষাক্ত হাসি।

"কিন্তু আদর্শ সুপাত্র। আমাকে কন্যাদান করে মল্লিক-সাহেব সুখীই হবেন। তুমিও। আজকে যে কাঁটাটা বুকের মধ্যে বিঁধছে, দু দিন পরে তার অস্তিত্বও খুঁজে পাবে না কোথাও।"

মন্দিরা আর সহ্য করতে পারল না। ছটফট করে উঠে দাঁড়াল।

"আমি আর চা খাব না। চললাম।"

"আচ্ছা, যাও। কিন্তু আজই তোমার বাবার সঙ্গে আমি দেখা করব। আশা করি, দশ-বারো দিনের মধ্যেই তিনি রেডি হতে পারবেন, কারণ এর পরে এলাহাবাদ থেকে চট করে চলে আসা আমার পক্ষে শক্ত হবে।"

মন্দিরা বেরিয়ে চলে গেল। বোধ হয় চোখের জল মুছতে মুছতেই। চায়ের দোকানের ছোকরাটা একটা কিছু অনুমান করে পর্দা সরিয়ে কৌতূহলী গলা বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের মতো গর্জে উঠল অতীশ।

"কী দেখতে এসেছিস? থিয়েটার?"

সভয়ে পালিয়ে গেল ছেলেটা।

চায়ের পেয়ালা তুলে অতীশ চুমুক দিলে। কটু বিস্বাদ চা। রেবার এগিয়ে দেওয়া চায়ের মতোই অসহ্য গরম। পৃথিবীর সমস্ত চা-ই কোনো একটা প্রাকৃতিক কারণে আজ অপেয় হয়ে গেছে।

দুই

গীতা এসে বলেছিল, "এটা বাড়াবাড়ি। এত রাতে চাকরগুলোকে জাগিয়ে এভাবে সীন ক্রিয়েট না করলেও চলত।"

সুপ্রিয়া জবাব দেয়নি। খুলে বলেনি কোনো কথা। বলেও কোনো লাভ হবে না। দীপেন সম্পর্কে গীতার একটানা পক্ষপাত।

গীতা ক্রুদ্ধ কটু গলায় আরো বলেছিল, "বাড়ি থেকে পালিয়ে আসবার মতো নার্ভ যার আছে, তার অতটা সেন্টিমেন্টাল হওয়ার কোনো মানে হয় না।"

দীপেন বেরিয়ে গিয়েছিল নিঃশব্দে। মাথা নীচু করে। নেশার ঘোরটা তার কেটে এসেছে এতক্ষণে।

সুপ্রিয়া তেমনি বসে ছিল চুপ করে। আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

"ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে দেবতা আছেন বটে, কিন্তু মানুষ এখনো দেবতা হয়ে যায়নি।" রেবার গলা।

না, দেবতা যে হয়নি, সে-কথা সুপ্রিয়াও বিশ্বাস করে। দেবতা হয়ে গেলে কি মানুষকে সহ্য করা যেত? অমন দাবি নেই সুপ্রিয়ারও।

কিন্তু তবু—

খালি ঘৃণা হয় দেহটার জন্যে। সে-দেহ মাটি দিয়েই গড়া। মাটির ফুল, মাটির ফল, মাটির আনন্দ, মাটির ক্লেদ—এরাই তার উপকরণ। তবু সেই মাটির উপরে একটা আকাশ আছে, যেখানে সপ্তর্ষি ঝলমল করে, যেখানে আশ্চর্য রঙ দিয়ে আঁকা হয় মেঘের ছবি, যেখানে ছায়াপথের আকাশগঙ্গা ঝরনার মতো নেমে আসে মানস সরোবরে। মাটির ফুলকে ফুটিয়ে তোলো সেই আকাশের বেণীবন্ধ তারায় তারায়, মাটির ফলকে সুধা-সুনিবিড় করে দাও স্নিগ্ধ শিশিরবিন্দু দিয়ে, বর্ষার বিষণ্ণ চক্ররেখাকে উজ্জ্বল করো ইন্দ্রধনুর রঙে। মাটিকে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়াই তো আর্টের কাজ। ধুলোর ঘূর্ণিকে নীহারিকায় রূপায়িত করার নামই তো শিল্প।

আর দেহ? তার কামনা হোক প্রেম, তার আশা হোক আদর্শ, মাটির দাবি চরিতার্থ হোক হেমন্তের হিরণ্যে। তার দেহকে সেই শিল্পীর চোখ দিয়েই দেখুক দীপেন। নারী হোক মোনালিসা, বাসনা ব্যাপ্ত হোক মুন-লাইট সোনাটায়। সেই ভাবের চোখ নিয়ে যদি কোনদিন দীপেন তাকে দেখত—তা হলে নিজের সব কিছু নিঃশেষে সঁপে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না সুপ্রিয়া।

কিন্তু কোথায় সেই চোখ? কার আছে? কোথায় সেই শিল্পীর আঙুল, যা মাটির সেতারে বাজিয়ে তুলবে রাগ জয়-জয়ন্তী?

অথবা তারই দোষ। হয়তো তার নিজের প্রচ্ছদপটটাই এত বেশি উজ্জ্বল,

এত বেশি তার প্রলুব্ধি যে তাকে ছাড়িয়ে ভিতরে কেউ যেতে পারল না। কেউ না। দীপেনও নয়! এ লজ্জা তো তারই।

শব্দ করে দরজা বন্ধ হল একটা। দীপেনের ঘরেই। নিজের উপর অভিমানেই হয়তো শক্ত করে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে সে। আত্মরক্ষা করতে চায়। কী গ্লানি—কী অসহ্য গ্লানি!

অনেকদিন পরে সুপ্রিয়ার একটা প্রশ্ন জাগল নিজের কাছে। সে যদি কালো হত? অসাধারণ কুৎসিত? তা হলেও কি দীপেন এমন করে কাছে টানত তাকে? বলত, "তোমার গলায় আমার না-পাওয়া সুরগুলো ধরা দিয়েছে, তুমি আমার গীতলক্ষ্মী?" বলত, "তোমার বাইরের রূপ আমি দেখিনি, দেখছি অন্তরের ঐশ্বর্যভাণ্ডার, যেখানে তুমি অনন্যা?"

বলতে পারত দীপেন?

প্রচ্ছদপট! হয়তো প্রচ্ছদপটটাই একমাত্র সত্যি। সুপ্রিয়ার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

বারান্দায় গানের আওয়াজ। কে যেন গেয়ে চলেছে। গীতাই খুব সম্ভব। কান পাতল সুপ্রিয়া:

"এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর!
তেরো চরণপর শির নাবেঁ।
সেবক জনকে সেব সেব পর,
প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর,
দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন
সুখী জনাঁকে আনন্দ এ——"

ভজন গাইছে গীতা। তার নিজের ভাষায়, বিশেষ ধরনের সুরে। কেমন আশ্চর্য কোমল, কেমন অশ্রুসিক্ত। কোথায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এর। ঠিক এখানে এই গান যেন মানায় না। বহুদিন পার হয়ে বহু দূর থেকে এর সুরটা ভেসে আসছে যেন।

সুপ্রিয়া জানত না, এ-গান গীতা শেষবার শুনেছিল অমৃতসরের গুরুদ্বারে।

* * *

"ক্যায়সে চাঁদনী রাত প্যারে—"

প্লে-ব্যাক। হিন্দী ছবির গান। খুব সম্ভব উদ্‌গীর্ণ হবে কোনো নৃত্য-পটীয়সী নায়িকার ওষ্ঠস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে।

পিছনে সারি সারি বাদ্যযন্ত্রের উগ্র ঝঙ্কার। সামনে মাইক্রোফোন। মিউজিক ডিরেক্টরের নির্দেশ: "মনিটার!"

"ক্যায়সে চাঁদনী রাত—"

সাউণ্ড ট্রাকের প্রতিধ্বনি: "ও-কে—ও-কে।"

"টেক—"

গান শেষ হল।

"চমৎকার হয়েছে রেকর্ডিং।" অভিনন্দন জানালেন ডিরেক্টর।

মিউজিক-ডিরেক্টরের মাথা নড়ল সঙ্গে সঙ্গে। দীপেনের পুরোনো বন্ধু। তারই অনুরোধে সুযোগ দিয়েছেন সুপ্রিয়াকে।

"শুধু হিট্ নয়—সুপার হিট্ হবে এই গান।"

সুপার হিটের অর্থ খুব সহজ। বাড়ির রোয়াকে। হাটে-বাজারে। পুজো-পার্বণের অ্যামপ্লিফায়ারে।

সুপ্রিয়া বসে রইল ক্লান্তভাবে। সুপার হিট্। ঠিক এই জন্যেই কি এত দূরে ছুটে আসা? এই জাপানী খেলনার বেসাতি? মন্দিরের বাইরে যেখানে মেলার বেচা-কেনা, সেখানে রঙিন বেলুনের পশরা সাজিয়ে বসা?

দীপেন বলেছে, "কী করা যায় বলো। ভালো গান তো তুমি শিখবেই। কিন্তু টাকারও দরকার আছে। আর, অনেক বড় বড় গুণীকেও বাগানবাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসতে হয়। তোমাকে একটা গল্প বলি—"

গল্পটা শুনেছে সুপ্রিয়া। একটা নয়, পর পর অনেকগুলো। বহু দিকপাল ওস্তাদকেই চুটকি গজল আর খেম্‌টা শোনাতে হয়েছে স্বর্ণগর্দভ মাতালের জলসায়। কিছুটা মানিয়ে নিতে হবেই জীবনের সঙ্গে। নইলে দীপেনই কি আসত এত দূরে, সিনেমার বইতে চটুল সুর দেবার জন্যে?

হয়তো তাই। কিন্তু সুপ্রিয়ার মন সাড়া দেয় না। কোথায় কী যেন অশুচি হয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের বাইরে বসে রঙিন বেলুনের বেসাতি। দোকানে বসে লাভ-লোকশানের হিসেব করতে করতে সময় ফুরিয়ে যাবে কি না কে জানে! তার পরে বিগ্রহ দর্শনের সুযোগও হয়তো আর ঘটবে না।

চেক আর ভাউচার নিয়ে এলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার। টাকার অঙ্কটা তুচ্ছ করবার মতো নয়, একবার ভালো করে সেটা না দেখে থাকতে পারল না সুপ্রিয়া।

আয়ার এল। মিউজিক ডিরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট।

"মিস্টার আয়ার, এবার আমায় যেতে হবে।"

আয়ার বললে, "চলুন, রেডি। আমার গাড়িতেই পৌঁছে দেব আপনাকে।"

স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছুটল তীরবেগে।

আয়ার পাশেই বসে ছিল। একটা সিগারেট রোল করে বললে, "মিস্ মজুমদার!"

"বলুন।"

"এখনি ফিরবেন? তার চাইতে চলুন না আমার ফ্ল্যাটে। কফি খেয়ে আসবেন।"

"আপনার ফ্ল্যাটে?" সুপ্রিয়া চকিত হয়ে উঠল।

আয়ার হাসল। কালো রঙ, কোঁকরা চুল, বুদ্ধিতে মুখ উদ্ভাসিত। সিগারেটটা ঠোঁটে ছুইয়ে বললে, "ভাববেন না কিছু। সেখানে আমার মা আছেন। আলাপ করিয়ে দেব তাঁর সঙ্গে।"

"আপনার স্ত্রী?"

উইণ্ডস্ক্রীনটা নামিয়ে দিতে দিতে আয়ার আবার হাসল।

"তিনি এখনো এসে জোটেননি। মানে আমিই জোটাতে পারিনি। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি নেই।" প্রসন্ন পরিতৃপ্ত গলায় আয়ার বললে, "বাড়িতে আমার মা রয়েছেন। তাঁর হাতের তৈরি কফি বিখ্যাত। তা ছাড়া আমরা বম্বে মার্কেটের কফি খাই না। নিয়ে আসি নিজের দেশ নীলগিরি থেকে।"

চমৎকার শাদা আয়ারের দাঁতগুলো। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করবার মতো।

"আসবেন আমাদের ওখানে ?"

"বেশি দেরি হবে ?

"না—না—পনেরো মিনিট। জাস্ট।"

ছোট বাংলো ধরনের বাড়ি বোম্বাইয়ের শহরতলিতে। সামনে একটুখানি লন। কিছু ফুল। গোছানো, ছিমছাম। আয়ার গুণী মানুষ, বুঝতে কষ্ট হয় না।

আয়ারের মা এলেন। পঞ্চাশ পেরিয়েছে বয়েস। মাথার চুলে পাক ধরেছে। গম্ভীর শান্ত চেহারা।

"মা, ইনি আমাদের ছবির নতুন ভোকাল আর্টিস্ট। খুব ভালো গলা, দারুণ প্রমিসিং।"

মা হাসলেন। ঝরঝরে পরিষ্কার ইংরেজীতে কথা বললেন।

"বেশ বেশ, ভারী সুখী হলাম।"

"কফি খাওয়াও। তোমার হাতের নীলগিরি কফি। সেই জন্যেই ডেকে এনেছি। কিন্তু দেরি করতে পারবে না, ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যে।"

"দিচ্ছি।" মা ভিতরে চলে গেলেন।

আয়ার বললে, "জানেন, মা আমার একটুও খুশি নন।"

"কেন বলুন তো ?"

"আমার বাবা ছিলেন আই-সি-এস। দাদা ফরেন সার্ভিসে। মা চেয়েছিলেন আমিও অমনি একটা কিছু দিকপাল হয়ে পড়ি। কিন্তু এই গানই আমার সর্বনাশ করল। আমাদের পরিবারে যা কখনো হয়নি, আমি তাই করলাম। অর্থাৎ বি-এ ফেল করলাম দু-দু বার। দাদা তো আমার মুখ দেখাই বন্ধ করলেন। কিন্তু আমি গান ছাড়িনি।" আয়ার একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল :

"অবশ্য তার পরিণাম এই ফিল্মে। কী বলেন, ভুল করেছি নাকি ?"

সুপ্রিয়া মৃদু নিশ্বাস ফেলল, "জানি না।"

এমনি করে গান তো অনেককেই ঘরছাড়া করেছে। অনেকেই ছুটে এসেছে তীর্থদেবতার আহ্বানে। তারপর? কে কতখানি পেয়েছে, কতটাই বা সিদ্ধিলাভ করেছে ? ব্যাগের ভিতরে চেকটা যেন খসখসিয়ে সাড়া দিয়ে উঠল, সুপ্রিয়াকে কী একটা বলতে চাইল অবোধ্য ভাষায়।

আয়ারও একটা নিশ্বাস ফেলল, "ঠিক কথা, আমিও জানি না। কিন্তু কেবল ক্ল্যাসিক্যাল শেখবার আশায় ছুটোছুটি করলে তো আর পেট চলবে না। রোজগার আপনাকে করতেই হবে।"

দীপেনও এই কথাই বলেছিল। সুপ্রিয়া যেন হঠাৎ অনুভব করল: স্বপ্নের দরজা সব সময়েই খোলা আছে, কিন্তু জীবন অত সহজেই পথ ছেড়ে দেয় না। তার দুর্গাশঙ্করের কথা মনে পড়তে লাগল। অনেক কষ্টেই তাঁর চলে। অথচ এখানকার অনেক বড় বড় মিউজিক ডিরেক্টর যারা তাঁর পায়ের কাছে বসে গান শিখতে পারত, তাদের বাড়ি-গাড়ি-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দেখলে—

সুপ্রিয়ার কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। পায়ের তলায় যে সোজা পথটা সে দেখেছিল চলন্ত বম্বে মেলে বসে, সেটা এখন লুপের মতো বাঁক নিচ্ছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে সাপের মতো। তীর্থেও পাণ্ডানি চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পাণ্ডানিই কি একান্ত হয়ে ওঠে? তারই হিসেব করে তীর্থ দর্শন ফুরিয়ে যায় ?

সবচেয়ে বড় কথা, আগে বাঁচা চাই। ক্ষিদেয় গলা চিঁচি করলে যা বেরিয়ে আসে, তা আর যাই হোক, তাকে গান বলে না। আয়ারের দোষ নেই, দীপেনেরও না। মিথ্যে কেন খুঁতখুঁত করে সুপ্রিয়া ?

আয়ারও চুপ করে কী ভাবছিল। চোখ তুলল।

"জানেন, একটা ছবিতে আমি ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট চান্স পাচ্ছি এবার।"

"সে তো খুবই ভালো কথা।"

"আপনি আমায় সাহায্য করবেন ?"

"আমি? আমি কী করতে পারি?"

"আপনাকে এরা পুরো ইউটিলাইজ করে না। কিন্তু দেখবেন, আমি করব। আমি জানি, সোনার খনি আছে আপনার গলায়। এমন গান গাওয়াব আপনাকে দিয়ে যে এখানকার ঝানু প্লে-ব্যাক আর্টিস্টেরাও একেবারে ম্লান হয়ে যাবে!"

আয়ারের চোখ দুটো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নতুন সৃষ্টির আনন্দে? সুপ্রিয়া কেমন সংকুচিত বোধ করল। এমনি করে তার দিকে তাকিয়ে এমনি কথা দীপেনও বলেছিল তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দশা হয় পিগম্যালিয়নের?

কিন্তু সত্যিই গান? না এখানেও সেই প্রচ্ছদপট? সুপ্রিয়া ভাবল, একটা কোনো অ্যাকসিডেণ্টে তার সমস্ত মুখটাই যদি পুড়ে বীভৎস কালো হয়ে যায়, তাহলেও কি আয়ার এ-কথা তাকে বলবে? দেখতে পাবে তার গলার সোনার খনি?

আয়ারের মা ফিরে এলেন।

কফির পেয়ালা। কিছু বাদাম। ইডিলি।

"আচার দিলে না মা?"

"সে ওরা খেতে পারবে না। ভয়ঙ্কর ঝাল লাগবে।"

"তাও তো বটে।" আয়ার হেসে উঠল, "আচ্ছা, তবে খান কয়েক বিস্কুট নিয়ে আসি—"

"না—না—দরকার নেই—"সুপ্রিয়া প্রতিবাদ করল। আয়ার কথা শুনল না, উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে।

বিস্কুট খুঁজতে দু-তিন মিনিট দেরি হল আয়ারের। তার মধ্যেই গল্প জমিয়ে ফেললেন মা।

"বিয়ে করোনি, না?"

মাথা নিচু করে সুপ্রিয়া ঘাড় নাড়ল।

আই-সি-এসের গিন্নী গম্ভীর হয়ে গেলেন, "কী যে তোমরা হয়েছ আজকালকার ছেলেমেয়ে! আমার ছেলেটাকেও রাজী করাতে পারছি না।

অথচ ফিল্মে কাজ করে, ভারী খারাপ লাগে আমার। জায়গাটা তো ভালো নয়! শেষে—"

কিছুক্ষণ সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলেন তিনি।

"তোমাদের আলাপ কতদিন?"

"মাস দেড়েক।"

"ও!" একটু চুপ করে থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, "ছেলে বলছিল, বাঙালী মেয়েদের ওর ভারী পছন্দ। সুবিধেমত মেয়ে পেলে ও বাঙালীই বিয়ে করবে। আমরা অবশ্য একটু কন্‌জারভেটিভ, তা হলেও ছেলে যদি চায়—"

কফিটা আটকে গেল গলায়। সুপ্রিয়া বিষম খেল।

আয়ার ফিরে এল। যেন একটা দুঃসাধ্য কিছু করে ফেলেছে, এমনি মুখের চেহারা।

"উঃ, কোথায় রেখেছিলে বিস্কুটের টিন। প্রায় রিসার্চ করে খুঁজে আনতে হল আমাকে।" এক মুখ হাসি নিয়ে আয়ার সশব্দে টিনটা টেবিলে রাখল, "নিন, আসুন—"

সুপ্রিয়া বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। বললে, "বিস্কুট থাক। পনেরো মিনিট কিন্তু হয়ে গেছে আপনার। এবার আপনার কফিটা শেষ করে আমাকে পৌঁছে দেবেন চলুন।"

আয়ার নিভে গেল। স্তিমিত হয়ে গেল এতক্ষণের উৎসাহ।

"সরি, কিছু মনে করবেন না।"

তিন

গান চলছিল গুরুদ্বারে।

> "এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর!
> তোরা চরণপর শির নাবেঁ—"

মাথা নিচু করে বসে আছে ভক্তের দল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কে বলবে, জীবন আছে, জীবিকা আছে? কে বলবে, অনেক দুঃখ,

অনেক গ্লানি, অনেক মিথ্যার মধ্য দিয়ে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়? এই বিশাল দরবারে খেলছে সুরের ঢেউ। ভক্তের বুকে দুলছে আনন্দের তরঙ্গ। কোনো ব্যথা নেই, কোনো শোক নেই, কোনো পরাজয় নেই কোথাও। জীবন আর জীবিকা বহু দূরের মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেছে এখন।

আনন্দ—অমৃত।

গুরু সেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন সেই অমৃতের সংবাদ। মানুষকে তা দান করতে চেয়েছিলেন দু-হাতে। কিন্তু অত সহজে দিতে পারেননি। আঘাত এসেছে, দুঃখ এসেছে, রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে বুক থেকে, ঘাতকের কুঠারে ছিন্ন মুণ্ড গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।

তবু গুরু শুনিয়েছেন শেষ কথা। আনন্দের বার্তা, অমৃতের মন্ত্র। মলিন মৃত্তিকা পবিত্র রক্তরেখায় কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেছে। ভক্তের কণ্ঠে সুরের ঝঙ্কার বেজে চলেছে:

"বনা-বনামে সাবল সাবল,
গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত-উন্নিত,
সরিতা-সরিতা চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।"

সবই তো তাঁর। অরণ্যের শ্যামশ্রী, আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের চূড়া, খরস্রোতা নদীর প্রবাহ, গম্ভীর সাগর, সব বয়ে আসছে একই আনন্দের উৎস থেকে। প্রাণ পাচ্ছে, গতি পাচ্ছে। পল্লবিত, বিকশিত হয়ে উঠছে।

"চন্দ্র সূরয বরৈ নিরমল দীপা,
তেরো জগ-মন্দির উজাড় এ—
এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
তেরো চরণপর শির নাবেঁ—"

গুরু-দরবার হয়ে যায় বিশ্বমন্দির। তার চূড়া ছড়িয়ে পড়ে নীলকান্ত আকাশে, ত্রিভুবনব্যাপী মহাবিগ্রহের এই মহামন্দিরকে আলো করে জ্বলে অনির্বাণ চন্দ্র-সূর্য। "এ হরি সুন্দর—"

ওস্তাদের তানপুরা থামে। সুর থামে না। ভক্তেরা অশ্রু-চোখে বসে থাকে ছবির মতো। অনেকক্ষণ।

বাবা প্রণাম করেন ওস্তাদজীর পায়ে।

"এ দুটি আমার মেয়ে। এটি প্রেম, এ সুরথ।"

স্নেহস্নিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ওস্তাদজী। বিশেষ করে তাঁর চোখ আটকে থাকে বড় মেয়েটির উপরে।

"এদের আশীর্বাদ করুন।" বাবা বলেন।

"আমি কী আশীর্বাদ করব? গুরুই এদের আশীর্বাদ করবেন। তিনিই তো আমাদের ভরসা।"

"ভারী ভাবনা হয়। সামান্য ব্যবসা আমার। ছেলে নেই—এ দুটি মেয়েকে—"

ওস্তাদজী জবাব দেন, "ভাবনা নেই, কোনো ভাবনা নেই। গুরু আছেন মাথার ওপর। এটি প্রেম? আহা, দেখলে জুড়িয়ে যায় চোখ। আর এর নাম সুরথ? বাঃ, ভারী সুলক্ষণা! তুমি কি ভাবতে পারো এদের কোনো অকল্যাণ হবে কোনোদিন।"

বিশ্রী শব্দে করোগেটেড-টিন-বোঝাই একটা লরি চলে গেল সামনে দিয়ে। গীতা চমকে উঠল। কতক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে এই ভাবে? কতক্ষণ ধরে সে গুরু-দরবারে স্বপ্ন দেখছিল?

সামনে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত কালো ঘোড়া। একটা বিরাট-বিশাল উদ্ধত মূর্তি। চন্দ্র-সূর্যের নির্মল দীপকে যেন স্পর্ধা করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ট্রাফিকের কর্কশ চিৎকার। সোনার মন্দির এখান থেকে বহু দূরে। ওস্তাদজীর তানপুরা এতদিনে কোথায় ধূলোর মধ্যে মিলিয়ে গেছে। আর তাঁর আশীর্বাদ? এদের কি অকল্যাণ হবে কোনোদিন?

গীতা জেগে উঠল। দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল বুক।

চারটে বাজতে আরো দশ মিনিট। পালাবে? পালিয়ে যাবে সময় থাকতে থাকতে?

"চারটের সময় দেখা কোরো কালো ঘোড়ার সামনে। ডানদিকের ফুটপাথে। আমি আসব।"

চিঠিটা পেয়েই প্রথমে বুকের স্পন্দন যেন থমকে গিয়েছিল গীতার। ভেবেছিল, চরম লজ্জা, চরম পরাজয়ের খবর বয়ে এনেছে এই চিঠি। কিছুতেই সে দেখা করবে না। তার আগে মাটিতে মুখ লুকিয়ে মরে যাবে।

তবু ঠিক তিনটে বাজতে না বাজতেই সে উঠে পড়ল। দু কান ভরে বাজতে লাগল—"চন্দ্রসূর্য নিরমলদীপা।" সেই গান তাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে এল এখানে। নিয়ে এল তার প্রথম-ফোটা দিনগুলির ভিতরে।

মন শেষ চেষ্টা করেছিল। ছুটে যেতে চেয়েছিল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। ভেবেছিল, সামনে যে-ট্রেনটা পাবে, তাতেই উঠে পড়বে। যে-কোনো মেল, যে-কোনো লোক্যাল।

সোহনলালের চিঠি। এই চিঠির প্রতিটি লাইনে লাইনে বাজছে: "এ হরি সুন্দর!" আর সেই সঙ্গে—

কলেজ সোশ্যাল শেষ হলে এক ফাঁকে আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন সোহনলাল। ইংরেজীর তরুণ অধ্যাপক সোহনলাল। প্রায় রুদ্ধ গলায় বলেছিলেন, "এই ফুলটা তোমায় দিলাম, প্রেম। আজকে এর চাইতে বড তোমায় আর কিছু দিতে পারব না।"

একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া।

কিন্তু প্রেম! তার নাম! যে-নাম ছিল জন্ম-জন্মান্তরের ওপারে: যে-নাম শুনে তার মুগ্ধ চোখে চেয়েছিলেন ওস্তাদজী, আর যে-নামে তাকে জানতেন প্রোফেসার সোহনলাল, যে-নামে তাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন।

"এ ফুল শুকিয়ে যাবে, প্রেম। কিন্তু এই ফুলের সঙ্গে যা দিলাম, তা কোনো দিন শুকোবে না।"

মনে হয় যেন কালকের কথা। এর মধ্যে কিছুই ঘটেনি, কিছুই না। সেই দাঙ্গা, সেই রক্ত। অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের বীভৎসতা দিয়ে ভরা সেই দেড় বছর। তার পরে আর এক পথ, বাঈজীর জীবন। গীতা কাউর। এরা

কোথাও নেই, কোথাও ছিল না। শুধু সেই আঠারো বছরের প্রেম প্রথম ফোটা একটি ম্যাগ্নোলিয়ার মতো তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। ওস্তাদজীর আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে মাথার উপর।

গীতা পালাতে পারেনি। দুর্নিবার একটা আকর্ষণ এখানে টেনে এনেছে তাকে।

নাচের আসরে তাকে দেখে ঠিকই চিনেছিলেন সোহনলাল। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ ভুল করেনি।

আসবে না, কিছুতেই আসবে না, ভেবেছিল বার বার। তবুও তাকে আসতে হয়েছে। এত ঝড় বয়ে গেছে, এত মানুষের কলুষিত ছোঁয়া তাকে চিহ্নিত করে দিয়েছে, তবু তো মনের ভিতর এমন একটা আসনে বসে ছিলেন সোহনলাল যেখানে এর কিছু গিয়েই পৌঁছতে পারেনি। সেখানে আঠারো বছরের ভালোবাসা একটা নিভৃত মন্দির গড়ে রেখে দিয়েছে। সে-মন্দির এতকাল লুকিয়ে ছিল ধুলোকাদা-মাখা আবরণের অন্তরালে। আজ সে-আবরণ সরে গিয়ে আবার সেই মন্দির দেখা দিল, আর দেখা দিল শ্বেত পাথরের বেদীতে সোহনলালের বিগ্রহ-মূর্তি। তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে দিয়ে মন বলতে লাগল: "তেরো চরণপর শির নাবেঁ—"

কালো ঘোড়াকে ঘিরে ঘিরে ট্রাফিকের কর্কশ ছন্দ। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-সাইকেল-পদাতিক। গীতা দাঁড়িয়ে রইল। এখনো তিন মিনিট। এখনো পালিয়ে যাওয়া চলে। ছুটে যাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে—উঠে পড়তে পারে যে-কোনো একটা গাড়িতে। ক্যালকাটা মেল, দিল্লী মেল, মাদ্রাজ মেল—

গীতা পালাতে চাইল, কিন্তু প্রেম তাকে ধরে রাখল কঠিন হাতে। গীতার চাইতে আজ প্রেমের শক্তি অনেক বেশী।

পাশে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। একেবারে তার গা ঘেঁষেই। গীতা চমকে সরে গেল।

ট্যাক্সির দরজা খুলে সোহনলাল বললেন, "প্রেম।"

সময় তখনো ছিল। কিন্তু গীতা কাউরকে প্রেম কাউর কিছুতেই পালাতে দিলে না। "তেরো চরণপর—"

সোহনলাল আবার বললেন, "এসো।"

গীতা গাড়ির মধ্যে পা বাড়াল।

জুহুর নারকেল-বীথির মর্মর, অবিশ্রান্ত হাওয়া, সমুদ্রের কলধ্বনি, তরল অন্ধকার। আকাশের তারাগুলোর মুখের উপর মেঘের ঘোমটা থমথম করছে।

কাহিনী শেষ করে গীতা তখনও কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সোহনলাল সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে চুরুট ধরালেন একটা।

"দিস্ ইজ লাইফ!" দার্শনিকের মতো বললেন সোহনলাল। এর চাইতে ভালো কথা আপাতত কী বলা যায় আর। অথচ কথাটা যে অত্যন্ত কর্কশ শোনাল সোহনলাল নিজেই সেটা অনুভব করলেন।

নারকেল-পাতার মর্মর আর সমুদ্রের গর্জন চলল আরো কিছুক্ষণ। গীতা মুখ তুলল। কেঁদে কী লাভ? কী হবে সোহনলালের সহানুভূতি কুড়িয়ে? ভাঙা কাচ তাতে জোড়া লাগবে না। এখন কেবল একবার প্রণাম করেই সে ফিরে যাবে।

গীতা বললে, "আপনি বিয়ে করেছেন?"

"বিয়ে?" সোহনলাল কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, "হ্যাঁ, তা আর কী করা যাবে! আমি ভেবেছিলাম, তুমি মরেই গেছ—তাই শেষ পর্যন্ত—"

ঠিক কথা, সোহনলালের কোনো দোষ নেই। শারীরিক মৃত্যু যদি না-ও হয়ে থাকে, তবু তো সত্যি সত্যিই মরে গেছে প্রেম কাউর। জীবনে আসবার আগেই যে মরে গেছে, তার জন্যে বসে বসে কেন কৃচ্ছ্রসাধন করতে যাবেন সোহনলাল?

"ছেলেপুলে?"

সোহনলাল আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

"হয়েছে, দুজন।"

"দুটিই ছেলে ?"

"না—এক মেয়ে, এক ছেলে।"

কিন্তু এ-সব প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করছে গীতা ? জেনে তার কী হবে ? এর ভেতরে সে কি নিজের কল্প-কামনাই মেটাতে চায় ? সোহনলালের কাছে গিয়ে সে কী পেতে পারত, তাই শুনে মনের বুভুক্ষা তৃপ্ত করতে চায় খানিকটা ?

সোহনলালের চুরুটের আগুন কণায় কণায় বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। কড়া তামাকের গন্ধ ঢেউয়ের মতো এসে আছড়ে পড়তে লাগল গীতার মুখের উপর।

জিজ্ঞাসা করবে না মনে করেও কিছুতেই লোভ সামলাতে পারল না গীতা।

"ওদের আনেননি এখানে ? বম্বেতে ?"

"নাঃ।" সোহনলাল বললেন, "আমি এসেছি অন্য ব্যাপারে, একটা ইণ্টারভিউ দিতে। আজকেই ফিরে যেতাম। কিন্তু পরশু সন্ধ্যায় তোমার নাচ দেখার পরে সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। শো শেষ হওয়ার পরে তোমার খোঁজ করলাম, পেলাম না। তখন ঠিকানা নিয়ে তোমায় চিঠি দিলাম।"

"গেলেই তো পারতেন আমার কাছে।"

"ইচ্ছে করেই গেলাম না।" সোহনলাল চুরুটে একটা টান দিলেন, "জানোই তো, আমরা প্রফেসার মানুষ, সব দিক আমাদের একটু সামলে টামলে চলতে হয়। হয়তো বম্বেতেও আমার ছাত্র আছে এদিকে-ওদিকে। তারা যদি কেউ দেখত যে, আমি বাঈয়ের বাড়িতে যাচ্ছি—"

গীতার হাতে আগুনের মতো কী একটা এসে পড়ল। চুরুটের খানিকটা মোটা ছাই। এতক্ষণের অবসন্ন কাতর শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে শক্ত আর সজাগ হয়ে উঠল।

সোহনলাল বললেন, "জানো প্রেম, আমি তোমাকে আজও ভালোবাসি।"

একটু আগে, মাত্র আর একটু আগেই কথাটা বললে গীতার বুকের ভেতরে সামনের সমুদ্রের মতোই ঢেউ উঠত। কিন্তু কানের ভিতরে তখনো কথাটা বাজছে—'বাঈয়ের বাড়ি'! সম্মানের ভয়ে, ছাত্রদের চোখে নেমে যাওয়ার আশঙ্কায় সেখানে যেতে পারেননি সোহনলাল। তাই চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছেন, তাই তাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন কালো ঘোড়ার সামনে। হাতের যেখানে ছাইটা খসে পড়েছিল, সে জায়গাটা যেন জ্বলে যেতে লাগল গীতার।

সোহনলাল বললেন, "তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ প্রেম?"

গীতার হাহাকার করে উঠতে ইচ্ছে হল: তা কি পারি? কিন্তু কিছুই বলল না—বসে রইল দাঁতে দাঁত চেপে। হাতটা জ্বলছে, মাথার ভিতরেও জ্বলছে এখন।

সোহনলাল একবার আড়চোখে গীতার দিকে তাকালেন।

"তুমি আসবে আমার সঙ্গে?"

গীতা আর থাকতে পারল না। একটু আগেকার অপমানটা তৎক্ষণাৎ খানিক বন্যার উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে চাইল।

"কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?"

"আমি যেখানে থাকি। আমার হোটেলে।"

"তারপর?"

তারপর? তারপর কী বলবেন সোহনলাল? নিজের প্রত্যেকটি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মুহূর্ত গণনা করতে লাগল গীতা। একটিমাত্র কথার উপরেই এখন যেন তার সব কিছু নির্ভর করছে। বন্যার শেষ উচ্ছ্বাসটা আসছে আকাশছোঁয়া একটা ঢেউ তুলে।

সোহনলালও দ্বিধা করলেন একটু। চুরুটের আগুনটা ঘন ঘন দীপিত হল বার কয়েক।

"চলো আমার হোটেলে।"

হৃৎপিণ্ডে এবার হাতুড়ি পড়তে লাগল।

"সেখান থেকে কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে ?"

"কোথায় আর নিয়ে যাব ? সে-উপায় তো নেই।" সোহনলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, "তোমাকে একেবারে নিজের করে পাব, এই স্বপ্নই তো আমার ছিল। অন্তত একটা রাতও তুমি থাকো আমার কাছে।"

একটা রাত, মাত্র একটা রাত! তবু এইটুকুই থাক গীতার। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও আবার ফিরে আসুক প্রেম কাউর। অন্ধকারে আঁকা থাক একটি সোনার রেখা।

"কিন্তু হোটেলে কোনো অসুবিধে হবে না আপনার ?"

সোহনলাল হাসলেন। সামনের বাঁধানো দাঁতের একটা ঝিং ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বললেন, "না। ও-হোটেলে কোনো ক্ষতি হবে না। 'রাতকে রহনে-ওয়ালীর' ব্যবস্থা ওদের আছে। ওখানে অনেকেই ও-রকম আনে।"

'রাতকে রহনেওয়ালী!' 'অনেকেই ও-রকম আনে!'

কোথা থেকে যেন একটা বন্দুকের গুলি এসে লাগল গীতার কপালে। গুরুদরবারে প্রকাণ্ড বাড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে এলিয়ে পড়ল চারদিকে। কী ভেবেছেন তাকে সোহনলাল ? তাঁর চোখে আজ নিজের এ কোন্ রূপ দেখতে পেলো গীতা!

অসহ্য, কল্পনাতীত যন্ত্রণায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ।

"মাপ করবেন, এবার আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

"তুমি যাবে না আমার সঙ্গে ?"

প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল গীতার। প্রাণপণ চেষ্টায় বললে, "রাত্‌কে রহনেওয়ালী বম্বেতে আপনি অনেক পাবেন। আপনার হোটেলের লোকেই তা জোগাড় করে দেবে আপনাকে।"

সবিস্ময়ে সোহনলালও উঠে পড়লেন: "কী হল তোমার ? আমি যে তোমাকে ভালোবাসি। আর তুমিও আমাকে—"

"না।" প্রায় চিৎকার করে উঠল গীতা: "ভালোবাসার পালা আমার শেষ

হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন আমাকে রোজগার করে খেতে হয়। আমি যাই—"

"রোজগার!" সোহনলাল শব্দ করে হেসে উঠলেন। "বুঝেছি!" তাঁর চুরুট আর চোখ দুটো একসঙ্গেই ঝকঝক করতে লাগল: "তুমি কি ভাবছ, তোমাকে ভালোবাসি বলেই আমি তার অ্যাডভান্টেজ নেব? তুমি ভেব না প্রেম, আমি তোমায় ঠকাব না।" মৃদু হেসে সোহনলাল হাত পুরে দিলেন ট্রাউজারের পকেটে।

কী বার করবেন সোহনলাল? টাকা? অসীম ধৈর্যে সোহনলালকে একটা চড় বসানোর দুর্জয় হিংস্রতাকে সংযত করল গীতা।

"থামুন বলছি!" এমন একটা বিকৃত আর্তনাদ শুনতে পেলেন সোহনলাল যে, ট্রাউজারের পকেটের ভিতর তাঁর হাতটা থমকে গেল।

এই সোহনলালই একদিন তাকে এনে দিয়েছিলেন সেই প্রথম-ফোটা ম্যাগনোলিয়া ফুলটি। বলেছিলেন, "প্রেম, এই ফুলে শুকিয়ে যাবে কাল-পরশুই। কিন্তু এর সঙ্গে যা দিলাম, তা কোনোদিনই—"

সেই সোহনলালই সেই হাতে আজ টাকা দিতে চাইছেন তাকে। রাত্কে রহনেওয়ালীর প্রণামী!

বুকফাটা কান্না হঠাৎ বুকফাটা হাসিতে ফেটে পড়ল গীতার। আগুন ঠিকরে বেরুল চোখ দিয়ে।

"পারবেন না, অত অল্প টাকা দিয়ে একটা খেলো হোটেলে আমায় নিয়ে যেতে পারবেন না। সারা হিন্দুস্থানের অনেক শেঠ তাদের পাগড়ি খুলে রাখে আমার পায়ের তলায়। আমাকে কেনা একজন প্রোফেসরের কাজ নয়, তার সারা বছরের মাইনের টাকাতেও কুলোবে না।"

বার দুই হাঁ করলেন সোহনলাল, কিন্তু একটা কথাও বলতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বোধের মতো। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে দিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল গীতা কাউর, পিছন থেকে ফিরে ডাকবার সাহস পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না তিনি।

শুধু খানিক পরে দার্শনিকের মতো স্বগতোক্তি করলেন, "স্ট্রেঞ্জ ! উইমেন্ আর স্ট্রেঞ্জ !" আবার নিজের কানে কথাটাকে ভারী কর্কশ শোনাল।

আর ও-দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল গীতা। হাতে যে আগুনের ছোঁয়াচটা লেগেছিল, এখন তা ছড়িয়ে গেছে সারা গায়ে, লাক্ষার মূর্তির মতো পুড়ে ছাই হচ্ছে সর্বাঙ্গ। যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে সে ছুটে চলল।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে ? এয়ারপোর্টে ? অ্যাপোলো বন্দরে ?

না-না-না। কোথাও নয়। এ-জ্বালার হাত থেকে কোথাও তার নিস্তার নেই !

তবে একমাত্র জায়গা আছে। রাওয়ের কাছে। গোপনে সব রকম মদের ব্যবস্থা রাখে রাও। কড়া প্রহিবিশনের শহরে তারই মতো দু-চারজন বিপন্নের পরিত্রাতা, অগতির গতি, দুর্দিনের বান্ধব।

সে-ই ভুলিয়ে দিতে পারবে এই সন্ধ্যাটাকে। ভুলিয়ে দিতে পারবে সেই গান :

"এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর
তেরো চরণপর শির নাবেঁ—"

আর ভুলিয়ে দিতে পারবে সেই মেয়েটিকে, একদিন যার নাম ছিল 'প্রেম', যার হাতে একটা ফুটন্ত ম্যাগনোলিয়া এনে দিয়েছিলেন সোহনলাল।

চার

সেই প্রসন্ন উজ্জ্বল শাদা হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, সেই চকচকে কোঁকড়া চুলের রাশ, তেমনি স্মার্ট ভঙ্গি। আয়ার এসে তরতর করে ঘরে ঢুকল।

"আপনার টেলিফোন পেয়ে কালকের রেকর্ডিং ক্যান্‌সেল করতে হল। কী হয়েছে—জ্বর ? মুখটুখও কেমন লাল হয়ে উঠেছে দেখছি !" সুপ্রিয়ার বিনা নিমন্ত্রণেই সে সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

"জ্বর আছে একটু। গায়ে আর গলাতেও ব্যথা হয়েছে।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ?"

"দরকার হবে না। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা।" বিছানার উপর উঠে বসে সুপ্রিয়া জবাব দিলে।

"তাই বলুন। অসুখ বেশী বাড়লে আমাদেরই মুশকিল।" আয়ার বললে, "ভালো হয়ে উঠুন চটপট।"

"চেষ্টা করছি।" বলেই সুপ্রিয়া চকিত হয়ে উঠল: "ও কী! ওগুলো আবার কী রাখলেন টেবিলের ওপর ?"

"কিছু না, গোটাকয়েক ফল। আঙুর, বেদানা, আপেল।"

"ছিঃ, ছিঃ, কেন আনতে গেলেন এগুলো ?"

আয়ার বললে, "আনতে নেই ? রোগীর জন্যে রোগীর খাবার নিয়ে এলাম। দোষ আছে তাতে ?" দীপ্ত দৃষ্টি সুপ্রিয়ার মুখের উপর ছড়িয়ে দিলে: "খাবেন কিন্তু—ফেলে দেবেন না পচিয়ে।"

"না, তা করব না।" সুপ্রিয়া ক্লান্ত হেসে বললে, "আপনি চা খাবেন একটু ?"

"নাঃ—থ্যাঙ্কস্। চায়ে আমার সুবিধে হয় না।"

"কফি ? তাও আছে।"

"খাঁটি নীলগিরির নেই।" আয়ার সকৌতুকে বললে, "বম্বে মার্কেটের কফি আমার ঠিক জমবে না। ও-সব আতিথেয়তার জন্যে ভাববেন না আপাতত। বেশ ভালো করে সেরে উঠে পেট ভরে একদিন বাঙালী রান্না খাইয়ে দেবেন—ব্যাস।"

বাঙালী রান্না! কথাটা খচ করে বিঁধল সুপ্রিয়ার কানে। মনে পড়ল আয়ারের মা-র কথা: "আমার ছেলের ভারী শখ বাঙালী মেয়ে বিয়ে করবে—"

মুহূর্তের জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সুপ্রিয়ার মন। সামলে নিয়ে বললে, "আমাদের রান্না খেতে পারবেন ? ভালো লাগবে ?"

"চমৎকার লাগবে।" আয়ার এবার সশব্দে হেসে উঠল: "দরকার হলে গোটা কয়েক লঙ্কা না হয় মেখে নেব তার সঙ্গে। ন্যাশনাল মশলা। কেবল মাছটা চলবে না। ওর গন্ধ সইতে পারি না।"

"বেশ, নিরামিষই খাওয়াব।"

"হ্যাঁ—খাওয়াবেন। সেই সঙ্গে বাঙালী পায়েস। আমি একবার খেয়েছিলাম। খুব চমৎকার! কিন্তু খাওয়ার কথা পরে হবে। আগে খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন। আমার সেই কাজটা মেটিরিয়েলাইজ করেছে, জানেন তো?"

"তাই নাকি?"

উৎফুল্ল মুখে আয়ার বললে, "ইনডিপেণ্ডেন্ট চান্স। কসটিউম ছবি, বিস্তর গান আছে। অন্তত ছখানা প্লে-ব্যাক করাব আপনাকে দিয়ে। সেন্‌সেশন এনে দেব।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "আচ্ছা, এবার উঠি।"

"এত তাড়া কেন?"

"একবার অর্কেস্ট্রায় যেতে হবে। সেখান থেকে একটা রি-রেকর্ডিঙে। চলি তবে—"

আয়ার দাঁড়িয়ে পড়ল। দোর পর্যন্ত এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার বললে, "সেরে উঠতে দেরি করবেন না কিন্তু। পারি তো কাল খবর নেব আবার।"

আয়ার চলে গেল। সুন্দর ওর চোখ দুটো। অতীশকে মনে পড়ে।

কিন্তু সবাই তো অতীশ নয়। আশ্রয় দিতে কেউ চায় না, সবাই আশ্রয় চায় ওর কাছে। তা ছাড়া ঠেকে শিখেছে সুপ্রিয়া। প্রচ্ছদপটেই চোখ ভোলে সকলের। মাটিকে ছাড়িয়ে উঠতে চায় না কেউ, দেখতে জানে না আকাশকে। অত সহজেই আঁকা হয় না মোনালিসার ছবি।

অথচ, সুপ্রিয়া তো নিজেকে দেবার জন্যে তৈরি হয়েই আছে। নাও—নাও—আমাকে নাও। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলছি: 'বাকী আমি কিছুই রাখব না।' কিন্তু কেবল আমার একটা খণ্ডকে চেয়ো না—কেবল আমার এই আচ্ছাদনটার মধ্যেই আমার পূর্ণ পরিচয় দাবি কোরো না। সব

দিতে পারি তখনই—যখন তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে চাইতে পারবে—যখন, তোমার দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় আমার সব কিছু উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

আয়ারকে যাই বলুক, সুপ্রিয়া বুঝতে পারছিল জ্বর বাড়ছে। গায়ে প্রচুর ব্যথা। গলার যন্ত্রণাটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বড় বেশী, দিন কয়েক স্টুডিয়োতে স্টুডিয়োতে বেশি রিহার্সাল দেবার জন্মেই কিনা কে জানে। সমুদ্রের নীল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ দুটো জ্বালা করছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে সী-গাল উড়ছে। দূরে একটা প্রকাণ্ড সাদা জাহাজ। জাহাজ দেখলে তার মন খারাপ হয়ে যায়, অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে। গঙ্গার ঘাটে বসে সে কথা অতীশকে সে বলেছে অনেক বার।

সুপ্রিয়া শুয়ে পড়বে ভাবছিল, এমন সময় দীপেন এল। সেদিনের পর থেকে একটু কুণ্ঠিত, একটু এড়িয়ে চলে। ক্ষমা চেয়েছিল পরদিন সকালে। বলেছিল, "নেশা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, ব্যালান্স ছিল না।"

সুপ্রিয়া সহজ করে দিতে চেয়েছিল। "মন খারাপ করবেন না দীপেনদা। আমি জানি, আপনি ইচ্ছে করে ও-ভাবে এসে পড়েননি।"

আজ কিন্তু সেই কুণ্ঠার ভাবটা দেখা গেল না। কেমন উত্তেজিত দীপেন, একটু চঞ্চল।

বিনা ভূমিকাতেই বললে, "একটু আগেই আয়ার এসেছিল না?"

"হ্যাঁ, এসেছিলেন," সুপ্রিয়ার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, গলায় কষ্ট হচ্ছিল, শরীরে যেন ছুঁচ বিঁধছিল। তবু বললে, "কয়েকটা ফলও দিয়ে গেলেন।"

"ও।" দীপেনের স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল: "ওর সঙ্গে অত মেলামেশা কিন্তু না করাই ভালো সুপ্রিয়া।"

সুপ্রিয়ার শরীরটা আরো আরো জ্বালা করে উঠল: "ওঁর অপরাধ?"

"অপরাধ কিছু নেই। তবে ফিল্‌ম লাইনের লোক সম্পর্কে সতর্ক থাকাই উচিত।"

মুহূর্তে সব স্বচ্ছ হয়ে গেল সুপ্রিয়ার কাছে। সেই চিরদিনের ইতিহাস। আদিম পুরুষের সেই চিরন্তন ঈর্ষা। তাই দীপেনও নীতিবাক্য শোনাচ্ছে! আর তার উৎস চিরকালের দেহ—রক্তমাংসের উপর সেই পুরোনো অধিকারবোধ, সেই এক অন্ধতা! কারো সঙ্গে কারো কোনো তফাত নেই!

"গানের লাইনের লোককেও সব সময়ে সবাই ভালো বলে না দীপেনদা!" কপালটা ফেটে পড়ছে, গলায় বিশ্রী যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে লোহার বলের মতো কী একটা আটকে আছে সেখানে। বিকৃত গলায় সুপ্রিয়া বললে, "আপনার নিজের সম্বন্ধেই কি আপনি সুনাম দাবি করতে পারেন যথেষ্ট?"

দীপেনের মুখে যেন মস্ত বড় একটা চড় এসে পড়ল। চমকে বললে, "আমি—"

"আপনি ভালো নন, হয়তো আয়ারও নয়। আপনি আমাকে সুরের লক্ষ্মী বলেন, আয়ারও হয়তো পুজোর থালা সাজাচ্ছে আমার জন্যে।" যন্ত্রণা বেড়ে উঠছে, গলার শিরায় আগুন জ্বলছে যেন। মুখ দিয়ে যে কাতরোক্তি বেরুতে চাইছিল, একরাশ তিক্ততায় সেটাকে মুক্তি দিলে সুপ্রিয়া: "কেন এ-সব মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন আমাকে নিয়ে? চরিত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর অভ্যাস নেই।"

দীপেন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই জ্বরের তীব্রতা একটা অস্বাভাবিক বাঁক নিলে। যেন প্রলাপের ঘোরে কথাটা মনে এল সুপ্রিয়ার।

"আমাকে বিয়ে করবেন দীপেনদা?"

কানের কাছে বোমা ফাটল দীপেনের।

"কী বলছেন? করবেন বিয়ে?" সুপ্রিয়ার গলা কাঁপতে লাগল।

একটা ভূমিকম্পের নাড়া খেয়ে দীপেন বললে, "বিয়ে!"

"তা ছাড়া উপায় কী। আপনারা সবাই তো একই জিনিস চান। চান অধিকার করতে। তা হলে আর অন্যকে আসতে দিচ্ছেন কেন? কেন সুযোগ দিচ্ছেন আয়ারদের?" সুপ্রিয়া বললে, "এখনো হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট পাশ হয়নি। পাশ হলে আর সময় পাবেন না।"

"তুমি ঠাট্টা করছ না তো ?" দীপেনের গলা শীর্ণ হয়ে গেল।

"ঠাট্টা আমি করিনি। বলুন, রাজী আছেন আমাকে বিয়ে করতে ?"

দীপেন স্তম্ভিত হয়ে রইল। কিন্তু সুপ্রিয়া নিজে আর সহ্য করতে পারছে না, যন্ত্রণায় তার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে। গলার শিরাটা যে-কোনো সময় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

দীপেন বিড বিড করে বললে, "এ-সৌভাগ্য আমি আশা করতে পারিনি।"

"সৌভাগ্য আপনার নয়, আমার। এত বড় গুণীর স্ত্রী হব আমি। তাঁর যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার সব কিছু আমিই পাব সকলের আগে।" বিকৃত মুখে সুপ্রিয়া বললে, "রাজী আছেন দীপেনদা ?"

"তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম—" দীপেন রুদ্ধশ্বাসে বললে, "সেদিন থেকেই আমি তৈরি হয়ে আছি।"

"তা হলে সামনের সপ্তাহে ?"

"সামনের সপ্তাহে !"

"ভয় পাচ্ছেন ?"

"না, ভয় পাইনি।" দীপেন বিপন্ন হাসি হাসল। "বলছিলাম—মানে—এত তাড়াতাড়ি ?"

"আমি ভেবে দেখলাম দীপেনদা," যন্ত্রণায় প্রলাপের মতো সুপ্রিয়া বলে চলল, "আমার আর একা থাকা উচিত নয়। আমি তাতে করে আরো অনেকের দুঃখের বোঝাই বাড়াব। তার চাইতে জীবনের কোথাও নিজেকে বেঁধে ফেলাই আমার ভালো। সেই জায়গাটি আপনার কাছেই তো পেয়েছি। আপনি গানের রাজা। নিজের যা আছে সে তো দেবেনই। যা নেই, তা-ও আমাকে এনে দেবেন। তাই আপনার ঘাটে আমি নোঙর ফেলব। আর আমারের মতো কাউকে ভয়ও করতে হবে না আপনাকে।"

"বেশ আমি তৈরী।" দীপেন জোর করে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু গলায় সংশয় কাটল না।

"কেবল শর্ত আছে একটা।"

"বলো।"

"বৌদিকে আপনার ত্যাগ করতে হবে। গীতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। ওই যে মারাঠী মেয়েটি মাঝে মাঝে আসে, যার নাম অনসূয়া, তাকে মোটরে করে রাত্রে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসাও চলবে না আর।"—জ্বরের ঘোরে একটানা বলতে লাগল সুপ্রিয়া, "এক সময় ভাবতাম, আমার অনেক বড় প্রেম আছে, যেখানে অনেকের জায়গা দিতে পারি। আজ দেখছি তা হয় না। এক-একজন এত বড় হয়ে আসে যে, সবটুকু জায়গাতেও তার কুলোয় না। আমি সইতে পারব না, একজনকে ছাড়া। আমি আপনারই হতে চাই সম্পূর্ণ করে। আপনিও আমাকে ছাড়া আর কাউকে চাইতে পারবেন না এর পরে।"

"সুপ্রিয়া!"

সুপ্রিয়া তেমনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলে চলল, "না, আমি সইব না। আপনি বৌদিকে ত্যাগ করুন, গীতাকে ছেড়ে দিন। দু চোখে অমন করে খিদে নিয়ে কিছুতেই আপনি চাইতে পারবেন না অনসূয়ার দিকে। আমি যাকে ভালোবাসি তাকে নিয়ে ভাগাভাগি কিছুতেই সহ্য করব না। যে আমার, সম্পূর্ণ করেই সে আমার। রাজী আছেন দীপেনদা?"

"সুপ্রিয়া—শোনো—"

"শোনবার কিছু নেই। স্পষ্ট জবাব দিন। বৌদিকে আপনি ত্যাগ করতে পারবেন? গীতাকে? বলুন!"

দীপেনের শরীর শিরশির করে উঠল। একেবারের জন্যে মনে পড়ল স্ত্রী সুধার দুটো কালো কালো বিশ্বাসভরা চোখ। মনে পড়ে গেল সুধার গায়ের শান্ত শ্যামশ্রী, তার চলার সেই বিশেষ ভঙ্গিটি। দীপেন যখন তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে, তখন নাম দিয়েছিল, "পুরিয়া ধানশ্রী"। আর গীতা? কত দুর্দিনের সঙ্গী, কত একান্ত কান্নার আশ্রয়। তারপর অনসূয়া—

"পারবেন না?"

"পারব।" দীপেন জবাব দিল। কাপুরুষ মনের একটা রেশ কেঁপে গেল গলায়।

"গীতা?"

"তাকেও ছেড়ে দেব।"

"আর অনসূয়া?"

"সে-ও আর কোনোদিন এখানে আসবে না।"

দীপেনের আবার মনে পড়ল অনসূয়ার সে নাম দিয়েছিল: "রাগিণী মধুবন্তী"।

"তা হলে কথা দিচ্ছেন?" সুপ্রিয়ার চোখ-মুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল, "কথা দিচ্ছেন আপনি? আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকে আপনি মনের ভাগ দিতে পারবেন না?"

"কথা দিচ্ছি।"—দীপেনের মনটা ক্রমাগত বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল সুপ্রিয়ার উপরই।

"তবে কাল, কালই বিয়ের ব্যবস্থা করুন। আমি এক সপ্তাহও দেরি করতে পারব না। আমার বড্ড তাড়া।"

কিন্তু এতক্ষণে কেমন যেন খটকা লাগল দীপেনের। না, সবটাই স্বাভাবিক নয়। অদ্ভুত লাল সুপ্রিয়ার মুখের চেহারা—গলার একটা শিরা কেমন ফুলে উঠেছে। .সুপ্রিযার চোখ দুটো একটা উদগ্র আলোয় দপদপ করছে।

মুহূর্তের কুণ্ঠার পর দীপেন সুপ্রিয়ার কপালে হাত ছোঁয়াল। অনেকখানি গরম, অল্প একটুখানি জ্বর এ নয়!

সুপ্রিয়া ততক্ষণ হাতটা চেপে ধরেছে দীপেনের।

"কথা দিয়েছেন?"

আগুনতপ্ত হাতটা সভয়ে ছাড়িয়ে নিলে দীপেন। বললে, "বলছি তো। তুমি যদি চাও, তা হলে কালই বিয়ে হবে। এখন দাঁড়াও, একটা কাজ সেরেই আসছি।"

দীপেন উঠে পড়ল। চলে এল পাশের ঘরে। ফোন করল ডাক্তারকে।

ততক্ষণে জ্বরের ঘোরে আর অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করছে সুপ্রিয়া। বলছে, "সইব না, আর কাউকেই আমি সইব না—! অতীশ, তোমাকেও না।"

দীপেন বাধ্য হয়ে মাথায় একটা আইসব্যাগ ধরল।

ডাক্তার এসে পৌঁছুলেন। সুপ্রিয়াকে পরীক্ষা করেই গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

বললেন, "এঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এক্ষুনি। আর এক মিনিট দেরি করা চলবে না।"

গীতা কেবল কিছু টের পেল না। কাল অনেক রাতে মাতাল অবস্থায় তাকে থানা থেকে উদ্ধার করেছে দীপেন, এখনো সে তার বিছানা ছাড়েনি।

পাঁচ

"চল্ মুসাফির, চল্ মুসাফির, চল্ মুসাফির চল—"

কাঠগড়ার রেলিং বাজিয়ে গান গেয়ে উঠল কান্তি।

সমস্ত আদালত চমকে উঠল। একটা প্রচণ্ড ধমক লাগাল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাওয়ালা।

কান্তি হেসে বললে, "ও, গানে অসুবিধে হচ্ছে বুঝি? তাহলে তবলাই বাজিয়ে শোনাই—" কাঠের উপর দ্রুত তালে তার হাত চলতে লাগল।

সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে একবার ভিজে ভিজে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল মুনিয়া বাঈ। করুণার রেখা ফুটে উঠল কপালে।

সরকারী উকিল বললেন, "এ শেঠজীর টাকা আর বোতাম নিয়েছিল? আর আংটি?"

মুনিয়া বাঈ একটা ঢোক গিলল।

"না, তা ঠিক নয়।"

উকিল আশ্চর্য হয়ে গেলেন, "এ চুরি করেনি ?"

মাটির দিক মুখ নামিয়ে মুনিয়া বাঈ বললে, "না।"

কান্তির তবলা বাজানো থেমে গেল। চেয়ে রইল অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

উকিল বললেন, "চুরি করেনি ? তবে কী হয়েছিল ?"

মুনিয়া বাঈ আর-একবার সিক্ত চোখে তাকাল কান্তির দিকে। গড়গড় করে বলে গেল তারপর :

"শেঠ তো ঘুমিয়ে পড়লেন। আমারও জবর নেশা ধরেছিল। বুঝলাম আর বেশিক্ষণ হোঁশ থাকবে না। তখন আমি বললাম, 'বাবুজী দিনকাল ভালো নয়। আপনি সাঁচ্চা আদমি, শেঠের আঙুঠি—বোতাম ব্যাগগুলো একটু দেখবেন। কাল সকালে দিবেন শেঠজীকে। এ-সব কাজ আমাদের এখানে হামেশাই হয়। বাবুজী মালুম হচ্ছেন তা-ই করেছিলেন। লেকিন বুড়া ওস্তাদ সে-কথা জানত না। সে বাবুজীকে চোট্টা বলে পাকড়াও করে—"

কিন্তু মুনিয়া বাঈ আর বলতে পারল না। তার আগেই চেঁচিয়ে উঠল কান্তি।

"না—না—না—"

পাহারাওয়ালা ধমকে উঠল, "চুপ !"

কিন্তু কান্তি চুপ করল না। তেমনি চিৎকার করে বলে গেল, "আমি ওগুলো চুরি করে পালিয়ে যেতেই চাইছিলাম। এমন সময় সারেঙ্গিওয়ালা এসে ধরল আমাকে। পালাতে চাইলাম পারলাম না।" কান্তি উৎসাহিত ভাবে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "তখন এই দু হাতে আমি তার গলা টিপে মেরে ফেললাম !"

মুনিয়া বাঈ পাংশু হয়ে গেল। রেলিং চেপে ধরল শক্ত করে।

উকিল একবার তাকালেন তার দিকে।

"আচ্ছা বাঈ, আপনি যেতে পারেন। আর দরকার নেই।"

কান্তির মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে আর একবার তাকিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে গেল মুনিয়া বাঈ।

আদালতের নিশ্বাস পড়ছিল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল জজের গলার স্বরে।

"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে আপনি এমন জঘন্য অপরাধ করলেন কান্তিবাবু?"

কান্তি প্রচণ্ড অট্টহাসি করে উঠল। আঁতকে সরে দাঁড়াল পাহারাওয়ালাটা।

"ভদ্রলোকের ছেলে! কে ভদ্রলোকের ছেলে? আমার বাপও খুন করেছিল, খুনীর রক্ত আমার শরীরে। এমন কাজ আমি করব না তো কে করবে!"

একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ভরে গেল আদালত। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন একজন ভদ্রমহিলা। কান্তির মা। তারাকুমার তর্করত্নের একমাত্র মেয়ে ইন্দুমতী।

জুরীরা উঠে গেলেন। বেশী সময় লাগল না তাঁদের। আসামীর স্বীকারোক্তিতে এতটুকুও কুয়াশাও নেই কোথাও।

"গিল্‌টি।"

আরো আধ ঘণ্টা মাত্র সময় নিলেন জজ।

সংক্ষিপ্ত রায়। শাস্তি একটু কম করেই দিয়েছেন। কারণ, আসামী যে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়, তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই।

"দশ বছর।"

"দশ বছর!" কান্তি অট্টহাসি হেসে বললে, "আমার ফাঁসি হল না? ভারী আশ্চর্য তো।" এই বলে সে কাঠগড়ায় রেলিঙের উপর অত্যন্ত কঠিন একটা তাল বাজাতে লাগল। পাহারাওয়ালাকে বললে, "দেখছ হাত? এমনি তৈরি হয়নি দাদা, অনেক মেহনত করতে হয়েছে এর জন্যে।"

রায়টা শুনতে পেলেন না ইন্দুমতী। তিনি তখন হাসপাতালে। তখনো তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। ডাক্তারেরা সন্দেহ করেছিলেন, মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে।

ছয়

আজকে অনেকক্ষণ ধরেই ট্রাম-স্টপের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলাল। উপায় নেই, কারণ ইদানীং সে মল্লিক সাহেবের বাড়িতে পড়াতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। যেদিন থেকেই শুনেছে অতীশের সঙ্গে মন্দিরার বিয়ের আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে বাড়িতে, আর পড়তে বসে যেদিন জলভরা চোখ তুলে মন্দিরা বলেছে, 'এমনি করেই কি সবকিছু ফুরিয়ে যাবে আমাদের—' সেদিন থেকেই শ্যামলাল আর বালীগঞ্জ প্লেসের ত্রিসীমানাও মাড়ায় না।

আগে রবিবারে প্রায়ই মেসে থাকত না অতীশ। আর সেই ফাঁকে দুপুরবেলার দিকে মন্দিরা আসা-যাওয়া করত। কিন্তু কী যে হয়েছে আজকাল। অতীশ তার বিছানার উপর প্রায় সব সময়ই লম্বা হয়ে পড়ে থাকে, সিগারেট টেনে যায় একটার পর একটা। অসহ্য নিরুপায় ক্রোধে শ্যামলাল বজ্রদৃষ্টি ফেলে তার দিকে। অতীশ ভ্রূক্ষেপ করে না। বরং :

"আমাদের বিয়েতে কিন্তু আপনাকে বরযাত্রী যেতেই হবে শ্যামবাবু।"

কাটা ঘায়ের উপরে নুনের প্রলেপ পড়ে যেন। না-শোনবার প্রাণপণ চেষ্টায় যেন যোগাভ্যাস করতে থাকে শ্যামলাল।

"ও শ্যামবাবু, শুনছেন? আরে, ও-মশাই শ্যামবাবু।"

যোগাভ্যাসে আর কুলিয়ে ওঠে না এরপর; ক্ষিপ্ত চোখ তুলে শ্যামলাল বলে, "কী, কী বলছেন? দেখছেন না পড়ছি? কেন বিরক্ত করছেন এ সময়ে?"

"আরে পড়া তো মশাই আছেই আপনার বারো মাস। একটু গল্প করুন না।"

"আমার সময় নেই।" শ্যামলাল কান্না চাপতে চেষ্টা করে।

"সময় কি আর কারো থাকে মশাই, ওটা তৈরি করে নিতে হয়। শুনুন না, যা জিজ্ঞেস করছিলাম। আমাদের বিয়েতে আমি মন্দিরাকে খুব একটা ভালো জিনিস প্রেজেন্ট করতে চাই। কী দেওয়া যায় বলুন তো?"

শ্যামলালের এইবারে ইচ্ছে হয় কেমিস্ট্রির মোটা একখানা বই তুলে ছুড়ে মারে অতীশের মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু এমন সহিংস প্রতিশোধ নিতে তার শক্তিতে কুলোয় না, সাহসেও নয়। অসহ্য হয়ে উঠে পড়ে তক্তপোশ থেকে, চটির ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ তুলে বেরিয়ে চলে যায় ঘর থেকে।

"যাচ্ছেন কেন? আরে ও মশাই, ও শ্যামলালবাবু। আরে শুনুন ও শ্যামবাবু—"

পিছন থেকে অতীশ ডাকছে।

"আরে অত উত্তেজিতভাবে কোথায় চললেন? শুনুন না—"

আবার সেই ছাতের ঘরে। সেই ঘুঁটের স্তূপের উপর।

কিন্তু সব অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন আর ওই ঘুঁটের মধ্যে এসে বসলেই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চারদিকের শুকনো গোবর আর কয়লার গন্ধ তার ইড়াপিঙ্গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে আত্মস্থ করে তোলে না। চোখের সামনে আবির্ভূত হন না সরস্বতী, তাঁর এক হাতে কেমিস্ট্রির বই, আর এক হাতে টেস্‌ট টিউব; পিছনে এসে মাথার উপর হাত রাখেন না স্বনামধন্য রাসায়নিক আচার্য, বলেন না, 'বৎস তোমার কাজ তুমি করে যাও। সাধনায় সিদ্ধিলাভ তোমার হবেই!'

কিছুতেই কিছু হয় না শ্যামলালের। আগে মন চঞ্চল হলেই এখানে ধ্যানে বসত শ্যামলাল। কিছুক্ষণের ভিতরেই সব একদম প্রশান্ত হয়ে যেত, একেবারে সমাধির অবস্থা। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ঝড় বয়ে গেছে তার তপস্যার উপর দিয়ে।

এখন শ্যামলালের মনে হয়, ঘুঁটের স্তূপের মধ্যে অসংখ্য পিঁপড়ে আছে। পায়ের কাছে কী একটাকে সেদিন নড়তে দেখেছিল, কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল—তেঁতুল বিছে। এক লাফে সে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল।

আগে কখনো এমন হয়নি। এ-সব তুচ্ছ জিনিসকে সে গ্রাহ্যও করত না।

কিন্তু তবু এর ভিতরে এসেই এখনো বসতে হয় তাকে। আত্মশুদ্ধির জন্যে নয়, অন্তর্জ্বালার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে। সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয় অতীশকে খুন করা, নইলে পালিয়ে যাওয়া এখান থেকে।

প্রথমটা অসম্ভব। দ্বিতীয়টাও খুব সম্ভব নয়। মেসের আর কোনো ঘরেই জায়গা নেই; আর থাকলেও যারা আছে তাদের সঙ্গে শ্যামলালের বনিবনা হওয়া শক্ত। তাদের অনেকেই সুযোগ পেলে শ্যামলালের পিছনে ফিঙের মতো লাগে। তারপর মেসে এ-ঘরটাই একেবারে দক্ষিণমুখী, দরজা খুললেই পুবের আকাশ। আরো বড় কথা, কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে পড়াশোনার আবহাওয়াটা সৃষ্টি করে নিতেই বেশ খানিকটা সময় লাগে।

কী করা যায় তা হলে?

একটা মাত্র উপায় ভেবে পেয়েছে শ্যামলাল। কেওড়াতলার শ্মশানে গিয়ে এক-আধটু খোঁজ-খবর করে দেখলে মন্দ হয় না। ওখানে নাকি মধ্যে মধ্যে একজন দুজন তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসী আসেন। তাঁদের দ্বারস্থ হলে হয় না? হয়তো কোনো তুকমন্তরের ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন, যাতে করে অতীশ—

কিন্তু তখনি জিভ কেটেছে শ্যামলাল। ছি-ছি। একজনকে মেরে ফেলবে সে? এত নীচে নামবে? ছিঃ!

কী করা যায়?

কিছুই করা যায় না। শুধু যন্ত্রণা, অবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। আজ পনেরো দিন ধরেও একটা লাইনও সে পড়তে পারেনি। কলেজে গেছে, অথচ যা কিছু শুনেছে তাদের কোনো অর্থবোধ হয়নি তার। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে অ্যাসিডে হাত-পা পুড়িয়েছে, ভেঙে ফেলেছে একরাশ কাচের অ্যাপারেটাস। গচ্চা দিতে হবে। অথচ—

কিছুই করা যায় না।

আর এর মধ্যে থেকে থেকে অতীশ জুড়ে দেয়: "বসে বসে অত কী দুশ্চিন্তা করছেন ও মশাই শ্যামলালবাবু? আসুন, গল্প করি একটু।"

যখন পারে রাস্তায় চলে আসে। যখন রাস্তায় সম্ভব হয় না, তখন ঘুঁটের ঘরে। আর বেলা দশটায়, বিকেল পাঁচটায় ট্রাম-স্টপের সামনে এসে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকে। ছুটো উগ্র চোখ মেলে প্রতীক্ষা করে মন্দিরার।

আজও দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামলাল।

এর ভিতরে জন সাত ভিক্ষুক পয়সা চেয়ে গেল, চারজন লোক তাকে পথের কথা জিজ্ঞেস করল, তিনজন জানতে চাইল কটা বেজেছে, কোথা থেকে এক ভদ্রলোক এসে খামোকা গায়ে পড়ে বলতে লাগলেন, "শীত শেষ হয়ে গেল মশাই, এখন বাঁধাকপি গোরুতে খায়!" আরো উত্তেজিত হয়ে শ্যামলালের কানের কাছে তিনি সমানে শুনিয়ে চললেন, "তবু ব্যাটারা বলে ছ আনা সের। বলুন—এতে কারো মাথা ঠিক থাকে? না এমন চললে বাজার করা যায়? বুঝলেন—ছ্যাঁচড়া, সব ছ্যাঁচড়া!"

শ্যামলাল সরে গেল। ভদ্রলোকও সরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"মশাইয়ের মুখখানা যেন চেনা-চেনা।"

"আমি আপনাকে চিনি না।"

"দাঁড়াও—দাঁড়াও। তুমি কেদার নও? মগরাহাটের নিতাইদার ছোট ছেলে না?"

শ্যামলাল চটে গিয়ে বললে, "না। আমার নাম শ্যামলাল ঘটক।"

"অঃ—ভুল হয়েছে।" বলেই ভদ্রলোক সামনের একটা চলতি বাসে লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

দশটা। শ্যামলাল তীর্থের কাকের মতো ট্রাম-স্টপের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সামনে। বেশি কিছু আশা তার নেই—বড় কোনো লাভের ভরসাও নয়। কলেজে যাবে মন্দিরা। সে কেবল দূর থেকে একবার তাকে যেতে দেখবে। ব্যাস—এইটুকুই।

একদল মেয়ে এল কলরব করতে করতে। আরো কয়েকটি দাঁড়িয়ে ছিল ইতস্তত। সবই কলেজের ছাত্রী। কিন্তু ওদের মধ্যে মন্দিরা নেই।

তখন আর-একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে এল। যদি মোটর করে কলেজে চলে যায় মন্দিরা?

শ্যামলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর একটু অপেক্ষা করবে, না চলে যাবে, এ-সম্পর্কে একটা কিছু ভেবে নেবার আগেই পিছন থেকে ডাক এল: শোনো?"

তীরবেগে ফিরে দাঁড়াল শ্যামলাল। মন্দিরা।

আশে পাশে কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে চাপাগলায় মন্দিরা বললে, "রোজই দেখি এখানে এসে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। সাহস করে কাছে আসতে পারো না একবার? ভিতু কোথাকার!"

সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে শ্যামলাল দাঁড়িয়ে রইল, কথা বলতে পারল না। বুকের ভিতরে তুফান চলতে লাগল।"

মন্দিরা বললে, "চলো।"

"কোথায়?"

"কলেজ পালাব আজ।"

"আর আমি?" নির্বোধের মতো শ্যামলাল জিজ্ঞেস করলে।

"তোমার সঙ্গেই তো পালাব।" মন্দিরা ভ্রূকুটি করলে, "নইলে কি একা একা ঘুরে বেড়াব সারা দুপুর?"

"আচ্ছা!"

"তোমার খাওয়া হয়েছে?"

শ্যামলাল মিথ্যে কথা বললে, "হয়েছে।"

"তা হলে উঠে পড়ো।"

"কিসে?"

"আঃ—ওই যে ডালহৌসির ট্রাম আসছে, ওটাতেই।"

"কিন্তু ড্যালহৌসির ট্রামে চেপে যাব কোথায়?"

মন্দিরা বিরক্ত হয়ে বললে, "ওঠো না তুমি। কোথায় যাওয়া হবে, সে-ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। ওঠ চটপট। দেখছ না কলেজের মেয়েগুলো তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে?"

অগত্যা ট্রামেই উঠতে হল।

কিন্তু বেলা দশটার ট্রামে ওঠা কাজটা খুব সহজ নয়। বরাবর সে এই সমস্ত ভয়াবহ ট্রামকে এড়িয়েই এসেছে সাধ্যমত। আজ কী করে যে উঠল শ্যামলাল, তা সে নিজেই জানে না। আর ওরই ভিতরে ফাঁক দিয়ে গলে কখন উঠে পড়ল মন্দিরাও।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলাল, প্রাণপণে সামলাতে লাগল চশমা। দুজনকে আসনচ্যুত করে বসবার জায়গা পেল মন্দিরা।

কেন চলেছে শ্যামলাল? কিসের আশায়? এখনো তার খাওয়া হয়নি। অত্যন্ত জরুরী একটা ক্লাস ছিল আজকে। একজনের কাছ থেকে ভালো একটা নোট পাবার কথা ছিল। সব ছেড়েছুড়ে সে কেন চলেছে, কোথায় চলেছে? মন্দিরা কি কোনো উপায় বলে দিতে পারবে?

কিসের উপায়? যার বাবা পুরুলিয়ায় গালার ব্যবসা করেন, হাঁটুর নীচে কাপড় পরেন না, দশটা ভাইবোন, মল্লিক-সাহেবের বাড়িতে তার এতটুকুও আশা কোথায়? "ওয়ানটেনথ অব কুরুবংশ!" কানের কাছে বাজছে এখনো।

বাপ মা, জিলিপি-দিয়ে-মুড়ি-খাওয়া ভাইবোন, সব কিছুর উপর একটা তীব্র ক্রোধে জ্বলে যেতে লাগল শ্যামলাল। মনে হল, সবাই ঠকিয়েছে তাকে, চক্রান্ত করে বঞ্চনা করেছে। মল্লিক-সাহেবের সেদিনের চোখদুটো মনে পড়ল। যেন একটা এক্স-রে ক্যামেরা দিয়ে তার ভিতরের সব কিছু দেখে নিচ্ছিলেন। তাঁকে কোথাও ফাঁকি দেবার জো নেই।

আর অতীশ। ছেলেবেলার পরিচয়। আত্মীয়তা। ডি-এসসি ডিগ্রী। ভালো চাকরি পেয়েছে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে।

মন্দিরা কী করতে পারে?

শ্যামলাল ভাবতে পারল না। একটা ফাঁকা মন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ট্রামের রড ধরে। দুটো টিকিট মন্দিরাই কিনল। শ্যামলাল ভাসতে লাগল শূন্যতার উপরে। যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখতে লাগল আচ্ছন্ন চোখে।

বেলা এগারোটার ইডেন গার্ডেন। ইতস্তত দু-চারজন বেকার। নানা রঙের কয়েকটা ফ্লাওয়ার-বেড। গাছের ছায়া। শ্যাওলাজমাট কালো জল ঝিলের। তার উপর কয়েক টুকরো ভাসমান কাগজ, একটা সিগারেটের প্যাকেট।

শ্রীহীন অপরিচ্ছন্ন বর্মী প্যাগোডার পাশে, জলের দিকে মুখ রেখে একরাশ মুমূর্ষু ঘাসের উপরে বসল দুজনে।

মন্দিরা বললে, "আর সাতদিন।"

শ্যামলাল রক্তহীন মুখে জবাব দিলে, "জানি।"

"অতীশদা আমাকে জোর করে বিয়ে করছে।"

শ্যামলাল ঠোঁট কামড়াল, "তা-ও জানি।"

"কিছুই করা যাবে না?" মন্দিরার চোখে ক্ষুব্ধ নিরাশার জ্বালা জ্বলতে লাগল, "কিছুই করবার নেই?"

"তোমার বাবাকে—"

"বাবাকে?" মন্দিরা অধৈর্যভাবে থামিয়ে দিলে কথাটা, "বাবাকে বলে কী হবে? কী যে তিনি তোমাকে"—একটা অত্যন্ত অপ্রিয় কথা মুখে এসেছিল, মন্দিরা সামলে নিলে।

"কেন, আমি কি মানুষ নই?" শ্যামলালের পৌরুষে খোঁচা লাগল।

"তাঁর স্ট্যাণ্ডার্ডে নয়। তুমি যদি কুলীন জাতের কোনো চাকরি-বাকরি করতে, বিলেতে যদি তোমার কোনো আত্মীয়স্বজন থাকত, তোমার বাবা যদি বালীগঞ্জ না হোক অন্তত রিজেন্ট পার্কেও একটা বাড়ি করতেন—"

যদি। বলবার কিছু নেই। সবই শ্যামলাল জানে। খুব বেশি করেই জানে। অনেক দিন অনেক রাতের অনেক অসহ্য জ্বালার মধ্য দিয়েই তাকে তা জানতে হয়েছে।

"কী করা যায়?"

মন্দিরা ক্ষেপে উঠল হঠাৎ।

"কী করা যায়? এ-কথা তুমি হাজারবার বলেছ, আমিও বলেছি। কিন্তু বলে লাভ নেই আর। এবার যা হয় কিছু একটা করে ফেলো। সাত দিন পরে আর সময় পাবে না।"

শ্যামলাল একটা মরা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিলে। চিবুতে লাগল হিংস্রভাবে।

"পালাবে?" মন্দিরা ফিসফিস করে বললে।

"অ্যাঁ!" দাঁতের কোনায় ঘাসের শিষটা আটকে গেল শ্যামলালের।

"চলো, পালিয়ে যাই।" মন্দিরার চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল।

"পালাব!" শ্যামলালের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ স্প্রীং-ছিঁড়ে-যাওয়া ঘড়ির মতো থমকে গেল। জাবরকাটা গোরুর মত ঘাষের শিষটা আটকে রইল গালের পাশে।

"তা ছাড়া আর উপায় কী?" মন্দিরার মুখে রক্তের উত্তেজিত উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ল, "আমরা চলে যাই কলকাতা ছেড়ে। যেখানে খুশি যাই। গিয়ে বিয়ে করব।"

একটা ধাক্কা খেয়ে শ্যামলালের হৃৎপিণ্ডটা আবার চলতে আরম্ভ করল। "কিন্তু থানা-পুলিশ—"

"কোর্টে দাঁড়িয়ে বলব আমি সাবালিকা। সেটা প্রমাণ হতে সময় লাগবে না।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কী? আমরা ঘর বাঁধব।"

শ্যামলাল ঘাসের শিষটা তুলে জলের দিকে ছুড়ে দিলে, "কিন্তু আমার এম-এসসি পরীক্ষা—"

"এ-বছর না হয় পরের বার দেবে।"

পরের বার দেবে? কত সহজে বলে বসল মন্দিরা। কিন্তু তার বাবা হরলাল ঘটককে তার চাইতে কে আর বেশি করে জানে! চিৎকার করে বলবেন, "পরীক্ষা দেবার মতলবই যদি ছিল না, তা হলে কলকাতায় বসে বসে আমার টাকার শ্রাদ্ধ করলে কেন? টাকা কি এতই সস্তা যে রাস্তায় খুঁজলেই

কুড়িয়ে পাওয়া যায়?" সে-ও না হয় এক রকম সইবে, কিন্তু নিজের এত দিনের আশা? পাশ করে রিসার্চ করবে, তার স্বপ্ন?

"নইলে চল, আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করি।"

"তারপর?"

"আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব। আর এখান থেকে তুমি পরীক্ষার পড়া করবে।"

"কিন্তু তোমার বাবা—"

"গোলমাল একটা তো করবেনই। কিন্তু আইন আমাদের পক্ষে আছে। আমি সাবালিকা।"

কত সহজ সমাধান। গোলমাল হবে, কিন্তু আইন আছে পক্ষে! আর ওদিকে হরলাল ঘটক? এই সমস্ত উৎপাত দেখলে তিনি ঘরে জায়গা দেবেন ছেলের বউকে? আরো তাঁর বিনা অনুমতিতে বিয়ে করবার পরে?

"আমাকে না জানিয়ে লভ্ করা হয়েছে, বিয়ে করা হয়েছে! তবে আর এ-বাড়িতেই বা কেন? এবার বউ নিয়ে নিজের পথ দেখ। অমন কুলাঙ্গার পুত্রের আমি মুখদর্শনও করতে চাইনে।"

তাতে ক্ষতি নেই হরলাল ঘটকের, পিণ্ডলোপের আশঙ্কা নেই বিন্দুমাত্রও। শ্যামলালের পরে আরো পাঁচ ভাই। পরলোকের ব্যবস্থা আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছেন হরলাল।

নিজের পথ দেখবে শ্যামলাল। তার মানে আলাদা বাসা করতে হবে তাকে। সে-বাসা জোগাড় করা কি এতই সহজ? আর জোগাড়ও যদি হয়, তার খরচ চালাবে কে? তার মানে যেমন করে হোক একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে শ্যামলালকে এবং সেটা বড় জোর স্কুল-মাস্টারি। পড়ে থাকবে এম-এসসি, পড়ে থাকবে ভবিষ্যৎ, চোখের সামনে এতদিন যে রামধনুর জগৎটা ভাসছিল, সেটা মিলিয়ে যাবে ছায়াবাজির মতো। পুরুলিয়ার গালার ব্যবসায়ী হরলাল ঘটকের ছেলের মনের উপর দিয়ে এতগুলো সম্ভাবনা একরাশ ফুলকির মতো ঝরে পড়ল।

"কী ভাবছ ? কথা বলছ না ?" ব্যগ্র আকুল-জিজ্ঞাসা মন্দিরার।

শ্যামলাল একটা অতল অন্ধকার থেকে নিজেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল : "একটা কথা বলব ?"

মন্দিরা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললে, "আর কিছু বলতে হবে না। চলো, এখুনি যাই। যদি রেজিষ্ট্রি অফিসে না হয়, তবে কালীঘাটেই। ওখান থেকেই সিঁদুর পরিয়ে দেবে আমার কপালে। তারপরে যা হবার হোক।"

যা হবার হোক। অত সহজেই যে জিনিসটাকে নিতে পারবে না শ্যামলাল। শুধু পা বাড়িয়ে দিলেই তো চলে না। সেটা শক্ত মাটিতে না খাদের উপর, পথে না অথই সমুদ্রে, সেটাও তো ভেবে নিতে হবে।

"আমি বলছিলাম—" শ্যামলাল গলা খাঁকারি দিলে।

"কী বলছিলে ?"

"আরো দু বছর তোমার বাবাকে ঠেকানো যায় না ?" সম্পূর্ণ অর্থহীন জেনেও অবান্তর দুরাশায় শ্যামলাল বলে চলল, "এর মধ্যে এম-এসসি পাশ করে আমি থীসিসটা দিয়ে ফেলি। তখন আর তোমার বাবা—"

আগুন-ধরা হাউইয়ের মতো সোজা দাঁড়িয়ে গেল মন্দিরা।

"চেষ্টা করব।" গলা থেকে একরাশ বিষাক্ত ধিক্কার ছড়িয়ে বললে, "শুধু দু বছর কেন, সারা জীবন শবরীর প্রতীক্ষা করব তোমার আশায় !"

"মন্দিরা—"

"শুধু আমি কেন ? আমার বাবাও বসে বসে তোমারই নাম জপ করবেন। তুমি এম-এসসি হবে, ডক্টরেট পাবে, তিনবছর ইয়োরোপে গিয়ে থাকবে, বড় চাকরি নিয়ে আসবে। আর ততদিন তোমার জন্য বাবা তোরণ সাজিয়ে রাখবেন, আর সমানে নহবত বাজাতে থাকবেন !"

ভীত বিবর্ণ শ্যামলাল যেন চোরাবালির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে বললে, "আমি—"

"তুমি কাপুরুষ, তুমি এক নম্বরের অপদার্থ !" চোখের আগুনে শ্যামলালকে ছাই করে দিয়ে মন্দিরা বললে, আমি "অতীশকেই বিয়ে করব। আর

শোনো, এর পরে কোনোদিন যদি তুমি ট্রাম-স্টপের সামনে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি পুলিসে খবর দেব—বলে রাখলাম সে-কথা।"

হাউইয়ের মতোই উড়ে গেল মন্দিরা। শ্যামলাল বসে রইল।

সামনে ঝিলের শ্যাওলা-কালো অপরিচ্ছন্ন জল। শ্যামলাল ভাবতে লাগল ওর মধ্যে ডুবে আত্মহত্যা করা যায় কিনা। ঠিক এমনি সময় জলের মধ্যে থেকে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে এসে পড়ল তার পায়ের কাছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো জোরে লাফ মারল শ্যামলাল। তার ভারী বিশ্রী লাগে ব্যাঙকে।

সাত

আর চারদিন পরে বিয়ে।

আজ বহরমপুরে যেতে হবে, সামাজিক কর্তব্যের তাগিদেই। ওখান থেকে বাবা আসবেন, কাকা আসবেন, আরো অনেকে আসবেন। অতীশকে সেজে আসতে হবে বরবেশে।

যেমন কুৎসিত, তেমনি বিরক্তিকর।

ঘণ্টা তিনেক পরে ট্রেন। অতীশ ঘরে ঢুকে বিছানার মধ্যে বসে পড়ল। দু-তিন দিন এলোমেলোভাবে ঘুরেছে। কোনো লক্ষ্য ছিল না, কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। পরশু একবার শুধু গিয়েছিল অমিয় মজুমদারের বাড়িতে। একই দিনে রেবারও বিয়ে।

রেবা বেশি কিছু বলেনি। খালি কিছুক্ষণ সন্ধানী চোখে তাকিয়ে ছিল অতীশের দিকে।

"মন্দিরাকে বিয়ে করছেন?"

"পাত্রী হিসাবে তো মন্দ নয়।"

"হুঁ—তা ভালোই। তবে—"

তবে রেবা আর বলেনি, অতীশও জানতে চায়নি। কিন্তু এমন কী আছে, যেখানে 'তবে' নেই? সব কিছুই তো শর্তশাপেক্ষ। কে বলতে

পারে, এখানেই সব ঠিক মিলে গেছে, কোথাও এতটুকু সংশয় অবশিষ্ট নেই আর? জীবনের অর্ধেক অঙ্কেই ঠিকে ভুলে।

রেবা বলেছিল, "সুখী হবেন আশা করি।"

"দেখি চেষ্টা করে।"

বিছানার উপরে বসে পড়ল অতীশ। ভারী ক্লান্ত লাগছে, অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মন। আজ কুড়ি দিন ধরে যেন একটা নেশার মত্ততায় তার দিন কাটছিল। সেই নেশার ঘোর কেটে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, কী দরকার ছিল এ-সবের? কী লাভ হবে এমন ভাবে মন্দিরাকে বিয়ে করে?

মন্দিরা তাকে চায় না। সেই কি মন্দিরাকে চায়? শুধু ভাবছিল, জীবনে কোথায় সে হেরে যাচ্ছে বার বার, সকলেই তাকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। সবাই যখন নিজের পাওনা হিসেব করে নিলে, তখন তার একার ফাঁকির পালা। কেন সে হার মানবে? আরো বিশেষ করে ওই শ্যামলালের কাছে?

মন্দিরা তাকে ঘৃণা করবে। অনেকদিন পর্যন্ত। করুক। আসে যায় না, কিছু আসে যায় না। অন্তত মন্দিরার সঙ্গে ওইটুকুই তার বন্ধন। পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রী মাত্র দুটো সম্পর্কই তো রাখতে পারে নিজেদের মধ্যে। হয় প্রেম, নইলে ঘৃণা। ওর জন্যে ক্ষোভ নেই অতীশের। না, এতটুকুও নয়।

মোট কথা, আর সে অপেক্ষা করবে না।

অতীশ বিস্বাদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে তক্তপোশের উপর মড়ার মতো লম্বা হয়ে পড়ে আছে শ্যামলাল। একবার মনে ভাবল সুইসাইড করে নি তো? খানিকটা পটাশিয়াম সায়ানাইড? ল্যাবরেটরি থেকে ওটা সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ নয়।

শ্যামলাল নড়ে উঠল। বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

মরেনি তাহলে। ওর মতো মানুষের কাছে অতটা রোমান্টিকতা আশা করা যায় না। ছ মাস পরেই হয়তো ময়ূরপঙ্খী মোটরে চড়ে টোপর মাথায় দিয়ে কন্যাদায় উদ্ধার করতে ছুটবে আর-এক জায়গায়।

ক্লান্তি, ভারী ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। সারা শরীরে, সমস্ত মনে, নেশা কেটে যাওয়ার একটা শিথিল অবসাদ। মন্দিরাকে মুক্তি দিলে হয়। কিন্তু কী হবে তাতে? তা হলেও শ্যামলাল ওকে পাবে না। মল্লিক সাহেব তাঁর নতুন কেনা বাঘা চেহারার কুকুরটা লেলিয়ে দেবেন শ্যামলালের দিকে।

এদিকে দু-ঘণ্টা পরে বহরমপুরে যেতে হবে। সুটকেসটা ঠিক করে নেওয়া দরকার।

অতীশ উঠে দাঁড়াল। আর উঠে দাঁড়াতেই কেন কে জানে সমস্ত জিনিসটাই তার একটা বিরাট প্রহসনের মতো মনে হল। কী মানে হয়—কী মানে হয় এর? বিজ্ঞানের ছাত্র অতীশ কি আজ মধ্যযুগীয় বর্বরের মতো জোর করে ছিনিয়ে আনতে চায় নারীকে? ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে চায় মন্দিরাকে? পাগলামি। একেবারে অর্থহীন পাগলামি। সুপ্রিয়ার উপরে প্রতিশোধ নেবার উপকরণ কি মন্দিরা? মন্দিরাকে দুঃখ দিলে সুপ্রিয়া কি এতটুকুও দুঃখ পাবে? তার উপরে আবার শ্যামলালের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা! ছিঃ ছিঃ! একটা অন্ধ বিদ্বেষের তাড়নায় এ কত নীচে নেমে চলেছে অতীশ!

তারপর—

তারপর সুপ্রিয়ার জন্য হয়তো অনেকদিন তার খারাপ লাগবে। হয়তো পড়া ভুল হয়ে যাবে—দরকারী এক্স্‌পেরিমেণ্ট করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। তবু অনেকদিন চিরদিন নয়; আস্তে আস্তে সুপ্রিয়া স্মৃতি হয়ে আসবে—স্মৃতি থেকে স্বপ্ন! তখন রাত্রির ঘুমকে সুপ্রিয়া সুরভিত করে রাখবে, কিন্তু ভোরের আলোয় মনের উপর এতটুকু ছায়া থাকবে না। কে জানে, তখন প্রথম সূর্যের রঙ মেখে আর-একজন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াবে কিনা—যার চুলে শিশিরের ছোঁয়া—যার সর্বাঙ্গে প্রভাতপদ্মের গন্ধ, যার কণ্ঠে ভৈরবী রাগিণীর গুঞ্জন তাকে স্পর্শ দিয়ে বলবে: "জাগো পীতম প্যারে—"

অতীশ বিজ্ঞানের ছাত্র। এত সহজেই কেন সে নিজের সব কিছু মিটিয়ে দেবে? কেন সে মন্দিরাকে বলি দেবে সুপ্রিয়ার খড়্গে? তারপর সারাটা জীবন ধরে একটা ছিন্নকণ্ঠ শবকে সে বয়ে বেড়াবে!

কী ভয়ঙ্কর!

অতীশ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট দুই। মন্দিরাকে বিয়ে করবার কথা, শ্যামলালকে আঘাত দিয়ে দিয়ে একটা জৈবিক হিংস্র আনন্দ, প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনের আত্মনিগ্রহের বিলাস, সবগুলোকে মনে হল একটা খেয়ালের ক্ষ্যাপামি। সূর্যের মতো দেখা দিল সুস্থ উজ্জ্বল বিজ্ঞানীর বুদ্ধি, ভোরের কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল মন্দিরাকে বিয়ে করার অবিশ্বাস্য কল্পনা। অসম্ভব! এর কোনো অর্থ হয় না!

"শ্যামবাবু?"

শ্যামলাল জবাব দিলে না। আর-একবার পাশ ফিরল। তার যে কানটা নীচের দিকে ছিল, সেটাকে শক্ত করে চেপে ধরল বালিশে।

"মন্দিরাকে বিয়ে করতে চান শ্যামবাবু?"

চাদরের মধ্যে চকিতে সাইক্লোন দেখা দিলে একটা। গা থেকে চাদরটা মেঝের উপর তাল পাকিয়ে ছুড়ে দিয়ে সটান বিছানার উপরে খাড়া হয়ে উঠে বসল শ্যামলাল। চোখ দুটো রক্ত মাখানো। থাবার মতো-পাকানো হাত। উত্তেজনার বারুদে আর-একটা ফুলকি লাগলেই বিস্ফোরণ। তার পরে সে মানুষ খুন করতে পারে।

"ঠাট্টা করছেন?" দানবিক মুখভঙ্গি করে শ্যামলাল বললে, "অনেক আমি সহ্য করেছি অতীশবাবু। কিন্তু রসিকতারও সময়-অসময় আছে একটা, তা মনে রাখবেন।"

"ঠাট্টা করছি না, খুব সিরিয়াস্‌লিই বলছি। আপনিই বিয়ে করুন মন্দিরাকে। আমার দরকার-নেই।"

শ্যামলাল রক্তাভ চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। গলার দু-পাশে রগ দুটো কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে। না, ঠাট্টা করছে না অতীশ। তার মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে এসেছে।

"আমাকে বিশ্বাস করুন শ্যামবাবু।"

জীবনে এই তৃতীয়বার কাঁদল শ্যামলাল। মুখ ঢেকে ফেলল দুহাতে।

অতীশ এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল।

"আপনি কিছু ভাববেন না। কেবল গোটা কয়েক চমৎকার মিথ্যে কথা বলতে হবে। ও-পাপটা আমিই করব এখন। শুধু একটা কথার জবাব দিন। মন্দিরা সত্যি সত্যিই আপনাকে ভালোবাসে তো?"

"ভালোবাসে মানে?" শ্যামলালের অধৈর্য উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ল, "জানেন, আপনি তাকে বিয়ে করলে সেই রাত্রেই সে আত্মহত্যা করবে? আমাকে না পেলে একদিনও সে বাঁচবে না?"

অতীশের মনের মধ্যে আবার একটুখানি কৌতুক দুলে গেল। মন্দিরা আত্মহত্যা করেব! ওই গোলগাল পুতুলের মতো মেয়েটি, যে এখনো রাতদিন চকোলেট খায়? তার অতখানি জোর থাকলে অনেক আগেই সে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত অতীশকে, অমনভাবে বলির পশুর মতো প্রতীক্ষা করত না।

কিন্তু ঠাট্টা করবার মতো মনের অবস্থা অতীশের আর ছিল না। বললে, "তা হলে সব ঠিক আছে। আর একটা কথা বলি। বিয়ের পরে মল্লিক সাহেব দারুন চটবেন, হয়তো মুখদর্শন করবেন না আর। ও-বাড়ির জামাই-আদর থেকে বঞ্চিত হলে খুব কি মন খারাপ হবে আপনার?"

"ও-বাড়ির উপর আমার কোনো লোভ নেই। আদরও চাই না। বিশেষ করে মল্লিক সাহেবের নতুন কুকুরটা যাচ্ছেতাই। আমার শুধু মন্দিরাকে পেলেই চলবে।"

"বাপের বাড়ির জন্যে মন্দিরার মন খারাপ করবে না?"

"না। আমার কাছে থেকেই সে সব চাইতে খুশি হবে।"

অতীশ হাসল, "দ্যাট সেট্‌ল্‌স। উঠে পড়ুন তা হলে।"

কান্না-জড়ানো বিস্ময়ে শ্যামলাল বললে, "কিন্তু কী করতে চান আপনি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

"বুঝবেন পরে। এখন উঠে আসুন আমার সঙ্গে।"

* * *

আকাশ থেকে পড়লেন মল্লিক সাহেব। রাগে আর আতঙ্কে লাল টকটকে হয়ে উঠল মুখ।

"আর চারদিন মাত্র সময় আছে। বিয়ে করবে না মানে? একি ছেলেখেলা?" হিংস্র গলায় বললেন, "তোমার নামে কেস্ করতে পারি তা জানো?"

শ্যামলাল সোফার ভিতরে লুকোবার গর্ত খুঁজতে লাগল।

অতীশ বিচলিত হল না। বললে, "কেস্ হয়তো আপনি করতে পারেন, আইনের খবর আমার জানা নেই। কিন্তু কথা দিচ্ছি, আমার চাইতে সুপাত্র আপনাকে আমি এনে দেব।"

প্রায় বিদীর্ণ হওয়ার সীমান্তে এসে মল্লিক সাহেব বললেন, "তোমার চাইতে সুপাত্র বাংলা দেশে বিস্তর আছে, সে আমি জানি। কিন্তু তারা তো বাজারের ল্যাংড়া আম নয় যে, গিয়ে ঝুড়ি ভরে আনলেই হল।"

"পাত্র আপনাকে আমি এক্ষুনি দিচ্ছি। তার আগে ধৈর্য ধরে আমার একটা কথা শুনবেন আপনি?"

দাঁতে-দাঁতে চেপে মল্লিক সাহেব বললেন, "গো অন্!"

"সুপ্রিয়া বলে একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম।"

"আই নো, আই নো! ও সব কাফ-লাভ সকলেরই থাকে।"

"না, কাফ-লাভ নয়। আমি ভেবে দেখলাম, তাকে ছাড়া কাউকেই আমি বিয়ে করব না।"

"দেন্ হোয়াই—" মল্লিক সাহেব বজ্রস্বরে বললেন, "তা হলে কেন তুমি এত দূর এগোলে? এ কি ছেলেখেলা? বেবিকে তোমারই বিয়ে করতে হবে। ইচ্ছেয় না করো আইন দিয়ে বাধ্য করব!"

"কেন মিথ্যে পণ্ডশ্রম করবেন? বলছি তো অনেক ভালো সুপাত্র আপনাকে দেব।"

"বটে!"

"বিশ্বাস করুন। আরো বিশ্বাস করুন, আপনার মেয়ে তাকে ভালোবাসে।"

"ইজ ইট? ইজ ইট?" যেন কলিকের যন্ত্রণা টন্‌টনিয়ে উঠেছে এমন-ভাবে মল্লিক সাহেব বললেন, "কোথায় সে সুপাত্র? আমার মেয়ের যিনি মনোহরণ করেছেন তিনি কে?"

সোফার মধ্যে এমন গর্ত নেই, যেখানে শ্যামলাল লুকোতে পারে। পাণ্ডুর হয়ে ঠায় বসে রইল।

"এই ছেলেটি। এই শ্যামলাল ঘটক।"

"শ্যামলাল!" সোফা ছেড়ে প্রায় দু-হাত শূন্যে উঠে গেলেন মল্লিক সাহেব: "ইয়ার্কির একটা মাত্রা আছে অতীশ!"

"আজ্ঞে ইয়ার্কি নয়। চমৎকার ছেলে!"

"চমৎকার ছেলে! আই মাস্ট ব্রিঙ গান অ্যাণ্ড শুট ইউ বোথ! ইয়েস, আই মাস্ট।"

শ্যামলালের প্রায় চৈতন্যলোপ হল। বন্দুকের একটা নল এখুনি তার বুকে এসে ঠেকেছে।

অতীশ বললে, "সত্যিই ভালো ছেলে। গালার ব্যবসা ছাড়াও ওর বাবার প্রায় দশ লাখ টাকার প্রোপার্টি আছে সেটা ভুলবেন না।"

প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেও পেটের মধ্যে শ্যামলালের বিবেক মোচড় খেয়ে উঠল। কিন্তু নড়তে পারল না।

"দশ লাখ!" মল্লিক সাহেব আবার ভালো করে চেপে বসলেন সোফায়। সবিস্ময়ে বললেন, "কিন্তু চেহারা দেখে তো…"

"আজ্ঞে, প্লেন লিভিং হাই থিংকিং!"

"অঃ!"

"তা ছাড়া ওঁর বড়মামা লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। ডাক্তার। কুড়ি বছর রয়েছেন, বাড়ি করেছেন গোলডার্স গ্রীনে। ফ্রেঞ্চ ওয়াইফ। এম-এসসি দিয়েই তাঁর কাছে চলে যাচ্ছেন শ্যামবাবু। লণ্ডন ডি-এসসির জন্যে।"

বড়মামা! শ্যামলালের পেটের মধ্যে বিবেকটা লাঠি-খাওয়া ঢোঁড়া সাপের মতো দাপাদাপি করতে লাগল। বড়মামা! লণ্ডন! ডাক্তার! তার একজন

মাত্র মামা। তিনি চাকরি করেন খড়্গপুরে রেলওয়ে ইয়ার্ডে। তার মামীমার নাম নলিনীবালা, তাঁর বাপের বাড়ি নোয়াখালি জেলায়!

মল্লিক সাহেব কেমন দিশেহারা হয়ে গেলেন।

"কিন্তু এ-সব কথা তো—"

"ইচ্ছে করেই বলেননি শ্যামবাবু। দেখছেন তো কি রকম বিনয়ী ছেলে!"

"সম্ভব, সবই সম্ভব। মফঃস্বল পিপ্‌ল্ একটু সিম্প্‌ল্ হয়।" মল্লিক সাহেব মাথা নাড়তে লাগলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি তবে।"

"ভাববার আর কী আছে। আপনার হাতে তো মাত্র তিন দিন আর সময়।"

"হুঁ।"

"তা ছাড়া মন্দিরাও শ্যামবাবুকে—"

"তুমি বলছিলে বটে।" মল্লিক সাহেব একবার বিরূপ দৃষ্টিতে শামলালের দিকে তাকালেন, "তা হলে এই জন্যেই বেবি পরশু থেকে বাড়িতেই মুখ গুঁজে বসে আছে, চকোলেটও খায় না! তা যাই বলো, বেবির টেস্ট ভালো নয়!"

আট

ঘরে ম্লান আলো। জানলার কাচের উপর রক্তপদ্মের আভা জ্বলছে। মৃদু ধূপের ধোঁয়া উঠেছে পাকিয়ে পাকিয়ে। দেওয়ালের গায়ে গান্ধার-রীতিতে আঁকা বরাভয়মুদ্রা সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন দুর্গাশঙ্কর।

এই ছবি যে এঁকে দিয়েছিল তাকে আর খুঁজে পাওয়ার জো নেই। দুর্গাশঙ্করের হৃদয়-পদ্মের সব কটি পাপড়ি সে ফুটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেই পদ্মবেদীটিতে সে আর আসন পাতল না। কোথায় কোনখানে যে হারিয়ে গেল, আজো তার সন্ধান পাননি।

সামনে তানপুরা নিয়ে একটি মেয়ে গান গেয়ে চলেছে। মীরার ভজন।

"চাকর রহাসূঁ, বাগ লাগাসূঁ,
নিতি উঠি দরশন পাসূঁ,
বৃন্দাবন কি কুঞ্জ গলিঁমে
তেরি লীলা গাসূঁ—"

কিন্তু এ তো সে নয়। এর পরনে লাল শাড়ি, উগ্র রঙ। এর দেহের রেখায় কাঠিন্য। এর গানে সবই আছে, সুর-তাল-লয়—কোনো কিছুরই ত্রুটি নেই। কিন্তু কোথায় সেই মাধুর্য, যা সুরের মধ্যেও নিয়ে আসে সুরের অতীতকে! কোথায় সেই ঝঙ্কার যা আলোর মতো, শিখা ছাড়িয়ে যা জ্যোতিঃপ্রকাশ!

একজন এসেছিল। তার সঙ্গে মিল ছিল সেই হারিয়ে-যাওয়া মানুষটির।

তার মাথার উপর গান্ধারী ইরার বরাভয় প্রসারিত হয়ে থাকত। সে-ও দূরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরে এসেছে। এখন সে মাটির সরস্বতী, এখন সে ছবি হয়ে গেছে। তার বীণাটিকে সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে ত্র্যম্বকতীর্থের নীল-সমুদ্রে।

কী করবেন তাকে দিয়ে? তাকে দিয়ে কী করবেন দুর্গাশঙ্কর?

একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ধূপের ধোঁয়া উঠছে কুয়াশার মতো, ছবিটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে তার ভিতরে। সামনে মেয়েটি সমানে গান গেয়ে চলেছে:

"সাঁবরিয়াকে দরশন পাউ:
পহির কুসুম্মি সারি—"

মিলবে না, সে-সুর আর মিলবে না। জীবনে একবার তাকে পাওয়া যায়, বড় জোর দুবার। কিন্তু তার বেশি নয়।

জানলার কাছে রক্তপদ্মের আভা জ্বলছে। অনেক দূরের দুরাশার মত রঙ।

সাতটা প্রায় বাজে। অতীশ পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দিলে। এবার রেবাকে খবর দিয়ে আসতে হবে যে বিয়েটা এ-যাত্রার মতো ভেঙে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে একটা নির্বোধ প্রহসনের অভিনয়।

শ্যামলাল কি সহজে বশ মানবার পাত্র? রাস্তায় বেরিয়ে দস্তুরমত কেলেঙ্কারি শুরু করে দিলে। মাথার কাছে মাননীয়দের ছবি টাঙিয়ে রেখে এতদিন সে সততার সাধনা করেছে। কিছুতেই বোঝানো যায় না তাকে।

অতএব পরম জ্ঞানের বাক্যটি শোনাতে হল।

"প্রেমে আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কোনো বস্তু নেই। ঋষিরা বলে গেছেন মশাই।"

"কিন্তু সবই তো উনি জানতে পারবেন।"

"বিয়ের আগে নয়।"

"যদি পুরুলিয়ার খোঁজ করেন?"

"এই তিন দিনের মধ্যে পেরে উঠবেন না, সে-সময় ওঁর নেই। তা ছাড়া ওঁদের কাছে আমি অত্যন্ত সত্যবাদী ভালো ছেলে, আমার কথায় কিছুতেই অবিশ্বাস করবেন না। পরে অবশ্য আমাকে প্রচুর গালাগালি করবেন। কিন্তু সে আমি শুনতে পাব না, তখন আমি এলাহাবাদে।" শ্যামলালের মুখের উপর একটা ক্ষুণ্ণ দৃষ্টি ফেলে অতীশ বললে, "আপনার জন্যে আমি কতবড় স্যাক্রিফাইস করলাম জানেন মশায়? ওঁদের বাড়িতে চমৎকার বিরিয়ানি পোলাও হয়, ভবিষ্যতে সে-পোলাও খাওয়ার জন্যে কোনোদিন আর আমায় ডাক পড়বে না।"

কিন্তু অতীশের আত্মত্যাগের ব্যাপারে কান দেবার সময় ছিল না স্বার্থপর শ্যামলালের।

"আর আমার বাবা?"

"ওই তো কাজ বাড়ালেন। আমাকে কালই ছুটতে হবে পুরুলিয়ায়, তাঁকে ম্যানেজ করতে। আশা করি, পেরে উঠব। কারণ, তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁর বড় ছেলেটি এম-এসসি ফেল করে দেশান্তরী হবে, এ তিনি চাইবেন না। ভালো কথা, ট্রেন-ভাড়াটা দেবেন মশাই। গাঁটের কড়ি খরচ করে অতটা পরোপকার পোষাবে না।"

তিনখানা দশটাকার নোট তক্ষুনি বাড়িয়ে দিয়েছে শ্যামলাল: "এই নিন ভাড়া—"

আকাশে নবমীর চাঁদ। করুণ শান্ত জ্যোৎস্না ঝরছে চারদিকে। নরম আঙুলের আলতো ছোঁয়ার মতো হাওয়া। ট্রাফিকের কর্কশ কোলাহল ছাপিয়েও কোথায় যেন নিঃশব্দ বাঁশি বেজে চলেছে। চলতে চলতে নিজেকেই ভালো লাগতে লাগল অতীশের। শ্যামলাল নিশ্চয় সুখী করতে পারবে মন্দিরাকে। যতই সাধাসিধে হোক—ওর মতো ছেলের মধ্যে এক ধরনের জোর আছে—একটা নিষ্ঠার নিশ্চয়তা আছে। জীবনে শেষ পর্যন্ত শ্যামলাল পিছিয়ে পড়বে না। আর মন্দিরা—খুব বেশি করে যে ভাবতে জানে না, সে শ্যামলালকে খুব সহজেই নিজের করে নিতে পারবে; এই সরল কাজের মানুষটিকে করুণা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, বাৎসল্যরঞ্জিত প্রেম দিয়ে, ধন্য করে দিতে পারবে।

ভালো হল—এই সব চাইতে ভালো হল।

হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনে কতগুলো বাঁশ এনে জড়ো করা হয়েছে। ছোট তোরণের মতো তৈরি হচ্ছে একটা। অতীশ জানে। চারদিন পরের একই তারিখে রেবার বিয়ে।

আর বসবার ঘরে পা দিতেই আজও প্রথম দেখা হল রেবার সঙ্গেই। শুধু রেবা নয়—দুটি বান্ধবীও তার ছিল। অতীশ তাদের চেনে না।

কিন্তু অতীশকে দেখেই রেবা চমকে উঠল। কালো হয়ে গেল মুখ।

"আপনি!"

"একটা খবর দিতে এলাম।"

"বসুন—বসুন।"

বান্ধবীরা কী একটা অনুমান করেছিল। সংক্ষেপে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বর্ণহীন মুখে—অদ্ভুত শঙ্কিত দৃষ্টিতে রেবা কিছুক্ষণ অতীশের দিকে তাকিয়ে

রইল। আর কথাটা বলবার জন্যে নিজের মনের মধ্যে প্রস্তুত হতে লাগল অতীশ।

ঘড়িতে আটটা বাজল। তারপর শেষ শব্দটার বিলম্বিত রেশ থেমে গেলে অতীশ বললে, "জানেন, বিয়েটা ভেঙে দিলাম।"

"ভেঙে দিলেন ?"—রেবা প্রায় চাপা গলায় চিৎকার করল একটা।

"হাঁ, ভেবে দেখলাম মন্দিরাকে নিয়ে এ ধরনের প্র্যাক্টিক্যাল জোক করবার কোনো মানে হয় না। বড্ড ছেলেমানুষ মেয়েটা। কী বলেন, ভালো করিনি ?"

সহজ গলায় সে হাসতে শুরু করল।

রেবা হাসল না, দ্বিতীয় প্রশ্নও করল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘড়ির ক্লান্তস্বর শুনল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন ?"

"কোথায় সুপ্রিয়া ?"—অতীশের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল।

"এই কলকাতায় !"

দমবন্ধকরা গলায় অতীশ বললে, "কবে এসেছে ?"

"কাল।"

"কাল এসেছে—তবু খবর নেয়নি !"—হৃৎপিণ্ডের মত্ততা অনুভব করতে করতে অতীশ বললে, "কেমন আছে ?"

রেবা মুখ তুলে তাকাল, কেমন ঝাপসা ঝাপসা দেখাল তার চোখ। বললে, "সব খবর তার মুখ থেকেই শুনবেন। সামনেই পার্কে বসে আছে পাম গাছের নিচে।"—রেবা ধরা গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিলে : "এক্ষুনি বোধ হয় তার সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত অতীশ বাবু। পরে হয়তো আর সময় পাবেন না।"

অতীশ রেবার শেষ কথাগুলো শুনতে পেল না। তার আগেই সে ঘরের বাইরে পা দিয়েছে।

* * *

পাম গাছের একরাশ তরল ছায়ার নিচে একটা বেঞ্চির ওপরে চুপ করে

বসে ছিল সুপ্রিয়া। মনে হচ্ছিল একটা শাদা মাটির মূর্তিকে কেউ ওখানে এনে রেখে দিয়েছে।

অতীশ সামনে এসে দাঁড়াল।

সুপ্রিয়া যেন দেখেও তাকে দেখতে পেল না। আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল। পামের পাতার ফাঁক দিয়ে খানিক জ্যোৎস্না পড়ল তার পাণ্ডুর মুখের উপর। কালো চোখে অতলস্পর্শ নিশ্চেতনা নিয়ে সুপ্রিয়া তাকিয়ে রইল তার দিকে।

"সুপ্রিয়া!"

চকিতে উঠে দাঁড়াল সুপ্রিয়া। যেন সাপ দেখেছে। অস্বাভাবিক ফিস-ফিসে গলায় বললে, "কেন এলে—কেন তুমি এলে এখানে? আমি তো তোমায় আসতে বলিনি!"

মুহূর্তের জন্যে অতীশ মূঢ় হয়ে গেল—তৎক্ষণাৎ তার ইচ্ছে হল চলে যায় সামনে থেকে। কিন্তু সহজে সে অসংযত হয় না, আজও সামলে নিলে নিজেকে। তারপর বললে, "তোমাকে বেশিক্ষণ বিব্রত করব না। একবার দেখতে এসেছিলাম—এখনি চলে যাব।"

"তাই যাও।"—তেমনি অদ্ভুত গলায় সুপ্রিয়া বললে, "সকলের কাছে ছোট হয়ে যেতে পারি অতীশ, কিন্তু তোমার কাছে পারব না। আমাকে এখন কান্তির জন্যে কাঁদতে দাও—যে আমার দলের। তুমি চলে যাও।"

অতীশ তবু যেতে পারল না। কী একটা সন্দেহের ঢেউ উঠে সেখানে তাঁকে আরো নিশ্চলভাবে দাঁড় করিয়ে দিলে।

"কী বলছ তুমি? কী হয়েছে কান্তির?"

"আমার জন্যে সব চেয়ে বড় দাম দিয়েছে সে। জেল খাটছে খুনের দায়ে।'

"সুপ্রিয়া, মানে কী এ সবের?"

"ভেবেছিলাম, তার জন্মের লজ্জা ঢেকে দেব আমার ব্যর্থতার লজ্জা দিয়ে। আমার আর কোনো রূপ সে তো দেখেনি, শুধু আমাকেই সে চেয়েছিল। মনে করেছিলাম তার কাছেই শেষ পর্যন্ত আমি সান্ত্বনা পাব। কিন্তু সে আশ্রয়ও হারিয়েছি অতীশ।"

"সুপ্রিয়া।"

স্বগতোক্তির মতো তেমনি বিচিত্র গলায় সুপ্রিয়া বলে চলল, "ওস্তাদজী দুর্গাশঙ্কর অবশ্য থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু সে তো শুধুই করুণা। তাঁর গান্ধার আর্টের সরস্বতীর সঙ্গে এখন আর কোথাও আমার মিল নেই। এখন কান্তির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমি কী করতে পারি অতীশ?"

"এমন করে কী সব বলছ সুপ্রিয়া? তোমার গলার স্বর ও রকম কেন? তুমি মহাভারতের তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলে—এত সহজেই তা শেষ হয়ে গেল?—" ব্যাকুল বিস্ময়ে অতীশ বললে, তোমার কী হয়েছে সুপ্রিয়া? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!"

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। গলায় সিল্কের চাদর জড়ানো ছিল, সরিয়ে দিলে সেটা। তারপর অনেক নীচে, পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে কথা কইলে চুড়োর ওপর থেকে যেমন তার শব্দটা শোনা যায়, তেমনি অতল-নিহিত স্বরে বললে, "দেখো তাকিয়ে।"

আতঙ্কে বিস্ময়ে এক পা সরে গেল অতীশ। নবমীর জ্যোৎস্না পড়েছে, সেই সঙ্গে এসে মিলেছে ইলেকট্রিকের আলো। নির্ভুল স্পষ্টতায় দেখা যাচ্ছে সব। সুপ্রিয়ার শঙ্খ-শুভ্র মরালগ্রীবা আর নিষ্কলঙ্ক নয়—তার ঠিক মাঝখানটিতে সদ্য শুকিয়ে যাওয়া একটি গভীর ক্ষত—যেন সবে তার স্টিচ কাটা হয়েছে। অতীশ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

"একি—একি!"

সুপ্রিয়া বললে, "ডিপথিরিয়া।"

অতীশ দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে। চারদিকে থমকে গেছে সব। হাওয়া বইছে না, চাঁদ নিভে আসছে, মাথার উপর মর্মরিত হচ্ছে না পামের পাতা। সময় থেমে গেছে।

যেন অনন্তকাল পরে সুপ্রিয়া বললে, "গান ফুরিয়ে গেল, স্বপ্ন ফুরিয়ে গেল, দীপেন—আমার সবাই ফুরিয়ে গেল, আমি ফুরিয়ে গেলাম। হাসপাতাল থেকে

বেরিয়ে কলকাতায় ছুটে এসেছিলাম কান্তির কাছে। সে-ও নেই। তবু তার জন্যেই দশ বছর আমি অপেক্ষা করব। তুমি যাও অতীশ।"

"না।" অতীশ বললে, "তুমি তো বলেছিলে, সব চেয়ে বড় প্রয়োজনে আমার কাছে ছুটে আসবে।"

"বলেছিলাম। কিন্তু প্রয়োজন আর শূন্যতা এক জিনিস নয় অতীশ। নিঃশেষ হয়ে গিয়ে তোমার করুণার দান নিয়ে আমি বাঁচতে পারব না। বরং অপেক্ষা করব কান্তির জন্যে—যে আমার চাইতে আরো বেশি করুণার পাত্র। তুমি যাও অতীশ, মন্দিরাকেই বিয়ে করো। আমি রেবার মুখে সবই শুনেছি।"

"সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছি সুপ্রিয়া।"

"তা হলেও আরো তো অনেক মেয়ে আছে।"

"তারা থাক। আজকে শুধু তোমাকেই আমার দরকার।"

"আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে? তোমাব করুণার বদলে আমি তো তোমায় ভালোবাসতে পারব না।"

"বেশ তো, যেদিন করুণার সীমা ছড়িয়ে উঠবে, সেইদিনই ভালোবাসা দাবি করব তোমার কাছে।"

সুপ্রিয়া তাকিয়ে রইল।

অতীশ সুপ্রিয়ার কাছে এগিয়ে এল। বলে চলল, "ফুরিয়ে গেছে কেন ভাবছ এ-কথা? জীবন একদিকে শূন্য হয়ে গেলেও অন্যদিকে তো নতুন ভাবে আরম্ভ করা চলে। কিছুই কোনোদিন মিথ্যে হয়ে যায় না। গলার গান নয় গেল—কিন্তু মনের সুর তো মুছে যায় নি। সেতার আছে, বেহালা আছে, স্বরোদ আছে। তুমি শিল্পী। যা ধরবে পরশমণির ছোঁয়ায় তাই সুরের সোনা হয়ে উঠবে।"

"কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে। যতদিন আমি বড় হয়ে না উঠব, যতদিন মনে না হবে এবার তোমার চোখে আমার মহিমার রূপ ধরা পড়েছে—ততদিন যে আমি তোমায় কিছুই দিতে পারব না অতীশ।"

"আমি অপেক্ষা করব।"—অতীশ নিজেকে প্রস্তুত করে তুলল। তারপর

সুপ্রিয়ার একটা প্রাণহীন শীতল হাতকে টেনে নিলে নিজের ঘর্মাক্ত মুঠোর ভেতরে।

"আমি অপেক্ষা করব"—অতীশ বলে চলল, দশ বছর তোমাকে মিথ্যে কাঁদতে না দিয়েই তার ভেতরেই তোমাকে নতুন করে গড়ে নেব। ততদিন আমাদের মাঝখানে তোমার সাধনা অসিধারা ব্রতের তলোয়ারের মতো জলতে থাকুক। জোর করে যদি কিছু চাইতে যাই—সেই তলোয়ার যেন তখনি আমাকে আঘাত করে।"

সুপ্রিয়া কথা বলল না। কিন্তু অতীশ বুঝতে পারল। তার মুঠোর মধ্যে সুপ্রিয়ার হাত আত্মসমর্পণের করুণায় আরো কোমল হয়ে এসেছে।

নবমীর চাঁদের কোল ঘেঁষে কালো মেঘ ঘনাচ্ছিল একরাশ। দীর্ঘ বিলম্বিত মূর্ছনায় গুরুগুরু করে শব্দ উঠল তাতে। যেন চন্দ্রচূড় আকাশ-মন্দিরের কালো গ্র্যানিট্ চত্বরে সাড়া জেগে উঠল দক্ষিণী নটরাজের মহামৃদঙ্গে॥